মুরলা।

(উপন্যাস)

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

"When Jesus heard *it*, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick; I came not to call the righteous, but sinners to repentance." *St. Mark. II. 17.*

"Blessed *are* they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven." *St. Matthew. V. 11.*

And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul; but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell." *St. Matthew. X. 28.*

"First our pleasures die—and then
Our hopes, and then our fears—and when
These are dead, the debt is due,
Dust claims dust—and we die too." *Shelley.*

"Ah, dearest, if there be
A devil in man, there is an angel too,
And if he did that wrong you charge him with,
His angel broke his heart." *Tennyson.*

প্রথম সংস্করণ।
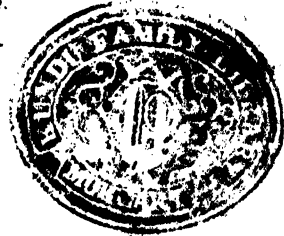
কলিকাতা,

২০/৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, আনন্দ-আশ্রম হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত,

শ্রাবণ—১২৯৯।

উৎসর্গ।

পরম ভগবদ্ভক্ত শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর গুপ্ত

মহোদয় সমীপে।

দেব,

ভালবাসা ভালবাসা করিয়া মরিতেছি, কিন্তু পবিত্র স্বর্গীয় অনাবিল ভালবাসা এই ভবের বাজারে কোথাও পাইতেছি না। যাহা পাই, তাহা ছাই; যাহা দেই, তাহাও ছাই। ছাই ভস্ম লইয়া আমি আর এ রাজ্যে ব্যবসা চালাইতে পারি না। কি পুরুষ, কি রমণী—আমার চতুর্দ্দিকে সকলেই ছাই ভস্ম লইয়া ব্যবসা চালাইতেছে। ছাই ঝড়ে উড়িয়া যায়, বন্যায় ধুইয়া যায়। যাহা অবিনশ্বর, যাহা চিরস্থায়ী, যাহা মরণের পরেও থাকে, যাহা কখনও বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, যাহা পাপ পুণ্যের অতীত, আমি সেই ভালবাসা দেখিতে পাইতেছি না। ঘুরিয়াছি অনেক, দেখিয়াছি অনেক, কিন্তু কোথাও অকৈতব প্রেম দেখিতে পাইলাম না। আমি যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইতে চাই, তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া সংসারের উপরে উঠিতে চাই, তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্বার্থ-কোলাহল ভুলিয়া যাইতে চাই। শুনিয়াছি, সেই খানেই ঈশ্বর, সেই খানেই স্বর্গ। আমি সেই স্বর্গে যাইতে চাই। কিন্তু যাইতে পারিলাম কই?

এই পাপ সংসারে, পুরুষকে ভালবাসিলে স্বার্থের কথা প্রাণে জাগে, রমণীকে ভালবাসিলে রিপুর কথা স্মরণ পড়ে। এই ভবের বাজারে ভালবাসিতে যাইয়া কত লোক পুড়িয়াছে, কত লোক পচিয়াছে, কত লোক ডুবিয়াছে, কে সংখ্যা করিতে পারে? দেখিয়া শুনিয়া এক একবার মনে হয়, যে স্বর্গের মন্দার কুসুম এ মর্ত্ত্যে ফুটিবে না, বৃথা অন্বেষণ করি, বৃথা ঘুরিয়া মরি। যাহা কেহ পায় নাই, কেহ দেখে নাই, আমি তাহা কিরূপে পাইব, কিরূপে দেখিব? আমার এ যে বড় অহঙ্কার, দেখিতেছি। যে বার মাস প্রতারিত হয়, সে আবারও আশায় বুক বাঁধে? আমি অনেক বার ঠকিয়াছি, কিন্তু আশা-সম্বল ছাড়িয়া কি করিয়া বাঁচিব? আমি আপনাকে দেখিয়া অবধি আশা করিতেছি, যাহা অন্যত্র দেখি নাই, তাহা আপনাতে দেখিব। আপনাতে এমন কিছু পাইব, যাহাতে ডুবিয়া মজিয়া আমি সেই স্বর্গের উপকূলে, ঈশ্বর-ধামে পৌঁছিতে পারিব। আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে কি না, জানি না; তবে ইহা জানি, যাহা সংসারে পাই নাই, তাহা আপনাতে পাইয়াছি। যখন মতবাদের একটা ভীষণ কলহ তুলিয়া এ সংসারের বড় সাধের বন্ধু সকলও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দেখিয়াছি, তখনও আপনি অবিচলিত ভাবে, সকলের

অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া স্নেহক্রোড় দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। আপনার মন ভাঙ্গিতে লোকেরা কি কম চেষ্টা করিয়াছিল? কিন্তু আপনি সকল অবস্থায় অটল ছিলেন। আপনার সে সকল স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া কতবার অশ্রু ফেলিয়াছি, স্মরণে চিন্তনে কতবার পুলকিত হইয়াছি। ইহাতে আশা হইয়াছে, আমি যদি নরকেও ডুবি, তবুও আপনি আমাকে ভাল বাসিবেন। আশা হইয়াছে, আপনি যেখানে যে অবস্থায় থাকুন, আপনার স্বর্গীয় ভালবাসায় কখনও বঞ্চিত হইব না। আমার এ বিশ্বাস অমূলক কি না, এবার তাহার পরীক্ষা হইবে।

যে মুরলাকে পৃথিবীর লোকেরা নরকের সহিত তুলনা করিয়াছে, আমি বড় সাধ করিয়া সেই মুরলার চিত্র আঁকিয়াছি। আপনি জানেন, আমি মুরলাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি;—জানেন, আমি তাঁহাকে মহৎ হইতেও মহত্ত্বের খনি মনে করি। যে রমণী চরিত্র হারাইয়া আবার চরিত্র পায়, এবং চরিত্র রক্ষার জন্য অম্লান চিত্তে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে, আমি তাঁহাকে দেবী বলিয়া জানি। আমার নিকট মুরলা মানবী নহেন, দেবী। সংসার যাহাকে নরক বলে, আমি তাহাকে স্বর্গ বলিতেছি। এ কথা শুনিয়াও কি আমাকে ভালবাসিতে পারিবেন?—এবার এ কথার পরীক্ষা হইবে।

আমি ব্রাহ্মসমাজকে কিরূপ ভালবাসি, আপনি জানেন। আমি ব্রাহ্মসমাজকে ভালবাসিয়াও সম্প্রদায়ের উপরে উঠিতে চাই। ব্রাহ্মসমাজ সাম্প্রদায়িকতা এবং দুর্নীতি পাপে ডুবিতেছে, ইহা আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার দু'টী উপায় বুঝিয়াছি। একটী উপায়, বিধাতার নিকট প্রার্থনা করা; আর একটী উপায় নিরপেক্ষভাবে সত্য ঘোষণা করা। আপনি জানেন, এই শেষ উপায় সাধন করিতে যাইয়া আমি সর্ব্বত্র অনাদৃত, সকলের ঘৃণার পাত্র। পবিত্র-হৃদয়া মুরলার চিত্র আঁকিবার সময়, অপরিহার্য্য রূপে, সত্যের অনুরোধে, ব্রাহ্মসমাজের অনেক কথা আসিয়া পড়িয়াছে। সকল লোক ত আমাকে আরো ঘৃণা করিবে; কিন্তু আপনি এবার কি করেন, তাহারও পরীক্ষা হইবে।

কেবল পরীক্ষার জন্যও নয়। মুরলাকে আর কাহাকেই বা দেই? কে এই হতভাগিনীর ভার লইবে? আপনি এক দিন ইহার জন্য অনেক সময় দিয়াছেন; আমি জানি, আপনি ইহার জন্য অনেক অশ্রু ফেলিয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্ব-স্নেহ-বঞ্চিতা মুরলার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই, যদি থাকে, তবে আপনাতেই আছে, ইহা ভাবিয়া আপনার শ্রীচরণে ইহাকে উৎসর্গ করিলাম। সর্ব্বকালে, সর্ব্বলোকে হতভাগিনী আপনার স্নেহ, আদর ও মমতা পাইলে, আমি কৃতার্থ হইব; পরিশ্রম সাথক হইল মনে করিব।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।
আনন্দ-আশ্রম।

আপনার অতুল স্নেহের
শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

শ্রীশ্রী

মুরলা।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মায়ার ছলনে।

মুরলা ও সুপ্রসন্ন এক বাড়ীতে থাকে, মুরলা বালবিধবা, সুপ্রসন্ন বিবাহিত যুবক। মুরলা, সুপ্রসন্ন অপেক্ষা বয়সে বড়। মুরলা, কুলীন বঙ্গজ কায়স্থের কন্যা, কুলীন বঙ্গজ কায়স্থের কুলবধূ। সুপ্রসন্ন, ইতর দরিদ্র কায়স্থের সন্তান, মুরলার পিতার অন্নে প্রতিপালিত। মুরলা, পিত্রালয় চক্রধরপুর থাকেন। চক্রধরপুর বরিশাল জেলার একটী ভদ্রপল্লী। সুপ্রসন্নের বাড়ী চক্রধরপুর হইতে এক প্রহর দূরবর্ত্তী দরিদ্রপুরে। দরিদ্রপুরে স্কুল নাই বলিয়া সুপ্রসন্ন চক্রধরপুর থাকে। সুপ্রসন্ন গরিবের ছেলে বলিয়া মুরলার পিতার অন্নে প্রতিপালিত।

মুরলা ও সুপ্রসন্নের একদিনের কথাবার্ত্তায় গ্রন্থ আরম্ভ করিতেছি।

সুপ্রসন্ন। তোমার পিতাকে সব কথা বলিয়া কি ভাল করেছ? আমাকে তিনি স্থানান্তরে যাইতে আদেশ করেছেন। আমি তোমাদের শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিদের বাড়ীতে গোপনে থাকিতে পারিতাম, কিন্তু থাকিব না। আমি ত চলিলাম, কিন্তু তোমার উপায় কি হইবে?

মুরলা। আমি বুঝিয়াছি, আমি তোমার প্রলোভনে পড়িয়া যারপর নাই গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। আমি তোমার মায়া ছাড়িয়াই বাবাকে সব বলিয়াছি। তুমি যাও, প্রার্থনা, জন্মের মত যাও। প্রার্থনা—নরকে যেন তোমার স্থান হয়।

সুপ্রসন্ন দেখিল, মুরলার মুখ রক্তবর্ণ হইয়াছে, দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতেছে, সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে। মুরলা আবার বলিলেন, সুপ্র-

সন্নের প্রাণ কাঁপাইয়া বলিলেন, প্রার্থনা, তোমার এ পাপমূর্ত্তি যেন আর আমাকে কথনও দেখতে না হয়।

সুপ্রসন্ন চতুর, তায় বুদ্ধিমান, মনে মনে ভাবিল, মুরলা স্ত্রীলোক, ইহার পক্ষে সব সাজে। কিন্তু কথা প্রাণে বড় বাজিয়াছে, তখনই চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু গেলে যে জন্মের মত যাইতে হয়। তাহা সুপ্রসন্নের প্রাণে সহ্য হয় না। বলিতে কি, সুপ্রসন্ন মুরলার মায়া কিছুতেই ছাড়িতে পারে না। এ মায়া, বিষম মায়া। সুপ্রসন্ন চতুর, কিন্তু মুরলার প্রেমে উন্মত্ত। সুপ্রসন্ন বুদ্ধিমান, কিন্তু বুদ্ধি রিপুর চরণে বলি দিয়াছে। সুপ্রসন্ন এক দিনও মুরলাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। মুরলার কি এতই রূপ? সকলের নিকট মুরলা আদর্শ সুন্দরী না হইলেও, সুপ্রসন্নের চক্ষে মুরলা অতুলনীয়া সুন্দরী। কি উজ্জ্বল চক্ষু, কি সুন্দর নাসিকা, কি অপরূপ যোড়-ভ্রু, কি সুচারু ওষ্ঠযুগল, কি আজানুলম্বিত মস্তকের সুচিকণ কেশরাশি, কি মধুর কাঞ্চন-নিভ উজ্জ্বলবর্ণ। তাহাতে যৌবন কত শোভাই অকাতরে ঢালিয়া দিয়াছে। রূপে রূপ, ভাবে ভাব, রসে রস,—মধু হইতেও মধুর। আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ হাসে, তাহা সুপ্রসন্নের নিকট তুচ্ছ, মুরলার মৃদুহাসির কাছে চাঁদের হাসি তুচ্ছ। প্রস্ফুটিত গোলাপের শোভা কত মধুর, সুপ্রসন্নের নিকট তাহা তুচ্ছ। শোভা এ জগতে আর কাহারও নাই, সুপ্রসন্ন ভাবে—শোভা বলিতে যাহা কিছু, তাহা কেবল মুরলার। এ শোভার নেশা কি সে ভুলিতে পারে? সম্ভব কি? সম্ভব হইলে সাধ্য কি? সুপ্রসন্ন আত্ম-বিক্রীত। সুপ্রসন্ন মত্ত। মুরলা আজ এত রুষ্ট, তীক্ষ্ণ, নিদারুণ বাণী বলিতেছেন, সুপ্রসন্নের তাহাও মিষ্ট লাগিতেছে, সে ভাবিতেছে, মুরলা অবলা বই ত নয়, বিচ্ছেদ সে ত বুঝে না; তার সবই ক্ষমার যোগ্য। সুপ্রসন্ন, তুমি বুদ্ধিমান যুবক, কিন্তু জাননা, মুরলাকে আজ কে ধরিয়াছে!!

সুপ্রসন্ন বলিল, মুরলে, চল আমরা এ পাপের ভবন পরিত্যাগ করি। তুমি আমি, ভাইভগ্নী হইয়া থাকিব। তুমি চটিয়াছ, বেশ, রিপুর কোনই সম্পর্ক থাকিবে না; চল, আমরা এ স্থান ত্যাগ করি। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তোমার খুব অনুরাগ, চল, আমিও ব্রাহ্ম হইব। চটিবে কেন? আমি যদি পতিতই হই, তোমার জন্যই পতিত, আমাকে উদ্ধার করিয়া লও।

মুরলার বাল্যাবধি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি টান। এই পৃথিবীতে মুরলার দুটী আকর্ষণ, এক আকর্ষণ শিক্ষার, আর আকর্ষণ ব্রাহ্মসমাজের। মুরলার জেঠাত-ভগ্নী ব্রাহ্মিকা। দিদি ও ভাই উমেশের কাছে ধর্ম্মের কথা শুনিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি মুরলার গভীর অনুরাগ জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের কথা শুনিয়া মুরলা একটু নরম হইলেন, কিন্তু এখনও অভিমান ষোল আনা রহিয়াছে। অভিমানের কারণও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, বলিলেন, "তোমার সব কথা মিথ্যা। তোমার সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় পাইব, ভাবিয়াই, এক দিন তোমার সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। সেই সূত্র ধরিয়া তুমি আমাকে ডুবাইয়াছ। পুরুষের মন এত বিষভরা, পূর্ব্বে জানিতাম না, পূর্ব্বে জানিলে আমি মজিতাম না। তুমি আজ কাল করিয়া কত সময় কাটাইয়া দিয়াছ। কোথায় ব্রাহ্মসমাজ? তোমার সব চাতুরী! আমি আর ভুলিব না। সুচতুর মিথ্যাবাদীর কথায় আমি আর ভুলিব না। আমি তোমার সহিত ব্রাহ্মসমাজে যাইব না। তুমি মরগে।"

সুপ্রসন্ন তবুও বলিল, এবার আমার কথা রাখ, আমি নিশ্চয় তোমাকে ব্রাহ্মসমাজে পৌঁছাইয়া দিব। তুমি ত বরিশালের অনেক ব্রাহ্মের নিকট পত্র দিয়াছ, কেহ তোমার গতি করে নাই; দেখ আমি কি করি।

মুরলা আর কিছু বলিলেন না। এখন রাগ একটু থামিয়াছে, অভিমান একটু কমিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের নামে মুরলার এমনই হইত। সুপ্রসন্ন মুরলাকে বিলক্ষণ জানিত। চক্রধরপুর ছাড়িতেই হইল যখন, তখন মুরলাকে হাত না করিলে জীবন রাখার আর উপায় কি? হাত করারও অন্য উপায় নাই। মুরলাকে ঘরের বাহির করার একমাত্র উপায় ব্রাহ্মসমাজের প্রলোভন। সুপ্রসন্ন অগত্যা সেই প্রলোভন ধরিল। সেই দিন রাত্রেই বরিশাল রওয়ানা হইল। যাইবার সময় গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া চাঁদের আলোতে অনিমেষ দৃষ্টিতে মুরলার ছবি দেখিয়া হৃদয়ে আঁকিয়া লইল। এ দৃশ্য সুপ্রসন্ন কখনও ভুলিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মুরলার প্রলাপ।

চক্রধরপুর নীরব হইয়াছে, ঘোর সুষুপ্তিতে ডুবিয়া গিয়াছে। আকাশে চাঁদ শুধু হাসিয়া আকুল। বৃক্ষের পাতায় পাতায়, নদীর সৈকতে সৈকতে, পুকুরের জলে জলে তাই হাসির ছটা খেলিতেছে। চাঁদ হাসিতে থাকুন, আমরা দেখি, মুরলা কি করিতেছেন। মুরলার চক্ষে আজ আর ঘুম নাই। সুপ্রসন্ন তাড়িত হইয়া চক্রধরপুর পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই জন্য কি মুরলার কষ্ট হইতেছে? সেই জন্য কি চক্ষে ঘুম বসিতেছে না। তা অসম্ভব। মুরলার প্রাণে দারুণ জ্বালা। "পাপ-বিষ খাইলাম ত মরিলাম না কেন?—ধর্ম্ম ডুবাইলাম ত জীবন রাখিলাম কেন?"—প্রাণে কেবল এই চিন্তা। মুরলা শয্যা হইতে উঠিয়া পুকুর ধারে গেলেন। ঘরের দক্ষিণে পুকুর। পুকুর নারিকেল গাছে ঘেরা। আকাশে চাঁদ হাসিতেছে, জলে সেই চাঁদের জ্যোতি ভাসিতেছে;—মুরলা একাকিনী পুকুর ধারে বেড়াইতেছেন, আর ভাবিতেছেন;—এখন কি করি? বাবাকে সব বলিয়াছি, সকলে সব জানিয়াছে, ভালই হইয়াছে। দিদি বলিয়াছিলেন, "যাহা গোপন করিতে সাধ, তাহাই পাপ। পাপের কথা মানুষকে বলিলে পাপ লঘু হয়; পাপ আর পাপ থাকে না।" দিদির কথা ত পালন করিয়াছি, কিন্তু লোকে যে আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। এত দুষ্কার্য্য করিয়াও যতদিন গোপন রাখিয়াছিলাম, সকলেই আদর করিত, ভালবাসিত, প্রশংসা করিত। আর আজ আমি সব বলিয়া দিয়াছি—অমনই সকলে ঘৃণা, তুচ্ছ, ছি ছি করিতেছে!! সমাজের এ কি দুর্দ্দশা! আমি না বলিলে কেহ কিছু ধরিতে পারিত না। কেবল প্রতারণা, কেবল কপটতা! এই প্রতারণার রাজ্য ছাড়িয়া দিদি আমার স্বর্গে গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ, সেত স্বর্গ। আমি শুনিয়াছি, সেখানে ঘৃণা, বিদ্বেষ নাই। সেখানে পরের ছেলে মেয়ে মানুষের আপন হয়। সেখানে সরল ভাবে যে মনের কথা বলে, তার বড় আদর। সেখানে পাপী উদ্ধার হয়, পতিত আশ্রয় পায়।

সেখানে নাকি, মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে না। দিদি বলেন, "সব মানুষই মায়ের কোলের জিনিস, মা কোন ছেলে মেয়েকে তুচ্ছ করেন না। পাপী, তাপী সকলে মায়ের কোল পায়!" কি মধুর কথা! আমিও সেই মায়ের কোলে যাইব। যাইব, কিন্তু এখানকার সকলে যেরূপ বিরক্ত হইয়াছেন, আমার দিদিও যদি আমার সকল কথা শুনিয়া সেইরূপ বিরক্ত হন? দিদির স্বামী পরম দেবতা, তিনি ত মানুষ নন, তিনি কি আমাকে ঘৃণা করিবেন? আশ্রয় দিবেন না? আমি মাতৃহীনা, স্বামীহীনা, বাল্যকাল হইতে অত্যাচার-পীড়িতা;—তিনি ত সকলই জানেন আমার টাকা থাকিতে আহার পাই না, পিতা বিমাতার কুপরামর্শে কন্যাবধে উল্লসিত, তিনি কি না জানেন? তিনি ত আমাকে খুব ভালবাসেন। ভালবাসেন, তবু আমাকে এত দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন না কেন? তাঁহার ভগ্নী ও আমি এক দশাগ্রস্ত। তাঁহার ভগ্নীকে উদ্ধার করিলেন, আমাকে কেন করিলেন না? আমি কি তাঁর পর? আমার স্বামী, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার স্বামী তাঁহার বাল্যবন্ধু ছিলেন, আমি কি তাঁহার পর? তবে তিনি উদাসীন কেন? আমার বিষয়ের প্রত্যাশী বলিয়া তাঁহার চরিত্রে লোকে কলঙ্ক রটনা করিবে বলিয়া কি তিনি উদাসীন? তিনি কি লোকের কথায় কর্ণপাত করেন? তাঁহার পবিত্র নামে ত কত লোকে কত কলঙ্ক রটায়, কিন্তু তিনি ত কোন কর্ত্তব্য ভুলেন না। তিনি পাপীর বন্ধু, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তিনি পতিতপাবন, তিনি নরনারীর উদ্ধারের জন্য কি না করিয়াছেন! তিনি কেবল আমার প্রতি উদাসীন! এ তাঁর বড় কলঙ্ক। ছি, রসনা এমন কথা বলিস্? তাঁর কলঙ্ক, না—আমার কলঙ্ক? আমি ত তাঁহাকে কথনও মুখ ফুটিয়া বলি নাই। আমার ইচ্ছা না জানিয়া তিনি কেমনে আমাকে উদ্ধার করিবেন? কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি চলেন না। আমি তাঁহাকে আমার ইচ্ছা জানাই নাই, তাই বুঝি তিনি উদাসীন! এখন জানাইব কি? না জানাইয়াই বা কি করি? এত ঘৃণা, এত নির্য্যাতনের ভিতরে এ পাপ জীবন রাখিতে পারিব না। নাই বা পারিলাম, তাতেই বা কি? মরিই বা না কেন? চরিত্র গেল ত মানুষের থাকিয়া কাজই কি? তবে জলে ডুবি! না—না—দিদি বলেন, আত্মহত্যার ন্যায় আর পাপ নাই। যে

আত্মহত্যা করে, হিন্দুশাস্ত্রে তাহার শ্রাদ্ধ নাই, শুনিয়াছি, আর আর শাস্ত্রে স্বর্গ নাই। পাপে ত ডুবিয়াছি, আরও পাপের ভরা বৃদ্ধি করিব কেন? জগতের ঘৃণার ভয়ে? ছি ছি, জগৎ আমার সমস্ত পাপ জানুক, আরও জানুক। আমাকে আরও ঘৃণা করুক, আরও ঘৃণা করুক। কিসের অহঙ্কার? কিসের প্রশংসা? যে ডুবিয়াছে, তার আবার প্রশংসার লালসা কেন? আমি লোকের ঘৃণাই চাই। আজ হতে সকলকে বলিব—"আমাকে ছুঁইও না, আমি ডুবিয়াছি।" আয় ঘৃণা, আয় নিন্দা তোরা কাছে আয়। তোরাই আমার বন্ধু। তোদের চুম্বন করিয়াই থাকিব। বেশ কথা, তবে আবার ভাবিব কেন? আচ্ছা, দিদির স্বামীও যদি ঘৃণা করেন? না—তা অসম্ভব। আর যদিই ঘৃণা করেন, তারই বা ভয় কি? আমি তাঁরও ঘৃণা চাই, তাঁর পদসেবা করিব, এই আমার ব্রত, তিনি ভাল না বাসিলেও তাঁহাকে ভক্তি করিব। তিনি যে দেবতা! হায়, এ দেবতাকে কবে দেখিব? আমি কি ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় পাইব? আমাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য এ দেশে কি তিনি ভিন্ন আর কেহ আছেন? ব্রাহ্মসমাজ তুই আয়, আমাকে কোল দে। আমি ডুবিয়াছি, তুই আমাকে উদ্ধার কর্। হিন্দু-সমাজ আমার উদ্ধারের কথা বলে না, আমাকে বাজারে ঘর বাঁধিতে বলে, আরও ডুবাইতে চায়, আরও মজাইতে চায়!! কে কি না করে? সকলে পাপের কীট! পাপের কীট সকল আবার অন্যকে ঘৃণা করে! কি ব্যাপার! আমি আর থাকিতে পারি না; কবে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে যাইব? বরিশালের ব্রাহ্মসমাজকে এত পত্র লিখিলাম, কেহই আমাকে উদ্ধার করিতে আসিল না। তবে আমি কি করিব? স্বামীর বিষয়ের টাকা কড়ি মোকদ্দমার খরচ বলিয়া বাবা আত্মসাৎ করিতেছেন, নগদ টাকা থাকিলে না হয় নিজেই যাইতাম। যে কিছু টাকা ছিল, হতভাগ্যের পরামর্শে বরিশাল সেবিঙ্গস্ ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছি। এও তার একটা চক্রান্ত। হায়, টাকার অভাবে এ[illegible] জগতের নিকট এত দুঃখ জানাইলাম, কেহই আমাকে উদ্ধার করিল না। আমি কি করিব? হায়, আমার কি হইবে?

রাত্রি ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল, কিন্তু মুরলার চক্ষে ঘুম নাই। মুরলা আজ উন্মাদিনী। সমস্ত রাত্রি এইরূপ কত কি ভাবিলেন, কত অশ্রু ফেলিলেন, কত কাঁদিলেন, কেহই দেখিল না। বিধাতার কর্ণে এ সকল ক্রন্দনধ্বনি ও সকরুণ বিলাপ পৌঁছিল না কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উত্তেজনায়।

গভীর দুশ্চিন্তা, তাতে সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা, পরদিন প্রাতে আর যেন সে পূর্ব্বের মুরলা নাই। একদিন, একরাত্রে এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মুরলাকে আর দেখিলে চেনা যায় না;—মুখ মলিন, চক্ষু রক্তবর্ণ,—উজ্জ্বল রূপ নিষ্প্রভ,—নিষ্প্রভ আঁধার মুখে মৃদু মৃদু দুটী রক্তবর্ণ চক্ষু জ্বলিতেছে। মুরলা আজ বড়ই অন্যমনস্ক। ছোট ভাই বোনগুলি আজ প্রাতে দিদিকে দেখিয়া বড় একটা কাছ ঘেষিল না। বেলা বাড়িতে লাগিল। পিতা কখনও মুরলার সংবাদ লইতেন না, আজও লইলেন না। একটী ভাই মুরলাকে বড় ভালবাসিত। সে আসিয়া কাপড় ধরিয়া বসিল, বলিল, দিদি, তুমি আজ এরূপ হয়েছ কেন?

দিদি মুরলা বলিলেন, বিলাস, আমি তোদের জন্য বড় অস্থির হয়েছি। আমি এখানে আর থাকিব না, দিদির কাছে যাইব, তোদিগে কে দেখিবে, তাই ভেবেই আমি অস্থির হয়েছি।

বিলাস। দিদি, তুমি যাবে কেন? আমাদের ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে? আমাদের মত কি বড় দিদি তোমাকে ভালবাস্‌বে?

মুরলা। বিলাস, ভালবাসার জন্য যাচ্ছি না। তুই ছেলে মানুষ, তোকে আর কি বল্‌ব, আমার মন বড় অস্থির হয়েছে। আমি এখানে আর থাক্‌ব না।

বিলাস। কার সঙ্গে যাবে দিদি?

মুরলা। আজ প্রকাশের মা কলিকাতায় যাইবেন, তাঁর সঙ্গে যাইব।

বিলাস। আমিও তোমার সঙ্গে যাব দিদি। তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাক্‌ব না।

মুরলা স্নেহ ভরে বিলাসের মুখচুম্বন করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, তোদের বন্ধনে আমার সব দিক্ ডুবিল। মা কি দারুণ বন্ধনেই বেঁধে গিয়াছেন! আমি এ বন্ধনে আবদ্ধ না হলে, বুঝি বা আমার

পতন হ'তো না! হা ভগবান, তুমি কি করিলে! ভাবিতে ভাবিতে মুরলার চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বিলাস, দিদির চক্ষের জল দেখিয়া বড় আকুল হইল, বার বার বলিতে লাগিল, দিদি, তুমি কেঁদ না, সত্যই বলিতেছি, তোমার কষ্ট হলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।

মুরলা আবার বিলাসের মুখচুম্বন করিলেন।

বিলাস আবার বলিল, দিদি, তুমি যে প্রকাশের মায়ের নৌকায় জিনিস দিয়াছ, দাদারা তাহা জানিয়াছেন। তাহারা কিছুতেই তোমাকে যাইতে দিবেন না।

মুরলা। তুই কেমন করে জানিলি?

বিলাস। দাদা বড় দাদার সহিত আজ প্রাতে অনেক পরামর্শ করে-ছেন। তোমার জন্য তাঁরা বড় ব্যস্ত। তুমি এখানে থেকে যাহা ইচ্ছা কর, তাতে তাহাদের আপত্তি নাই; কিন্তু তোমাকে কিছুতেই এখান হইতে যাইতে দিবেন না।

মুরলা বিলাসের কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় একটী মাত্র আশা প্রাণে জাগিতেছিল, তাহাতেও প্রতিবন্ধক! তবে আর কি লইয়া মুরলা থাকিবে? মুরলার প্রাণ অস্থির হইল। বিলাসকে ভুলাইয়া বিদায় করিয়া আপন গৃহে যাইয়া দরজা আবদ্ধ করিলেন। নির্জ্জন গৃহে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, যদি কলিকাতায় যাইতে না পারি, তবে কি করিব? এই নরকে থাকিব কি? এস্থানে পাপ কিল্‌বিল্ করিতেছে।—না—তা কিছুতেই এখানে থাকা হইবে না। যাইব, না হয় মরিব। মন, ভাবিস্‌নে। আমি তোর জন্যই ব্যস্ত। শরীরের আর সব বিক্রয় করিয়াছি—কিন্তু তোকে পবিত্র রাখিব। মন, তুই ভাবিস্‌নে। পৃথিবী আমার পর, কিন্তু পৃথিবীকে তোর আপনার করিব। লোক আমাকে ভাল না বাসে, না বাসুক, আমি তোকে জগতের দ্বারে বেচিব! ভাবনা কিসের? সুপ্রসন্ন নরক; সে নরক ছাড়িয়াছি, তোর আর কিসের ভয়? এত মায়া, এত মোহ যখন কাটাইতে পারিয়াছি, তখন আমাকে অবিশ্বাস কি? শক্ত হ। আমাকে বল দে। এমন বল দে, সমস্ত জগৎ নিবিয়া গিয়াছে ভাবিয়াও আমি যেন অটল থাকি! প্রহার, নির্যাতন-ভয়ে ডরাইব? তুই রক্ষা কর, ভয় দেখাস্‌নে, আমি আর কাহাকেও ডরাই না। তুই আর

আমি, দুয়ে এক হইয়া থাকি। তুই আর আমি, দুয়ে মিলিয়া সহস্র হই, অযুত হই, লক্ষ হই। তুই ভাবিলেই আমি কাতর হই, পায়ে ধরি, আর ভাবিস্‌নে। আমি ত তোকেই চিনেছি, তোকেই প্রাণ সঁপেছি, আমি ত তোরই হয়েছি। তাই বলি, শক্ত হ, আর আমাকে শক্ত কর্। ভাই বোন, পিতা বিমাতা সকল ছাড়িব। কাহার মায়ায় আর থাকিব? মা স্বর্গে, স্বামী স্বর্গে—আর আমি নরকে, আমার ধর্ম্ম নরকে! আমি কাহার মায়ায় থাকিব? আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, সাধন ভজন, সকলই তুই, তোর পায়ে ধরি, আমাকে বল্ দে। খুব শক্ত হ। এই দুর্ব্বল শরীর সিংহতেজে মাতাইয়া তোল্। তুই কি না পারিস্? তোর ক্ষমতার অসাধ্য কি? তুই মানব-পুরে দেব-শক্তি; তোকেই আমি বিবেক বলিয়া জানি, তুই পারিস্ না কি? তুই পাহাড় কাঁপাইয়া দিতে পারিস্, আর আমাকে রাখিতে পারিস্ না? সত্যই বলি, তুই-ই আমার ঈশ্বর, তুই-ই স্বর্গ, তুই ই মোক্ষ। বল্, আমার গতি কি হবে? আমি কোথায় যাইব, কি করিব, তুই আমাকে বল্। স্থির হয়ে পরামর্শ দে।

পাগলিনীর মন, আজ পাগলিনী, সে ভাল পরামর্শ দিল না। সে বলিল, তোর পরিত্রাণ নির্ব্বাণ-রাজ্যে, এ সংসারে নহে।

মুরলা সে উত্তর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। পাগলিনীর মত উচ্চৈঃস্বরে গৃহ কাঁপাইয়া, শূন্য পরিপূর্ণ করিয়া বলিলেন, মন ত এই কথা বলিল, মা, তুমি কি বল? আমি কোন্ পথে যাইলে রক্ষা পাইব?

মাও যেন শূন্য হইতে বায়ু কাঁপাইয়া বলিলেন, "তোর মুক্তি নির্ব্বাণ রাজ্যে, ঐ সংসারে নহে, তুই মায়া কাটাইয়া চলে আয়। থাকিস্ নে, মরণের পথে আয়।"

মুরলার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল, কেন এরূপ হইতেছে, বুঝিতে পারিলেন না।

এমন সময়ে বিলাস আসিয়া দ্বারে আঘাত করিল। মুরলা দরজা খুলিলেন। বিলাস বলিল, দিদি, তুমি কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছিলে?

মুরলা বলিলেন, বিলাস, তুই-ই আমার পরামর্শ-দাতা, বল্ ত এখন কি করিব?

বিলাস কিছু না শুনিয়া না ভাবিয়া হঠাৎ উত্তর করিল, তুমি কলিকাতায় বড় দিদির কাছে যাও, এখানে আর থাকিও না।

মুরলা বিলাসের কথা মানিলেন। খুব ব্যস্ত হইলেন। যে যে জিনিস বাকী ছিল, নৌকায় দিলেন। জিনিস পত্র নৌকায় উঠিয়া কলিকাতা চলিল বটে, কিন্তু মুরলার সেদিন যাওয়া হইল না। দুই ভাই এবং গ্রামের আর লোকেরা মুরলাকে বাঁধিয়া রাখিল, প্রহার করিল। যা করার, সব করিল! মুরলা প্রহারে নির্য্যাতনে অর্দ্ধমৃতবৎ হইলেন। এই ঘটনায় মুরলার মন প্রতিজ্ঞা করিল, যেরূপে হউক, কলিকাতায় এক দিন যাইবই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিলাসের প্রেমাঙ্কুরিত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

পরদিন আরো অনেক কুৎসা রটনা হইল। মুরলা সুপ্রসন্নের অন্বেষণে কলিকাতায় যাইতেছেন, এরূপ কথা নানা জনে নানা ভাবে রটনা করিল। ব্রাহ্মসমাজে মুরলা ও সুপ্রসন্নের বিবাহ হইবে, মুরলার ভগ্নীপতি পুরোহিত হইবেন, ব্যঙ্গ করিয়া কত জনে কত রূপে এ কথা ঘোষণা করিল। গ্রাম্যলোকের সে সকল কথাবার্ত্তা আর চিত্র করিতে ইচ্ছা নাই। মোট কথা, ক্রমে ক্রমে মুরলার চক্রধরপুরে থাকা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। স্বামীকুলে বিষম শত্রু, পিত্রালয়ে এইরূপ নির্য্যাতন, হতভাগিনী দাঁড়ায় কোথা? কোন কোন বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোক বলেন, মুরলা বাজারে ঘর বাঁধুক। সে কথা শুনিয়া মুরলার আত্মীয়দের মনে বিষম জ্বালা উপস্থিত হয়। আত্মীয়েরা মুরলাকে বিষপান করাইতে উদ্যত হইলেন।

মুরলার ঠাকুর-মা মুরলাকে বড় ভালবাসেন, এক কথায় বলিতে গেলে, বাল্যকাল হইতে তিনিই মুরলাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। বয়স অশীতি বৎসর। তিনি ভাল মন্দ বুঝেন। তিনি মুরলার পিতার পরামর্শ শুনিয়াছেন। ঘটনাটা নূতন নহে, মুরলার পিত্রালয়ে এরূপ বিধবা-হত্যা অনেকবার হইয়াছে। ভ্রূণ-হত্যা কতবার হইয়াছে, সংখ্যা নাই। বিষ আসিয়াছে, ঔষধ বলিয়া মুরলাকে তাহা সেবন করানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। মুরলার ঠাকুর-মা একথা শুনিয়াছেন। তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন, মুরলার পিতা সে প্রতিবাদ শুনেন নাই। হায় হায়, মুরলাকে রক্ষা

করিতে এ পৃথিবীতে বুঝি বা আর কেহ নাই! হতভাগিনী আজ মরণের পথে চলিল!!

বিলাস চতুর ছেলে, সব শুনিয়াছে, সব বুঝিয়াছে। সে ছুটিয়া আসিয়া মুরলাকে বলিল, দিদি, তোকে বিষ দেবে, তুই আজ আর কিছু খাস্‌নে। আমি তোর জন্য কিছু খাবার ভিক্ষা করে এনে দেব।

মুরলা শিহরিয়া উঠিলেন, অবাক্ চিত্তে বিলাসের কথা, পরামর্শ শুনিলেন। আকৃতি গম্ভীর, মুখ মলিন। মুরলার চক্ষু হইতে গড়াইয়া কয়েক ফোটা জল পড়িল। সেই জল-সিক্ত মুখে বিলাসকে চুম্বন করিলেন। মনে ভাবিলেন, বিলাস বুঝি স্বর্গের দূত, আমাকে রক্ষা করার জন্য বিধাতা ইহাকে পাঠায়েছেন। তারপর বলিলেন, বিলাস, তুই আর আমার জন্য কত কষ্ট সহিবি? থাক্, আমি আজ আর কিছুই খাইব না। কে তোকে ভিক্ষা দেবে?

বিলাস বলিল, দিদি, সে জন্য তুমি ভেব না? না হয়, আমাকে যাহা খাইতে দিবে, লুকাইয়া তাহা তোমাকে আনিয়া দিব।

মুরলা। বিলাস, আমাকে আর কষ্ট দিস্ না, তোর খাবার জিনিস দিয়া আমি উদর পূরণ করিব? এ প্রাণ থাক্‌তে তা হবে না।

বিলাস বলিল, দিদি, আমার খাবার তুমি আমি দুজনেই নয় ভাগ করিয়া খাইব।

মুরলা। নয় এক দিন এরূপে চলিল, তারপর কি হইবে বিলাস?

বিলাস। এক দিন কি তুচ্ছ! আজ্‌কার কাজ আজ, কাল্‌কার কাজ কাল। এক দিন বেঁচে থাক, আজ বেঁচে থাক, কালকার চিন্তা কাল করো। দিদি, তুমি কি জাননা, বিধাতা কালকার বিধান করে রেখেছেন? চৌধুরী মহাশয় যখন তাঁহার ভগ্নীকে লইয়া যান, তখন তাঁহার কি সম্বল ছিল? বড় দিদি যখন অকূলে ঝাপ দিয়া তাঁহার স্বামীর সহিত গেলেন, তাঁহার কি সম্বল ছিল? তখনকার কর্ত্তব্য কাজ তখন তাঁরা করেছেন, বিধাতা তারপরের কর্ত্তব্য ঠিক করে দিয়াছেন। কালকার ভাবনা আমি ভাবি না। কাল হয় ত বাবার মন ফিরেও যেতে পারে।

বিলাস ১২ বৎসরের বালক, তার মুখে এত উচ্চ কথা! এ জগতে অসম্ভব কি? বিধাতার কৃপা হইলে বোবা কথা কয়, জন্মান্ধ দর্শন করে। বিলাসের ভিতর দিয়া আজ বিধাতা অবতীর্ণ।

মুরলা মোহিত হইলেন, বিলাসের নিকট তর্কে পরাস্ত হইলেন। ভাবিলেন, বিলাসই আমাকে বাঁচাইবে। বলিলেন, বিলাস, আচ্ছা তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

আজ মুরলাকে খাওয়াইতে সকলের একান্ত যত্ন। আর কোন দিন কেহ খোজ খবরও লয় না। মুরলা ইহার ভাব বুঝিয়াছেন, বলিতেছেন, আমার শরীর বড় ভাল নয়, আজ আর কিছুই খাইব না। মুরলার বিমাতা বলিলেন, "আর কিছু না খাও, আমার মাথার দিব্বি, এই দুধটুকু খাও।" মুরলা সে কথাও শুনিলেন না। সুতরাং শেষে চক্রান্ত-কারীদের অনেকে পড়িয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। ক্রমে কবিরাজ ডাক্তার হাত দেখিল এবং বলিল, অসুখ কিছুই নয়। তাতেও মুরলা আহারে রাজি হইলেন না। ক্রমে তিরস্কার, গালাগালির চূড়ান্ত হইল, বিমাতার তীব্র নিদারুণ বাণী মুরলাকে অস্থির করিয়া তুলিল। শেষে প্রহার পর্য্যন্ত হইল। মস্তকে কাষ্ঠপাদুকার আঘাতে রক্ত নির্গত হইল। আজানুলম্বিত সুচিক্কণ কৃষ্ণ কেশরাশি রক্তময় হইল; আঘাতে আঘাতে সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল। কেহ নিবারণ করিবার নাই, বুড়ো ঠাকুর-মার কথা কেহ শুনে না; বিলাস, দিদির দুর্দ্দশা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, কখনও বাবার পা ধরিতেছে, কখনও দাদাদের পা ধরিতেছে, কখনও বিমাতার পা ধরিতেছে। সকলের বুক পাষাণে বাঁধা; কেহই বালকের সে ক্রন্দন শুনিল না। প্রহারে যখন মুরলা অৰ্দ্ধমৃতবৎ হইলেন, তখন বল পূর্ব্বক কতকটা দুধ সেবন করান হইল। হা ধৰ্ম্ম, হা ঈশ্বর, তুমি আজ কোথায়?

দুধ খাওয়াইয়া সকলে নিরস্ত হইয়া প্রফুল্ল মনে প্রস্থান করিল, একা-কিনী মুরলা অৰ্দ্ধমৃতবৎ, ধূলায় ধূসরিতা। যখন সকলে চলিয়া গেল, তখন ঠাকুর-মা কাছে আসিয়া মুরলার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বিলাস মহা বিপদ বুঝিয়া তখনই কতকটা মাছের পিত্তি জলে গুলিয়া মুরলাকে খাওয়াইয়া দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে মুরলার পেটের সমস্ত জিনিস উদ্গীরিত হইয়া পড়িল। বালক বিলাস তখন একটু সুস্থ হইয়া দিদির শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। দিদির চেতনা নাই, বিলাসের মুখ মলিন। সমস্ত দিন এই ভাবেই গেল। মুরলাও কিছু খাইল না, বিলাসও কিছু খাইল না। রাত্রে বিলাস যোগাড় করিয়া মুরলাকে কিছু খাইতে দিল। তখন মুরলার

একটু সংজ্ঞা হইয়াছে। মুরলা বলিলেন, বিলাস তুই কি কিছু খেয়েছিস্? বিলাস বলিল, "তুমি খাও নাই, আর আমি খাইব? আমার সমস্ত খাবার জিনিস এই দেখ রহিয়াছে। এখন তুমি খাইয়াছ; এখন আমি কিছু খাইব।" বিলাস তারপর কিছু খাইল। বিলাসের এ অমানুষিক ভালবাসা দেখিয়াও সে পাষাণপুরীর কেহই মোহিত হইল না; যে যেমন ছিল, সে তেমনই রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভীষণ রাত্রি।

সকলের আশা ছিল, রাত্রের মধ্যেই মুরলা মরিবে, কিন্তু মুরলার কিছুই হইল না। সকলে বিস্মিত হইল, মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। কি করিলে কি হইবে, সকলের চিন্তা হইল। আজ সকলেই বিষণ্ণ, বিলাস কেবল আনন্দিত। পর দিন মুরলা বরিশাল হইতে এইরূপ এক খানি পত্র পাইলেন।—"দেবি, আপনার সকল পত্রই পাইয়াছি, সম্প্রতি সুপ্রসন্ন বাবুর নিকট আমরা সমস্ত অবগত হইলাম। আপনি ব্রাহ্মসমাজে আসিতে চাহিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর সুখের কথা কি? ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত। আগামী বৃহস্পতিবার এখান হইতে লোক সহ নৌকা প্রেরিত হইবে, ঐ দিন রাত্রি ১০টার সময় আপনাদের ঘাটে নৌকা পৌছিবে। আপনি গোপনে ঘাটে লোক রাখিবেন। সুপ্রসন্ন বাবু পৃথক নৌকায় যাইবেন। তিনি আপনাকে বাড়ী হইতে আনিয়া আমাদের নৌকায় তুলিয়া দিবেন। এখান হইতে এক জন ব্রাহ্ম বন্ধু যাইবেন। কোনও ভয় নাই। বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া চলিয়া আসিবেন। তিনি সকল বিপদের সহায়, সকল অবস্থার আশ্রয়। আমরা বরিশালে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। শ্রীমতী জ্ঞানদা।"

মুরলা পত্র পড়িয়া আনন্দিত হইলেন, কিন্তু সুপ্রসন্ন আবার আসিবে শুনিয়া প্রাণটা যেন কেমন কেমন করিয়া উঠিল। ভাবনা দূর হইল না। আবার কি সুপ্রসন্নের হাতে পড়িব?—সুপ্রসন্ন না পারে এমন কাজ নাই, সে চক্রান্ত করিয়া কি আমাকে আত্মসাৎ করার চেষ্টায় আছে? আর

উপায় না পাইয়া এই উপায়ে আমাকে বাড়ীর বাহির করিবার এটা একটা ফন্দি না ত? এইরূপ অনেক কথা ভাবিলেন। যাহা অদৃষ্টে আছে, ঘটিবে, চক্রধরপুর আর জীবন রাখার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া বৃহস্পতিবার বাড়ী হইতে বাহির হইবেন, মনস্থ করিলেন। বিলাসকে পত্র দেখাইলেন। বিলাস ভাল পরামর্শ দিল না; বিলাস বলিল, "আজ ছোট দাদার আসার কথা আছে, সে বাড়ী আসিলে পরামর্শ করিয়া যে হয় করা যাইবে।"

বিলাসের জেঠা মহাশয়ের দুটী ছেলে, তাহার একটীর নাম গিরীশ ও অপরটীর নাম উমেশ। উমেশ খুব ভাল ছেলে। গিরীশ দেশে থাকিয়া কেমন একরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। মুরলার প্রতি অত্যাচারের সেও একজন পাণ্ডা। উমেশের এই চৌদ্দবৎসর বয়স, উমেশ কলিকাতায় তাহার সহোদরা ভগ্নীর বাসায় থাকিয়া পড়িত। উমেশ বুদ্ধিমান বালক। উমেশের চেষ্টাতেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি মুরলার আকর্ষণ বাড়িয়াছে। উমেশ মুরলাকে যারপর নাই ভালবাসিত। মুরলার সহায় বিলাস ও উমেশ। মুরলার জেঠা মহাশয় বাল্যকালাবধি মুরলাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া এ সকল ভালবাসার মমতা কতক পরিমাণে বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি এখন নিরপেক্ষ। তিনি এখন মুরলার সহায়ও না, বিপক্ষেও না। সহায় উমেশ, বিলাস ও ঠাকুর-মা। কলিকাতায় সহায় মুরলার দিদি ও দিদির স্বামী। ঠাকুর-মা ক্ষমতাহীনা, বুদ্ধি তেজ সব বয়সের ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে। এখন কেবল কোনরূপে ঘরখানা যেন ঠেকা দিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি থাকিয়াও যেন নাই। মুরলার সহায় উমেশ ও বিলাস;—অথবা দুটী বালক। এই দুটী বালকের ভিতর দিয়া বিধাতা মুরলার পথ পরিষ্কার করিতেছেন। এ পথ অন্ধকারে যাইবার, না আলোক পাইবার, তা বিধাতাই জানেন।

সেইদিনই উমেশ বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল। অনেকদিন পর উমেশ বাড়ীতে আসিয়াছে, ইহাতে অনেকেরই আনন্দ হইল। মুরলার কথা সকলে ভুলিল। পূর্ব্বদিন জীবন পাওয়ায়, মুরলা আজও রক্ষা পাইল। বিলাসের কথার সুফল ফলিল।

উমেশ একে একে সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া শেষে মুরলা দিদির সহিত দেখা করিল। বিলাস ছোট দাদার কাণে কাণে সব বলিয়া

দিয়াছে। মুরলার প্রতি ভাবান্তর দেখাইবার জন্যই উমেশ সকলের শেষে মুরলার সহিত সাক্ষাৎ করিল। উমেশ কিন্তু সকলের অপেক্ষা মুরলাকেই অধিক ভালবাসে। এক কথায়, বাড়ীতে আসার কারণই এই আসক্তি।

উমেশ মুরলা দিদিকে প্রণাম করিলে মুরলা বলিলেন, ভাই, আমার সোণার ভাই, ভাল আছ ত?

উমেশ বলিল, ভাল আছি।

উমেশ সকলই শুনিয়াছে, মুরলার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিল না; মলিন মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মুরলা বলিলেন, বোধ করি সকলই শুনিয়াছ। আজ আর তোমার সহিত দেখা হইবে কি না, জানি না। এই পত্রখানি দেখ; এবং কি করা উচিত, এখনই পরামর্শ দেও।

উমেশ একাগ্রচিত্তে বরিশালের পত্র পড়িল, তারপর বলিল, দিদি, তোমার এ বাড়ীতে থাকা আর উচিত নয়। যেরূপে হয়, ব্রাহ্মসমাজে যাও। তোমার আর নিরাপদ স্থান নাই।

মুরলার পরামর্শ ঠিক হইল। সুপ্রসন্ন হইতে যত বিপদের আশঙ্কা থাকুক, একপথ ভিন্ন যখন আর পথ নাই, তখন যাওয়াই ঠিক হইল। বরিশালে একখানি পত্র লিখিয়া সুপ্রসন্নের আসা নিষেধ করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, বরিশালের ব্রাহ্মদের মনে সন্দেহ হইলে আমাকে আর নিতে আসিবে না। ইহা একরূপ কপটতা, সন্দেহ নাই, কিন্তু বিপদ হইতে এবং পাপের ভয়ানক আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার যখন আর উপায় নাই, তখন কোন প্রকার পত্রাদি না লিখিয়া বৃহস্পতি-বারের জন্য অপেক্ষা করাই ধার্য্য হইল।

দুইদিন পরই বৃহস্পতিবার আসিল। উমেশের সহিত মুরলা এই দুইদিন আরো অনেক পরামর্শ ঠিক করেছেন, সে সকল উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নাই। বৃহস্পতিবার উমেশ ও বিলাস মুরলাকে অনেক আশ্বাসের কথা বলিল। মুরলা সাহসে বুক বাঁধিলেন।

মুরলাদের গৃহের দক্ষিণে একটী পুকুর, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই পুকুর একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর সহিত সংযুক্ত। চক্রধরপুরের অনেক পুকুরই স্রোতের সহিত এইরূপ সংযুক্ত। ভাঁটার সময় পুকুরে জল থাকে না, জোয়ারে পূর্ণ হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে জোয়ার আসিয়াছে। ধীরে ধীরে জল

আসিয়া পুকুরকে ভরিয়া তুলিয়াছে। বিলাস, উমেশ ও মুরলা বরিশালের নৌকার অপেক্ষায় পুকুরের ধারে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছে। ভাই ভগ্নীর আলাপ, বাড়ীর কাহারও মনে সন্দেহ নাই। আজ কৃষ্ণাষ্টমী, সন্ধ্যাকালে চক্রধরপুর যে অন্ধকারে গ্রাস করিয়াছিল, তাহা তিরোহিত হইতেছে, মলয় বহিতেছে, পুকুরের ধারে নারিকেল গাছের পাতা তুলিয়া তুলিয়া চাঁদের আলোতে ক্রীড়া করিতেছে।

রাত্রি দেড়প্রহরের পর চক্রধরপুর নিস্তব্ধ হইয়াছে, এমন সময়ে সেই ক্ষুদ্র পুকুর ধারে একখানি নৌকা ধীরে ধীরে লাগিল। কোন সাড়াশব্দ নাই। বিলাস ও উমেশ অগ্রসর হইয়া অনুসন্ধান লইল, নৌকা বরিশাল হইতে আসিয়াছে। নৌকার মাঝী প্রথমে বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, বিলাস, "ভয় নাই, আমরা তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছি," বলিলে, মাঝী বরিশালের কথা বলিল। বলিল, "বরিশাল হইতে আর একখানি বড় নৌকা আসিয়াছে, সে নৌকায় আরো লোক আছে। মুরলা ঠাকুরুণকে নিবার জন্য আমরা আসিয়াছি।" এই বলিয়া একখানি পত্র দিল। বিলাস পত্র লইয়া স্থানান্তরে যাইয়া পড়িল এবং তখনই ফিরিয়া আসিল। মাঝী যে সকল কথা বলিল, সে সকল কথা সে কোন লোকের পরামর্শ অনুসারে আস্তে আস্তে বলিতেছিল। নৌকার মধ্যে কে, এ কথা মাঝী বলিল না, বলিল, আমাদেরই একজন মাঝী, অসুস্থ হওয়ায় শুইয়া রহিয়াছে, সে এ গ্রামের সকল সংবাদ জানে; সে আপনাদিগকেও চিনে।

আর ভাবিবার সময় হইল না। মুরলা, বিলাস ও উমেশের পরামর্শে নৌকায় উঠিলেন; নৌকা তখনই ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বিলাস ও উমেশ তখনই আপন আপন শয্যার আশ্রয় লইল।

নৌকা পুকুর ছাড়িয়া চক্রধরপুরের খালে যখন উপস্থিত হইল, তখন সুপ্রসন্ন আর লুক্কায়িত রহিল না। প্রদীপ জ্বালিল এবং মুরলাকে সাদর অভ্যর্থনা করিল। সুপ্রসন্নকে দেখিয়া মুরলার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, মুখ রক্তবর্ণ হইল, বলিলেন, ব্রাহ্মদের নৌকা কোথায়? আমাকে সে নৌকায় তুলিয়া দেও, নচেৎ আমি এখনই জলে ডুবিয়া মরিব।

সুপ্রসন্ন বলিল, মুরলা, আমি তোমার জন্য কি না করেছি! ব্যস্ত হইও না। আমি তোমার জন্য পাগল হয়েছি, আমাকে তুচ্ছ করিও না। চল, আমরা বরিশালে যাই।

মুরলা আরো উত্তপ্ত হইলেন, কিন্তু ভাবিলেন,—সুপ্রসন্নের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর উপায় দেখিতেছি না; এক উপায়, জলে ঝাঁপ দেওয়া, তাতেও মৃত্যু ঘটিবে না, কেননা, ছোট খাল, এখনই তুলিবে। সুতরাং বড়ই নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। মিনতি সহকারে বলিলেন,—"তুমি আমার একটা কথা রাখ; হিন্দুসমাজে আমার স্থান নাই, এখন ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রয়ে কাঁটা পুতিও না, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ব্রাহ্মদের নৌকায় আমাকে তুলিয়া দেও।

নিষ্ঠুর সুপ্রসন্ন মুরলার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। অনেক ভালবাসার কথা, অনেক সুখের কথা, অনেক প্রলোভনের কথা বলিল। বলিল, মুরলা, তুমি জাননা, আমি তোমাকে কত ভালবাসি; আমি আমার দুই স্ত্রীর মমতা ছাড়িয়াছি, পিতা মাতার ভালবাসা তুচ্ছ করিয়াছি, প্রাণপ্রতিম সন্তানের মমতা ছাড়িয়াছি, কেবল তোমারই জন্য; তুমি ত জাননা, আমি তোমাকে কত ভালবাসি! শুনিয়াছি, সকল ভালবাসার মূল রমণীর হৃদয়; কিন্তু তোমাকে এরূপ পাষাণী করিয়া কে গড়িল? আমি তোমার জন্য লজ্জা, সম্ভ্রম—পৃথিবীর সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তুমি ক্রমাগত আমাকে তুচ্ছ করিয়া চরণে ঠেলিতেছ। মুরলা, সকলেরই সীমা আছে, সাবধান হও, কথা রাখ, আমার সহিত চল। চল, আমরা দুজনে বনে যাই। চল, দুজনে সংসার ছাড়ি। না হয় এস, আজ দুজনেই মরি। ব্রাহ্মসমাজে তোমার স্থান হইবে না, যদি হয়, তুমি আমাকে পাইবে না, আমি তোমাকে পাইব না। কেন বঞ্চিত হও? চল বরিশালে যাই। আমার পিতা মোক্তার। মোকদ্দমা করিয়া তোমার বিষয়ের টাকা আদায় করিব, তারপর উভয়ে মিলিয়া কলিকাতায় যাইব। কি বল, মুরলা, কথার উত্তর দেও।

সুপ্রসন্নের কথা শুনিয়া মুরলার সকল আশা দূর হইল। দুনয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল। কোন কথারই উত্তর দিলেন না।

সুপ্রসন্ন পাগলের ন্যায় আবার বলিতে লাগিল, তুই পাষাণে প্রাণ বেঁধেছিস্, তুই আমার ভালবাসা কি বুঝিবি? আমি তোর জন্য পাগল হয়েছি, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছি। মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিসনে, আমাকে চরণে ঠেলিলে তোকে সুখে থাকিতে দিব। আমি সকল কথা প্রচার করিব। আমাদের অবৈধ প্রণয়, গুপ্ত বিবাহের কথা ব্রাহ্মসমাজে

ব্যক্ত হইলে, পাপীয়সি, নিশ্চয় জানিস্ তোকে কেহই ছুঁইবে না। যা মনে ভাবিতেছিস্, আমি থাকিতে তা কখনই হইবে না। তুই যা বলিবি, আমি তাই করিব, আসক্তি, কামনা, সব ডুবাইব, পায়ে ধরি, কথা রাখ্।

মুরলা তবু কোন কথারই উত্তর করিলেন না। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

সুপ্রসন্ন আবার বলিতে লাগিল, আমার কথা না রাখিলে তোরও প্রাণ লইব, আমিও আত্মহত্যা করিব। আমার প্রতিজ্ঞা, হয় তোকে লইয়া সংসার করিব, না হয়, উভয়ে মরিব।

মুরলা তবুও কথা বলিলেন না। সে রাত্রি এই ভাবেই গেল। নৌকা সুপ্রসন্নের আদেশে বরিশাল অভিমুখে ছুটিল। মুরলা তার পরদিন কিছুই আহার করিলেন না, আর কোন কথাই বলিলেন না। নৌকা যথা-সময়ে বরিশাল পৌছিলে, সুপ্রসন্ন মুরলাকে আপনাদের বাসায় তুলিল। সুপ্রসন্নের পিতা টাকার প্রলোভনে পুত্রের এই অবৈধ আচরণের বিরুদ্ধে একটী কথাও বলিলেন না। এমনই ভয়ানক লোক!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিলাস ও উমেশের পরামর্শ।

সে রাত্রি হতভাগিনী মুরলার সংবাদ আর কেহই লইল না। পরদিন ক্রমে ক্রমে সকলে জানিল, মুরলা পলায়ন করিয়াছে। কেহ মুরলার পিতাকে মন্দ বলিল, কেহ মুরলাকে মন্দ বলিল। কেহ বলিল, "হতভাগিনীর কপালে কেবলই দুঃখ লেখা আছে। নচেৎ ১২ বৎসর বয়সে এমন সাধের মেয়ের শাঁখা সিঁদুর উঠিবে কেন?" মুরলার পিতা, জেঠা সকলে পরদিন ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যাহা মনে ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না; মুরলার ইচ্ছাই পূর্ণ হইল, কুলে কালী পড়িল, এ কথা আর কাহাকেও বলিবার নয়। পরদিন মুরলার পিতা বরিশাল চলিলেন, জেঠা কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। বিলাস এবং উমেশ রাত্রির সংবাদ পাওয়ার জন্য একটু উদ্বিগ্ন হইল। তাহারা প্রত্যূষে চক্রধরপুরের বাজারের দিকে চলিল। পথে দেখিল,

একটী ছোট ঝোপের মধ্যে একখানি নৌকা লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহারা উভয়ে সেই নৌকার ধারে গেল। যাইয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল, নৌকায় কে? নৌকা কোথায় যাইবে?

নৌকার ভিতরে সারদা বাবু ছিলেন, তিনি বিলাস ও উমেশের পরিচিত, তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "আমি সারদা।"

বিলাস এবং উমেশ নৌকায় উঠিল। উঠিয়া বলিল, আপনি এখনও এখানে কেন?

সারদা বাবু উভয়কে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল আপনার ভগ্নীর বরিশাল যাওয়ার কথা ছিল, তিনি আসিলেন না কেন? তাঁহারই জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি।

উমেশ। তাঁহাকে ত কাল আপনাদের নৌকায় উঠাইয়া দিয়াছি।

সারদা। কোন্ নৌকায়?

উমেশ। যে নৌকা আপনারা পাঠাইয়াছিলেন। কেন, আপনার সহিত দিদির কি সাক্ষাৎ হয় নাই?

সারদা বাবু বড়ই বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, না, সাক্ষাৎ হয় নাই। কাল সুপ্রসন্ন বাবু একখান নৌকা লইয়া গিয়াছেন, তারপর আর ফিরেন নাই। তিনি কোন বিপদে পড়িলেন কি না, সমস্ত রাত্রি ভাবিতেছিলাম। তিনি কোথায় গেলেন?

সুপ্রসন্ন বাবুর কথা শুনিয়া উমেশ ও বিলাসের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। সব যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। উভয়ের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। উমেশ বিলাসকে বলিল, বিলাস, বুঝি বা এতদিন পর দিদিকে হারাইলাম!

সারদা বাবু বিলাস ও উমেশের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন না। মুরলাকে ব্রাহ্মসমাজে দিতে বিলাস ও উমেশের একান্ত যত্ন, সারদা বাবু জানিতেন; অথচ ইহারা কেন কাঁদিতেছে, সারদা বাবু বুঝিতে পারিতেছেন না; বলিলেন, আপনারা কাঁদিতেছেন কেন?

উমেশ সংক্ষেপে সুপ্রসন্ন বাবুর কাহিনী বিবৃত করিল। সুপ্রসন্ন এক জন নরাধম ব্যক্তি, সারদা বাবু বুঝিলেন। বুঝিলেন, মুরলাকে উদ্ধার করিবার আর উপায় নাই। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন; এবং আর অপেক্ষা করা যুক্তিসিদ্ধ নয় ভাবিয়া তখনই বরিশাল রওয়ানা হইলেন।

উমেশ ও বিলাস বাড়ী আসিয়া সুপ্রসন্নের কথা ব্যক্ত করিল। সুপ্রসন্নের প্রতি অনেকেই বিরক্ত হইল, কেবল যে সকল জ্ঞাতিরা ইহাদের অনিষ্ট চায়, তাহারা পুলকিত হইল। চক্রধরপুরের অনেক লোকই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বহুলোক সেই দিনই বরিশাল যাত্রা করিল। উমেশ বিলাসও বরিশাল চলিল। ঘরে ঘরে কত কাণাকাণির হাট বসিয়া গেল, কেহ তাহার ইতিহাস লিখিল না। পথিমধ্যে বিলাস ও উমেশ এইরূপ পরামর্শ করিল।

বিলাস। দাদা, দিদিকে কি পাইবে?

উমেশ। আশা করি পাইব। দিদি আমাদিগকে কখনও ভুলিবেন না।

বিলাস। দাদা, দিদি যদি সুপ্রসন্ন বাবুকে ছাড়িয়া না আসেন?

উমেশ। তাহা অসম্ভব। কথা এই, দিদিকে এখন কোথায় রাখি?

বিলাস। কেন ব্রাহ্মসমাজে?

উমেশ। দিদির নামে যে কলঙ্ক রটনার সূত্রপাত হইল, ব্রাহ্মসমাজ দিদিকে আশ্রয় দিবে কি না, সন্দেহ।

বিলাস। ব্রাহ্মসমাজে কি অনুতপ্ত পতিতদের স্থান নাই?

উমেশ। তেমন কোন স্থান নাই।

বিলাস। খ্রীষ্টানেরা যেমন পাপীদের জন্য অস্থির, ব্রাহ্মেরা কি সেরূপ নয়?

উমেশ। না, ব্রাহ্মেরা সেরূপ নয়। ব্রাহ্মেরা কিছু ভীরু। লোকে মন্দ বলিবে, এই ভয়েই অনেকে অস্থির। তাঁহারা অন্যের কথা সহ্য করিতে পারেন না।

বিলাস। তবে ব্রাহ্মসমাজ এদেশের কি উপকার করিবে? যাহারা ভাল হইতে চায়, এমন পতিত ও পাপীদিগকে যদি ব্রাহ্মসমাজ আশ্রয় না দেয়, তবে ব্রাহ্মসমাজ থাকিল কি ডুবিল, এই দেশের কোন উপকার কি অপকার নাই।

উমেশ। সে সকল বিচার পরে হইবে। এখন ভাব, দিদিকে কোথায় রাখি?

বিলাস। চৌধুরী মহাশয় দয়ার সাগর, দিদিকে তাঁহার বাসায় পাঠাইতে পারিলে আর ভয় কি?

উমেশ। তিনি সদা নানা কাজে ব্যাপৃত, তিনি কি আসিবেন?

বিলাস। নিশ্চয় আসিবেন, তিনি যে দয়ার সাগর। নিরাশ্রয়কে

আশ্রয় দিতে, বিধবার অশ্রু মুছাইতে, পাপীকে উদ্ধার করিতে তাঁর ন্যায় আর এদেশে লোক নাই। তিনি সংবাদ পাইলে নিশ্চয় দিদিকে গ্রহণ করিতে আসিবেন। আমরা দিদিকে বুঝাইয়া, বাবার মত করিয়া তাঁহার হস্তে দিদির সমস্ত ভার সমর্পণ করিব।

উমেশ বলিল, এই পরামর্শই ঠিক্‌।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মুরলার জীবনে এত কষ্টও ছিল !

অনেক লিখিতে পারি, অনেক বলিতে পারি, কিন্তু সুপ্রসন্ন ও তাহার পিতার পরবর্ত্তী ব্যবহার আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না। দুই দিন মুরলাকে গোপনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া সুপ্রসন্নের পিতা মুরলার সেবিঙ্গস্‌ ব্যাঙ্কের টাকা কড়ি ও বাক্সের অলঙ্কারাদি আত্মসাৎ করিয়াছেন, বিষয় সম্বন্ধে একটা পাকা লেখাপড়া করিয়া লইয়াছেন। মুরলা ব্রাহ্মসমাজে যাইবার জন্য উন্মাদিনী হইয়াছেন। মুরলার মত ফিরাইবার জন্য সুপ্রসন্ন প্রথম বিনয়, তারপর স্তুতি, তারপর ভয় প্রদর্শন করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে। তারপর মুরলাকে বাঁধিয়া প্রহার করিয়াছে। শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। পাড়ার সকল লোক একত্রিত হইয়াছে। সকল সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে। কলঙ্কের উপর কলঙ্ক পড়িতেছে। মুরলাও মরিবে, কথা রাখিবে না; সুপ্রসন্নও ছাড়িবে না। বিধাতার কালীর দাগে কি লেখা আছে, কে জানে ?

মুরলা সুচতুরা, এইপ্রকার নির্য্যাতনের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজে সংবাদ দিয়াছেন। বরিশালের ব্রাহ্মসমাজ নিস্তেজ বা নিষ্প্রভ নহে। বরিশালের ব্রাহ্মসমাজ নিরাশ্রয়া বা পতিতাদের প্রতি উদাসীন নহে। বরিশালের ব্রাহ্মসমাজে দুঃখীর জন্য প্রাণ দিতে পারে, এমন মহৎ লোক আছে। যে দিন মুরলা বরিশাল পৌছিয়াছেন, তার পর দিনই সারদা বাবু বরিশাল পৌছিয়াছেন। সারদা বাবু ধীর, সারদা বাবু পরের জন্য না করিতে পারেন, এমন কাজ নাই। বরিশালে পৌছিয়া সমস্ত ঘটনা আরো উজ্জ্বল রূপ অবগত হইলেন। দেখিলেন, বরিশালের ঘাটে পথে মুরলার কুৎসা

নানা অকথ্য ভাষায় নানারূপে রটিত হইতেছে। তাহার প্রাণ অস্থির হইয়াছে; হিন্দুসমাজের অনেক বন্ধুকে বলিলেন, "ছি, হিন্দুসমাজ কি মৃত? পুরুষের সাত খুন মাপ, আর কুলের কামিনীর নামে এত কুৎসা? হা ধর্ম্ম, তুমি কোথায়?",

সারদা বাবু, তিলক বাবুর বাড়ীতে যাইয়া মুরলার পত্র দেখিলেন। মুরলা আসিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহাকে উদ্ধার করিতে কে যাইবে? কোন লোক সাহস পাইতেছে না। সারদা বাবু, ব্রাহ্মসমাজকে ধিক্কার দিয়া একাকী সুপ্রসন্নের বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

সুপ্রসন্ন সারদা বাবুকে দেখিয়াই ক্রোধে অধীর হইল, ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল, সারদা বাবু, আপনি আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন না, অনধিকার প্রবেশ হইবে। আমি আপনার নামে নালিস করিব।

ব্রাহ্মসমাজ হইতে লোক আসিয়াছে শুনিয়া মুরলা চিৎকার করিয়া বলিলেন, দোহাই ঈশ্বরের, আমাকে এই নির্য্যাতনের হাত হইতে উদ্ধার করুন। আমাকে সুপ্রসন্ন বাবু আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, আপনি যিনিই হউন, বিধাতার নামে আমাকে রক্ষা করুন।

মুরলার করুণ স্বর শুনিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। সারদা বাবু ঠিক থাকিতে পারিলেন না, তাহার প্রাণে কি এক স্বর্গীয় শক্তি অবতীর্ণ হইল, তিনি আপন অবস্থা, পরের বাড়ী ভুলিলেন। উন্মত্তের ন্যায় সুপ্রসন্নের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

সুপ্রসন্ন ইহা দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিল না। সে ক্রোধে উন্মত্ত, গৃহের অস্ত্র লইয়া সারদা বাবুকে ধরিল। অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিল। বলিল, সারদা বাবু, এখনও ক্ষান্ত হও, নচেৎ আমার হাতে আজ তোমার প্রাণ যাইবে।

সারদা বাবু আঘাত খাইয়াও ফিরিলেন না। দ্রুত যাইয়া মুরলাকে নিমেষের মধ্যে বন্ধন-মুক্ত করিলেন। তারপর বলিলেন, দেবি, আমার সহিত আসুন, ভয় কি, আমার প্রাণ থাকিতে আপনার ভয় নাই। মুরলা উন্মাদিনী, লজ্জা ভয় তাহার চলিয়া গিয়াছে, তিনি প্রায় বিবসনা হইয়াছেন, বন্ধনমুক্ত হইবামাত্র তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া সারদা বাবুর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, চলুন, আমি হয় আজ রক্ষা পাইব, নয় প্রাণ দিব। চলুন।

সুপ্রসন্নের আর সহ্য হইল না, মুরলার এইরূপ ব্যাকুল ভাব দেখিয়া কতক নরম হইল, কতক অপমানে ম্রিয়মান হইল। নিমেষের মধ্যে মুরলার পা ধরিয়া বলিল, মুরলা, একদিন তুমি হৃদয়ে স্থান দিয়াছ, আজ কাতরে ভিক্ষা মাগিতেছি, তুমি আজ চরণে স্থান দেও।

মুরলা সুপ্রসন্নের সে বিনয়, সে নত অবস্থা দেখিয়া বিগলিত হইলেন। তাহার পা আর চলিতে চাহিল না। তিনি সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুপ্রসন্ন তারপর সারদা বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, নরাধম, তুই জানিস্‌নে মুরলা আমার বিবাহিতা স্ত্রী, কোন্ সাহসে পরের বাড়ী লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিস্? এ কি গবর্ণমেণ্টের রাজ্য নয়?

এই অপমানের কথা শুনিয়া মুরলা আবার ক্রোধে উষ্ণ হইয়া বলিলেন, সুপ্রসন্ন বাবু, তুমি আমার অনেক ক্ষতি করেছ, আমি আর পারি না, সারদা বাবুর অপমান আমি আর সহ্য করিতে পারি না। আমি এখনই যাইব।

সুপ্রসন্ন, কখনই যাইতে দিব না, এই বলিয়া মুরলার হাত ধরিয়া টানিয়া পৃথক ঘরে বলপূর্ব্বক মুরলাকে আবদ্ধ করিল এবং যতদূর সম্ভব, সারদা বাবুকে অপমান করিল।

সারদা বাবু আর উপায়ান্তর না দেখিয়া তিলক বাবুর বাসায় আসিলেন। আসিবার সময় মুরলা ডাকিয়া বলিলেন, আপনি দেখিলেন, আমাকে সুপ্রসন্ন বাবু আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; যেরূপে হয়, আমাকে উদ্ধার করিবার পথ করুন, নচেৎ আমি আজই আত্মহত্যা করিব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তিলে তাল।

বরিশাল একটী ক্ষুদ্র সহর, খুব প্রাচীন নয়, খুব আধুনিকও নয়। বরিশালের অনতিদূরে, পশ্চিমে, কাশীপুর গ্রাম। এই গ্রামটী খুব প্রাচীন, এখন বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই কাশীপুর, মুরলার ভগ্নীপতি অরবিন্দ চৌধুরীর মাতুলালয়। জনপ্রবাদ, এই কাশীপুর অরবিন্দ চৌধুরীর জন্মস্থান। কাশীপুর যেরূপ প্রাচীন, বরিশালকে তত প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। বরিশাল

ক্ষুদ্র সহর, কিন্তু রাস্তাগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাড়ী ঘরগুলি সুন্দর পরিপাটী। বরিশালের পূর্ব্ব ও দক্ষিণে নদী, এই নদীর ধারে একটী সুন্দর রাস্তা। এই নদীর জল বরিশালের পার্শ্বস্থ নর্দ্দমায় জোয়ারের সময় প্রবাহিত হয়। বরিশালের ন্যায় সুন্দর সহর পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আর নাই। ব্যবসা বাণিজ্য, মামলা মোকদ্দমায় বরিশাল পূর্ব্ব বঙ্গের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ, সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্যে বরিশাল ততোধিক শ্রেষ্ঠ। দূর হইতে নদী বাহিয়া যাইবার সময় বরিশাল সহরকে একখানি অপরূপ ছবির ন্যায় বোধ হয়।

বরিশাল জোয়ারের দেশ। জোয়ারের জল নদীতে, খালে, নর্দ্দমায়, পুকুরে—সর্ব্বত্র। জোয়ারের জল না হইলে ঘরকন্না চলে না, স্নান আহার ঘটে না; নৌকা এক খাল হইতে অন্য খালে, এক নদী হইতে অন্য নদীতে যাইতে পারে না, সুতরাং ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়; চাষ আবাদ হয় না, সুতরাং কৃষি বন্ধ হয়। বরিশাল বাঙ্গালার জীবনী-শক্তি। বরিশালের চাউল না হইলে বাঙ্গালার প্রাণ বাঁচে না। এই বরিশালের প্রাণ জোয়ারের জল। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করুন আর না করুন, বরিশাল নিশ্চিন্ত। যত দিন সমুদ্রের জোয়ার নদী বহিয়া বরিশালকে সুস্নিগ্ধ করিবে, যত দিন আকাশের চাঁদ সমুদ্রকে মাতাইয়া তুলিবে, তত দিন বরিশাল অমর। বরিশাল বিধাতার এক অপরূপ সামগ্রী। এ সকল কথা সমগ্র বরিশাল জেলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। বরিশাল জেলা নদীময়।

বরিশালের জোয়ারের জল একদিকে, আর একদিকে বরিশালের নারিকেলের জল। নারিকেলের জলের ন্যায় এমন সুস্বাদু, এমন সুস্নিগ্ধ জিনিস বাঙ্গালায় আর দ্বিতীয় নাই। বরিশাল জেলা এই নারিকেল গাছে ভরা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগান, কেবল নারিকেল গাছ, কেবল সুপারি গাছ। নারিকেল গাছ শোভায় যেমন অতুল, তেমনই উপকারী। বাঙ্গলার চাউল, সুপারি ও নারিকেল বরিশাল হইতে। এই চাউল, সুপারি ও নারিকেল বরিশালের জোয়ারের জলে উৎপন্ন। বরিশাল জোয়ারের দেশ, যেন বারমাস বর্ষা.—বারমাস কূলে কূলে জোয়ারের জল, বারমাস সুস্নিগ্ধ। এমন অতুল শোভাময় দেশ বাঙ্গালার আর কোথাও দেখা যায় না। এমন দেশের রাজধানী বলিয়াই বুঝিবা বরিশাল সহরটী এত সৌন্দর্য্যের আকর হইয়াছে। স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গালায় বরিশাল বিধাতার এক অপরূপ সৃষ্টি।

বরিশাল জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন, বরিশালের লোক কিন্তু

তেমন নয়। বরিশালের লোক সাধারণতঃ কিছু উষ্ণ প্রকৃতিক, কিছু কলহপ্রিয়, কিছু মোকদ্দমা-প্রিয়, কিছু রক্ত-পিপাসু, কিছু প্রতিহিংসাপরায়ণ। অবশ্য, সকলেই খারাপ নয় ;—সকল কথার ব্যতিক্রম আছে, সুতরাং এ সকল কথারও ব্যতিক্রম আছে ; অর্থাৎ ভাল লোকও আছে। তবে একথা ঠিক, কথায় কথায় মোকদ্দমা করিতে, মানুষ খুন করিতে, বরিশালের লোকের ন্যায় আর কোন দেশের লোক পারে না। দলিল জাল করিতে ও জুয়াচুরিতে বরিশাল প্রসিদ্ধ। বরিশাল শোভা সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ ত এ সকল বিষয়েও পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ক্ষুদ্র সহর বরিশাল, এই জেলারই প্রতিকৃতি। অন্যান্য দেশের বহু লোক এ জেলায় কার্য্যোপলক্ষে বসতি করেন বটে, কিন্তু এ দেশেরও বহুলোক জেলাকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। বাসায় বাসায় কত লোক, খালে নদীতে নৌকায় কত লোক। বরিশাল ক্ষুদ্র সহর বটে, কিন্তু লোক-সমাগম কম নহে। বরিশাল বড় বড় সহরের হোমিওপ্যাথিক ডোজ। এখানে দুটী কলেজ, একটী গবর্ণমেণ্ট এণ্ট্রান্স স্কুল, বালিকা-বিদ্যালয়, ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির, গির্জ্জা, জেল, কাছারী, সাহেবদের খেলার ঘর, ডাক্তারখানা, বড়বাজার, ষ্টিমার ঘাট—বড় বড় সহরের নমুনা এখানে অল্লাধিক পরিমাণে সকলই আছে। বরিশালে ভাল লোক অনেক আছেন, মন্দ লোকও অনেক আছেন। এত ক্ষুদ্র সহরে এত বড় বেশ্যা-পল্লী অল্প স্থানেই দেখা যায়।

বরিশালে অনেক ভাল লোক আছেন, সুতরাং অনেক ভাল কাজের অনুষ্ঠান হয় ; বরিশালে অনেক খারাপ লোক আছেন, সুতরাং খারাপ কাজও অনেক হয়। যে বরিশাল কোল পাতিয়া মুরলাকে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই বরিশালই তাহাকে ডুবাইতে চায়! বরিশালে স্বর্গ ও নরক, দুই-ই আছে।

মুরলার ঘটনা লইয়া বরিশালে দুই দল হইল—এক দল সারদা বাবুর নামে অনধিকার প্রবেশ, লুণ্ঠনের দাবিতে নালিস রুজু করার পক্ষে ; অন্য দল মুরলাকে উদ্ধার করার পক্ষে। এক দল মুরলার কলঙ্ক, ঘোষ বংশের কলঙ্ক রাস্তায় রাস্তায় অকথ্য ভাষায় গাইয়া ফিরিতেছে, আর এক দল সকল ভুলিয়া পাপীর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। যে বরিশালে দেবলীলা, সেই বরিশালেই অসুর-লীলা হইতেছে। মুরলার কলঙ্ক যাহারা কীর্ত্তন

করিতেছে, তাহারা কিন্তু ভ্রমেও সুপ্রসন্নের দোষ উল্লেখ করিতেছে না। এমনই পক্ষপাতী সমাজ! যে দেশের লোক বেশ্যার-নিন্দা প্রচারে উৎকণ্ঠ, সেই দেশের লোকই ব্যভিচারী পুরুষের নামে কোন কথাই বলে না। রমণী-বেশ্যা-সংশ্লিষ্ট বলিয়া এদেশে থিয়েটার নিন্দিত, কিন্তু ব্যভিচারী পুরুষ-সংশ্লিষ্ট বলিয়া থিয়েটার নিন্দিত নহে! হা সাম্য, তুমি কোথায়? একবারও কি তুমি পুরুষের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া অবলার হস্তে পুরুষের ভার দিবে না? মুরলা কলঙ্কিনী, তাহার প্রতি কাহারও দয়া হয় না; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কাহারও পক্ষপাতী নহেন। সারদা বাবু তিলক বাবুকে ধরিলেন; তিলক বাবু জমীদার, মেজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি লইলেন, পুলিস মুরলাকে উদ্ধার করিতে ধাবিত হইল। পুলিস যথা-সময়ে মুরলাকে উদ্ধার করিল। মুরলা, কিন্তু সুপ্রসন্নের মায়ায় তাহাকে বাঁচাইলেন। মুরলা পুলিসের নিকট বলিলেন—"আমাকে সুপ্রসন্ন কয়েদ রাখেন নাই; তবে আমি ব্রাহ্মদের আশ্রয়ে যাইব, আমাকে সেখানে যাইতে দিন্।" পুলিস মুরলার ইচ্ছা পূর্ণ করিল; কিন্তু সারদা বাবুর এজেহার মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় সেইরূপ রিপোর্ট দিল। এদিকে হিন্দুসমাজের লোকেরা সুপ্রসন্নকে উস্কাইয়া দিয়া সারদা বাবুর নামে অনধিকার প্রবেশ ও মিথ্যা এজেহারের নালিস রুজু করাইয়া দিল। পুনরুত্থানকারীর দল এখন সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পুলিসেও তাহা-দের লোক আছে। সেই লোকেরা নানারূপ সাজসজ্জায় সাজাইয়া মোকদ্দমা খাড়া করিয়া তুলিল। বরিশালের ব্রাহ্ম সংখ্যা খুব অধিক না হইলেও নিস্তেজ নহে। উকীল মোক্তারেরা কালীবাড়ী পাঠা মানিলেন—বিবাদ খুব পাকিয়া উঠিল। বরিশালের ব্রাহ্ম জমিদার তিলক বাবু সারদা বাবুর সহায়। মুরলা এখন তিলক বাবুর বাড়ীতে আছেন। হিন্দুসমাজ কোমর বাঁধিয়া আসরে নামিয়াছে। চক্রধরপুরের লোকেরা বরিশালে আসিয়াছেন, কিন্তু অপমানে তাঁহারা ম্রিয়মান। তাঁহারা, মুরলাকে কলিকাতা পাঠা-ইতে ব্রাহ্মদিগকে ক্রমাগত অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা, মুরলা স্থানান্তরিত হইলে, বিবাদ থামিবে, কলঙ্ক-রটনা থামিবে—সব গোল চুকিবে। যখন হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের বিবাদ খুব পাকিয়া উঠিল, তখন চক্র-ধরপুরের লোকের অনুরোধে, মুরলার নামে, ব্রাহ্ম-জমিদার কলিকাতা অরবিন্দ চৌধুরীর নিকট এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম করিলেন—"Come sharp

to take me from Tilak Babu's." টেলিগ্রাম গেল বটে, কিন্তু এদিকে তিলক বাবু প্রভৃতি প্রতিজ্ঞা করিলেন, মোকদ্দমা না মিটিলে মুরলাকে কলিকাতা পাঠাইবেন না। ব্রাহ্ম-জমিদারের মনে আরো কত কি জাগিয়াছিল, পরে আভাস দেওয়া যাইবে। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি, এই মোকদ্দমায় হিন্দু এবং ব্রাহ্ম উভয় পক্ষ উভয় পক্ষকে যতদূর সাধ্য তীব্রভাবে আক্রমণ করিল। মোকদ্দমার উত্তেজনায় বরিশাল উন্মত্ত হইয়া উঠিল। পারিবারিক কুৎসা-বন্যায় রাস্তাঘাট পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাজ দরবার।

মুরলার ভগ্নীপতি অরবিন্দ চৌধুরী পূর্ব্বেই তাঁহার শ্বশুরের মুখে মুরলার পলায়নের কথা শুনিয়াছেন। যখন তিনি মুরলার টেলিগ্রাম পাইলেন, তখন কালবিলম্ব না করিয়া শ্বশুর মহাশয়কে চক্রধরপুর প্রেরণ করিয়া তিনি বরিশাল যাত্রা করিলেন। একরাত্রি রেলে, একদিন ষ্টিমারে কাটিল, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তিনি বরিশাল পৌছিলেন। তিনি অন্যান্য বন্ধুগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একেবারে তিলক বাবুর বাড়ীতে গমন করিলেন। টেলিগ্রামে সেই বাড়ীর ঠিকানা ছিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মুরলার সহিত অরবিন্দ বাবু সাক্ষাৎ করিলেন। চক্রধরপুরের লোকেরা অরবিন্দ বাবুকে দেখিয়া যারপর নাই পুলকিত হইল। মুরলাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে তাহারা একান্ত জেদ করিতে লাগিল। বিলাস, মুরলাকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু মুরলা এখন যেন একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন।

ঠিক সন্ধ্যার সময় তিলক বাবু বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, অরবিন্দ বাবু আসিয়াছেন। মুরলার সহিত কথা বলিতেছেন। ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি অরবিন্দ বাবুকে স্থানান্তরে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি আসিলেন কেন? আপনার কি আর কাজ নাই?"

অরবিন্দ বাবু এ কথার মর্ম্মভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন,—"মুরলার টেলিগ্রাম পাইয়া আসিয়াছি; আপনি কি সে সম্বন্ধে কিছু জানেন না?"

তিলক বাবু। জানি, কিন্তু আপনার কি আর কাজ নাই, ইহা জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কাজ ফেলিয়া কিরূপে আসিলেন?

অরবিন্দ। মুরলা আমার স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগ্নী, অন্য দিকে মুরলা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী। মুরলার স্বামী আমার বাল্যবন্ধু, তাঁহার টেলিগ্রাম পাইয়া কেমনে না আসিয়া পারি?

তিলক বাবু। ইহাতে আপনার যথেষ্ট খরচ হইল, অথচ মুরলার যাওয়া হইবে না।

অরবিন্দ। যাওয়া হইবে না কেন? না যাওয়া হইলে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন কেন?

তিলক বাবু। একটা মোকদ্দমা উপস্থিত, তাহাতে মুরলার উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন, না হইলে সান্ন্যা বাবু জেলে যাইবেন। দ্বিতীয়তঃ মুরলা এখানে আসিয়াছে, এখানেই থাকুক; শুভ কার্য্যটা এখানেই সম্পন্ন হউক। তাহাতে আপনার আপত্তি কি? তৃতীয়তঃ, আমি এখানে একটী বোর্ডিং খুলিব।

অরবিন্দ। আপনার কোন কথারই অর্থ বুঝিতেছি না। যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কিছুই নয়, নিশ্চয় তাহা ডিস্‌মিস হইবে। যদি একান্তই ডিস্‌মিস না হয় এবং মুরলার প্রয়োজন হয়, আমি তাহাকে লইয়া আসিব। সে এখন কলিকাতায় গেলে এখানকার গোলযোগ অনেকটা থামিয়া যাইবে। শুভকার্য্যের কথা যাহা বলিলেন, তাহার কিছুই অর্থ বুঝিতেছি না। আসিতে আসিতেই মুরলার বিবাহ দিবেন? ইহা নিতান্ত অধর্ম্মের কাজ। বোর্ডিং খুলিবেন, অন্য লোক রাখিবেন, মুরলাকে সে জন্য আবদ্ধ করিবেন কেন? স্বার্থ ছাড়ুন। মুরলাকে আমার সহিত যাইতে দিন্, তাঁহার দিদি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন।

তিলক বাবু। আমি মুরলার জন্য অনেক কষ্ট সহিয়াছি, অনেক খরচ করিয়াছি, বাহাদুরি আপনি লইবেন, তাহা হইবে না। মুরলার যাওয়া হইবে না।

অরবিন্দ বাবুকে এদিকে চক্রধরপুরের লোকেরা বারম্বার ডাকিতেছিল। তিনি তিলক বাবুর কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন এবং অন্যমনস্ক ভাবে উঠিয়া চক্রধরপুরের আত্মীয়দিগের সহিত ও মুরলার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। যাইবার সময়, তিলক বাবু বলিলেন, আজ রাত্রে

এখানেই যেন আহার হয়। অরবিন্দ বাবু তথাস্ত বলিয়া বিদায় লইলেন। অরবিন্দ বাবু কিছুই ভিতরের সংবাদ পাইতেছেন না। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা ভিতরের সংবাদ ভাঙ্গিয়া বলিল না, চক্রধরপুরের লোকেরাও কিছুই ঘটনা ভাঙ্গিল না। সকলেই বাহিরের কথা বলিল। চক্রধরপুরের লোকদের একান্ত জেদ, কিছুতেই মুরলাকে তিলক বাবুর বাসায় রাখা হইবেনা, ব্রাহ্মদের জেদ কিছুতেই কলিকাতায় পাঠান হইবে না। অরবিন্দ বাবু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চক্রধরপুরের লোকদিগের বাসায় রহিলেন। তাঁহারা যে অপকট চিত্তে মুরলাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে বলিতেছেন, ইহা বুঝিতে অরবিন্দ বাবুর বাকী রহিল না। তিনি যথাসময়ে তিলক বাবুর বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, তিলক বাবুর বাড়ীর নীচের ঘরে দুটী লোক বসিয়া কি কাজ করিতেছে, আর কাহারও সাড়া পাইলেন না। উপরে সংবাদ দেওয়া হইল, তাহারও কোন উত্তর আসিল না। অরবিন্দ বাবুকে থাকিতে বা আহার করিতে কেহই অনুরোধ করিল না। অরবিন্দ বাবু যারপর নাই অপ্রতিভ হইলেন, সমস্ত দিনের অর্দ্ধাহারে শরীর অবসন্ন, তায় দুশ্চিন্তা, তায় বরিশালের ব্রাহ্ম তিলক বাবুর দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলেন এবং ব্রাহ্মপ্রচারাশ্রমে জনৈক সম্ভ্রান্ত সদাশয় ও সহৃদয় ব্রাহ্মের কৃপায় মস্তক রাখিবার একটু ঠাঁই পাইলেন। রাত্রে আর কিছুই আহার হইল না। এই সহৃদয় সাধু ব্যক্তি সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া যারপর নাই ব্যথিত হইলেন। তিনি বলিলেন—"তিলক বাবুর আদেশে, উমেশ ও বিলাসের অনুরোধে, মুরলার জবানি টেলিগ্রাম আমি লিখিয়া দিয়াছি, সেই টেলিগ্রাম পাইয়া তুমি আসিয়াছ, এখন মুরলাকে কেন দেওয়া হইবে না, মুরলাই বা কেন যাইবে না, আমি বুঝিতেছি না। আমি এখন সানাইদারের কাঁসীদার হইয়াছি, আমার কথা কেহ শুনে না, কেহ রাখে না; নচেৎ এরূপ অন্যায় আচরণের তীব্র-প্রতিবাদ করিতাম। যাহা হউক, তুমি আজ থাক, দেখি, কাল কি হয়।" ইহার পর অরবিন্দের অনাহারের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি অনেক দুঃখ করিলেন, অরবিন্দ এই সাধু ব্যক্তির ব্যবহারে এত আনন্দিত হইলেন যে, দিবসের সমস্ত কষ্ট ও দুশ্চিন্তা বিস্মৃত হইলেন। কথাবার্ত্তায় প্রায় রাত্রি শেষ হইল। ভোররাত্রি একটু নিদ্রা গেলেন। প্রত্যূষে উঠিয়া বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য সভ্যদিগের নিকট সকল কথা বলিলেন। কেহই

তিলক বাবুর ব্যবহারের প্রশংসা করিল না; এবং সকলেই বলিল যে, এ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখা যাইবে। অরবিন্দ বাবু মধ্যাহ্নে কোন হিন্দু বন্ধুর বাসায় সাদরে সসম্মানে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সমস্ত দিন তাঁহার নিকট লোক আসা যাওয়া করিতে লাগিল। চক্রধর-পুরের লোকেরা বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল যে, মুরলাকে কোন রূপেই রাখিয়া যাওয়া না হয়। তাহাদের উত্তেজনায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে অরবিন্দ বরিশালের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সহানুভূতি প্রকাশ করা ভিন্ন আর কেহই কিছুই করিলেন না। সকলেই বলিলেন, তিলক বাবুকে অনুরোধ করিতে গেলে অপমানিত হইতে হইবে।

সমস্ত দিনের মধ্যে মুরলার উদ্ধারকর্ত্তা সারদা বাবুর সহিত অরবিন্দ সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। তিনি কোথায়, কেহই বলিল না।

দেখিতে দেখিতে দিন শেষ হইয়া আসিল, সূর্য্য অস্তমিত হইল। অরবিন্দ শেষ চেষ্টা করিবার জন্য তিলক বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। চক্রধরপুরের বহুলোক এবং অরবিন্দের বরিশালের আরো কয়েক-জন বন্ধু শেষ চেষ্টা করিতে উপস্থিত হইলেন।

সে দিন বরিশালে দারুণ বৃষ্টি। রাস্তাঘাট সব জলময়, বাড়ীর প্রাঙ্গ-নাদি কর্দ্দমময়। তিলক বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল; তিনি কাহারও অনুরোধে পরামর্শে চলিলেন না; মুরলাকে কলিকাতা পাঠাইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অরবিন্দ বাবু লজ্জায় ও অপমানে ম্রিয়মান হইলেন; মুরলার সহিত শেষ দেখা করিতে চাহিলেন। তিলক বাবু তাহাতেও অসম্মত হইলেন। শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর মুরলার সহিত দেখা করিতে দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, অরবিন্দ মুরলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখিলেন, সেখানে তিলক বাবুর স্ত্রীকে মধ্যস্থ রাখা হইয়াছে। দেখিয়া অরবিন্দের মাথা ঘুরিয়া গেল, মুরলাকে বলিলেন, "আপনি আমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, তাই খরচ পত্র করিয়া আসিয়াছি, আপনি আমার সহিত কলিকাতা যাইবেন কি না, বলুন?" মুরলা এ কথার উত্তর দিলেন না। তিলক বাবুর স্ত্রী মধ্য হইতে উত্তর দিলেন; বক্তৃতা করিয়া, উপদেশ দিয়া অরবিন্দকে বুঝাইলেন যে, মুরলার বরিশালে থাকাই উচিত, মুরলা কখনও সারদা বাবুর প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে পারে না।

অরবিন্দ তিলক বাবুর স্ত্রীর কথার উত্তর দিতে বড়ই অনিচ্ছুক, একে মহিলা, তাতে অপরিচিতা ; তাঁহার সহিত বাদ প্রতিবাদ করা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। অরবিন্দ বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিলেন, তারপর পুনঃ মুরলাকে বলিলেন,—"আপনার দিদির অনুরোধে আমি এত কষ্ট সহ্য করিয়া আসিয়াছি, এখন আপনার দিদিকে যাইয়া কি বলিব?

মুরলা এবারও উত্তর করিলেন না।

অরবিন্দ বাবু পুনঃ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি না, আপনার মুখে শুনিতে চাই। আপনার যাইতে ইচ্ছা থাকিলে, কেহই বাধা দিতে পারিবে না। তিলক বাবু যত বড় লোকই হউন না, আপনার এখানে থাকিতে ইচ্ছা না থাকিলে তাঁহার সাধ্য নাই যে, আপনাকে তিনি রাখিতে পারেন? কোন ভয় নাই, কোন সঙ্কোচ নাই। অবস্থা ভাল করিয়া বুঝুন; আমি অপমানিত হইয়া গেলে আর কখনও আসিব না; শেষে কষ্ট পাইলে কপাল কুটিলেও ফিরিয়া চাহিব না; যাইবেন কি না, বলুন।"

মুরলা এবার নির্ভয়ে উত্তর করিলেন,—ইহারা আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন; ইহাঁদিগকে বিপদে ফেলিয়া আমি যাইতে পারি না। আমি আপনার সহিত যাইব না।

অরবিন্দের অপমানের আর কিছুই বাকী রহিল না। পূর্ব্বে ধারণা ছিল, মুরলা যাইতে কখনও অস্বীকার করিবেন না। এখন মুরলার কথা যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সর্ব্ব শরীর দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। লজ্জায় বাক্‌রোধ হইয়া আসিল; অতি কষ্টে আবার বলিলেন,—"তবে আমি যাই?" মুরলা স্পষ্ট উত্তর করিলেন—"যান।"

অরবিন্দ বন্ধুদিগের সহিত হিন্দু বন্ধুর বাসায় ফিরিলেন। বরিশালে আর মুহূর্ত্তকাল থাকিতে ইচ্ছা হইল না। সমস্ত পৃথিবী যেন চক্ষের সমক্ষে ঘুরিতে লাগিল। রজনী প্রভাত হইলে লোকদিগকে কি বলিবেন, ভাবিয়া আকুল হইলেন। রাত্রে আর চক্ষে ঘুম বসিল না। যখন সকল নীরব হইল, অনেকক্ষণ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিলেন। এইরূপ কষ্টে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। সমস্ত রাত্রি মুষলধারে বৃষ্টি পড়িয়াছে—এখনও পড়িতেছে। শেষ রাত্রে দারুণ বৃষ্টি মাথায় বহিয়া অরবিন্দ বাবু ষ্টিমারে উঠিলেন। উঠিয়া এক নিভৃত স্থানে শয়ন করিয়া রহিলেন। কাহাকেও মুখ দেখাইতে সাধ নাই। প্রাতঃকালে মুরলার পিতা কিছু

পাথেয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া অরবিন্দের নিকট লোক পাঠাইলেন। ষ্টিমারে তাহার সহিত বাধ্য হইয়া দুটী কথা বলিতে হইল। বলিলেন—"তাঁহাকে বলিও, আমার যখন অভাব হইবে, তাঁহার নিকট চাহিয়া লইব, এখন কোন অভাব নাই।" এই কথা বলিয়া আবার শয়ন করিয়া রহিলেন। যথাসময়ে ষ্টিমারের লোক উঠা শেষ হইল এবং গর্জ্জন করিতে করিতে ষ্টিমার চলিল। বরিশাল যখন দৃষ্টির অতীত হইল, তখন অরবিন্দ উঠিয়া বসিলেন। এই ষ্টিমারে বরিশালের সুপার-ভাইসার মহাশয় পিরোজপুর যাইতেছিলেন, তিনি অরবিন্দ বাবুর কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। তিনি স্ব-প্রবৃত্ত হইয়া অরবিন্দ বাবুর সহিত আলাপ করিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় কতক সময় ভাল ভাবেই গেল। তিনি তিলক বাবুর ব্যবহারে দারুণ ব্যথা পাইলেন এবং বলিলেন, ফিরিয়া আসিয়া আমি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিব। যথাসময়ে সুপার-ভাইসার বাবু পিরোজপুর অবতরণ করিলেন। অরবিন্দ বাবু সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া কোনরূপ কষ্টে দিনাতিপাত করিলেন। অপরাহ্নে খুলনায় আসিলেন। মনে তিনটী বিষয়ে দারুণ চিন্তা হইতে লাগিল, মুরলাকে তিনি বড় ভালবাসিতেন এবং বড় শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার প্রতি আজ নিম্নলিখিত তিনটী কারণে বিরক্তি উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে মনে বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। প্রথম কারণ, মুরলাকে যখন সুপ্রসন্ন বরিশাল লইয়া আসিল, তখন মুরলার সম্মতি না থাকিলে, পথে নদীতে আত্মবিসর্জ্জন করাই স্বাভাবিক ছিল, মুরলা তাহা করেন নাই কেন? দ্বিতীয়তঃ সুপ্রসন্ন ও সারদা বাবুর সহিত যখন গোলযোগ হয়, তখন সুপ্রসন্ন মুরলার হাত ধরিতে সাহস করিল কেন? তৃতীয়তঃ, মুরলা আমার সহিত আসিল না কেন? এ তিনটী কারণের একটীরও তিনি মীমাংসা করিতে পারিলেন না। বরিশালে সবিশেষ কিছুই শ্রবণ করেন নাই, কেহই ভাঙ্গিয়া কিছু বলে নাই। অরবিন্দ হৃদয়ে দারুণ সন্দেহ-মেঘ লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় পৌছিয়া পত্নীকে যারপর নাই তিরস্কার করিলেন; উক্ত ত্রিবিধ কারণ উল্লেখ করিয়া মুরলার স্বভাবের প্রতি তাঁহার যে আর আস্থা নাই, তাহাও বলিলেন। অরবিন্দের স্ত্রী, মুরলার দিদি মুরলাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, তিনি দুঃখে ম্রিয়মান হইলেন।

স্বামীর তিরস্কার মস্তক পাতিয়া লইলেন, কিন্তু ভীতা হইলেন,—মুরলা বুঝি বা জন্মের মত ভাসিল! আরো ভাবিলেন, স্বামী বুঝি বা এ জন্মে আর মুরলার নাম শুনিবেন না! মুরলার দিদির কষ্ট, মর্ম্মবেদনা এ পৃথিবীর কেহই বুঝিল না, কেহই দেখিল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য প্রত্যাদেশ।

অরবিন্দ বাবু কলিকাতা রওয়ানা হইয়াছেন, এই কথা শুনিয়া মুরলার প্রাণ বড়ই অস্থির হইল। "কেন আসিলাম, কি করিলাম, দেবতাকে চটাইলাম," ইত্যাদি নানা দুশ্চিন্তা মনকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। কেন কুহকমন্ত্রে ভুলিলাম, কেন দেবতাকে পায়ে ঠেলিলাম, হায়, দিদি কি মনে করিবে"—ইত্যাদি নানা চিন্তায় মুরলার মন অস্থির হইল। পরদিন মুরলা কিছুই আহার করিলেন না, সমস্ত দিন শুইয়া রহিলেন, কাহারও সহিত একটী কথাও বলিলেন না। তিলক বাবু প্রভৃতি মনে ভাবিলেন, এরূপ অবস্থায় মুরলাকে রাখা বড়ই দায়।

সন্ধ্যার সময় উমেশ ও বিলাস মুরলাকে শেষবার দেখিতে আসিল, তাহারা বাড়ী রওয়ানা হইবে। দুঃখে ও ক্ষোভে উমেশ ও বিলাসের মুখ মলিন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুটী ভ্রাতার চক্ষু ফুলিয়াছে। পাষাণী মুরলা আজ বুঝিল না, এ জগতে ভ্রাতৃস্নেহ কি জিনিস!

বিলাস ও উমেশের কথা শুনিয়া মুরলা উঠিয়া বসিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহারও চক্ষু ফুলিয়া গিয়াছে। মুখে কথা সরিতেছে না। সোণার প্রতিমা যেন গাঢ় কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। মুরলা যেন মরণের কোল হইতে জাগরিতা হইলেন।

বিলাস বলিল, দিদি, তোর মনে কি এই ছিল? আমাদিগকে কাঁদাইলি, কোন দুঃখ নাই; চৌধুরী মহাশয়কে কি করিয়া কাঁদাইলি? তোর ব্যবহারে আমার আর বাঁচিতে সাধ নাই। তোর জন্য এত করিলাম, এই কি তার প্রতিশোধ?

মুরলা। বিলাস, আমি কুহকমন্ত্রে ভুলিয়াছি, এখন কি করিব, বল্।

আমার মৃত্যু নিকট। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি, "মা বলিয়াছেন, এক বৎসরের মধ্যে আমার অপমৃত্যু হইবে।" মরিতে আমার ভয় নাই, দুঃখ এই রহিল, দেবতার মনে কষ্ট দিলাম। বিলাস, আমার এ পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত নাই?

উমেশ। সাধু সজ্জনের মনে কষ্ট দিলে কাহারও ভাল হয় না। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মশাপে না হইত, এমন কাজ নাই। রাজা পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপের হাত কিছুতেই এড়াইতে পারেন নাই, মহাভারতে কি শুন নাই? আমার ভয় হয়, না জানি তোমার জীবনে কি বিপদ ঘটে!

বিলাস। দিদি, চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় সাধু লোক একালে ত আর দেখা যায় না। সত্য ও কর্ত্তব্যের জন্য তিনি আত্মীয় কুটুম্ব, বিষয় বিভব সব ছাড়িয়াছেন, সত্য ও কর্ত্তব্যের জন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজে নিপীড়িত! তিনি কাহাকেও ভয় করেন না। বিধাতার উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া তিনি অবিচলিত ভাবে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করেন। এক সময়ে সকল দিন তাঁহার উদরের অন্ন, পরিবার বস্ত্র জুটিত না। সে বহুদিনের কথা নয়। আজ দেখ, তাঁহার আশ্রয়ে কত লোক প্রতিপালিত হইতেছে। দেখ, তাঁহার প্রতি দেবতা কেমন প্রসন্ন। তিনি বিধাতার প্রিয়পাত্র। তাঁহাকে যে কষ্ট দেয়, তাহার ত ভাল হওয়ার কথা শুনি নাই।

উমেশ। কথায় কথা মনে পড়িল। কি ব্রাহ্মসমাজ, কি হিন্দুসমাজ, যে সমাজের যে সকল লোক তাঁহার বিরুদ্ধে লাগিয়াছে, তাহাদেরই দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। এ যে বিধাতার কি লীলা, বুঝি না। আমার ভয় হয়, বুঝি বা স্বর্গীয়া খুড়িমার কথা সত্য হয়।

মুরলা। মরিতে আমার ভয় নাই, তাঁহার চরণধূলি ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া মরিতে পারিলে আমার বৈকুণ্ঠ মিলিবে।

বিলাস। তিনি কি আর তোমার মুখের দিকে তাকাইবেন?

মুরলা। তাকাইবেন না? তিনি যে দয়ার অবতার। তিনি যেমন মানুষের অপরাধ ভুলিতে পারেন, এমন আর কে পারে? যে সকল লোকেরা তাঁহাকে ঘোর বিপদে ফেলিতে চেষ্টা করে, জান না কি, তিনি তাহাদিগকেও কত ভালবাসেন? ভালবাসায় তাঁহার নিকট জগৎ বশীভূত। একদিন যাহারা তাঁহার কত বিরুদ্ধে চলিত, এখন তাহারা তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী। তিনি যে প্রেমের দেবতা।

উমেশ। এ কথা ঠিক নহে, কত লোক তাঁহার বিরুদ্ধে লাগিয়া রহিয়াছে, তাহার গণনা হয় না।

মুরলা। এ জগতে কাহার বিরুদ্ধে লোক লাগে নাই? খ্রীষ্টের ন্যায় বিশ্বাসী ভক্ত এ পৃথিবীতে আর কে? খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে কি লোক লাগে নাই? রামমোহন রায়ের ন্যায় এদেশে এই শতাব্দীতে আর কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, রামমোহন রায়কে কি দেশান্তরিত হইতে হয় নাই? যাহারা খ্রীষ্টের বিরোধী ছিল, তাহাদের বংশধরেরা আজ খ্রীষ্টের আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া জগতের পাপীতাপীর উদ্ধারের জন্য কি না করিতেছে? রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে আজ কি আর লোকের মুখে কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায়? মহতের মহত্ব বুঝিতে একটু সময় লাগে, এই জন্যই এইরূপ হয়। যাঁহারা জীবিত কালে জগতের পূজা পান, তাঁহারা তাঁহাদের মৃত্যুর পর বিস্মৃতিতে ডুবেন। চৌধুরী মহাশয়ের শত্রু থাকিতে পারে, বিরোধী লোক থাকিতে পারে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, একদিন তাঁহারা ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। ন্যায়, সত্য ও পবিত্রতার জন্য তিনি খাটিতেছেন। একদিন তিনি হিন্দুসমাজের ঘৃণার পাত্র ছিলেন, আজ হিন্দুসমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজও, এইরূপ, একদিন তাঁহার গুণে মোহিত হইবেন। কেন না, তিনি যে দেবতা। পাপীতাপীর জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে, একদিন না একদিন জগৎ তাঁহাকে চিনিবেই চিনিবে। আমি এ কয় দিন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি, দেখিতেছি, যাহা মনে করিতাম, তাহা ইহার ত্রিসীমায়ও নাই। চৌধুরী মহাশয়কে ইঁহারা কত নিন্দা করেন! সে সকল শুনিলে আমার প্রাণ অস্থির হয়। আমি আবার এই পাষণ্ডদিগের কথায় ভুলিয়াই চৌধুরী মহাশয়ের বিরুদ্ধে চলিলাম! এ কি আমার মোহ নয়? এ কি আমার নরকভোগ নয়? বিলাস, বল ত আমার আর উদ্ধার হইবে কি না?

বিলাস। চৌধুরী মহাশয় সম্বন্ধে তুমি যাহা যাহা বলিলে, তাহার প্রতি কথা সত্য। ব্রাহ্মসমাজ টমাজ আমি বুঝি না, তুমি যত শীঘ্র পার চৌধুরী মহাশয়ের আশ্রয়ে যাও। তিনি তোমাকে ক্ষমা না করিলে আর তোমার মঙ্গল নাই। মায়ের প্রত্যাদেশ ভুলিওনা, তুমি আর বিলম্ব করিও না।

বিলাস ও উমেশ বসিয়া মুরলার সহিত এইরূপ স্বাধীন ভাবে কথা বলিতেছে, ইহা তিলক বাবুর অসহ্য। তিনি এতক্ষণ বাড়ীতে ছিলেন না,

বাড়ীতে আসিয়া এই চিত্র দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তখনই ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, বাবুদিগকে এবাড়ী পরিত্যাগ করিতে বল। পূর্ব্বদিন আদেশ করিয়াছিলেন, "চক্রধরপুরের কোন লোককে এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিবে না।" সে আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই বলিয়া যথেষ্ট তিরস্কার ও ভৎ'সনা করিলেন। ভৃত্যেরা আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। বিলাস ও উমেশ চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে মুরলার নিকট বিদায় লইল। মুরলা অতুল স্নেহের ভাই দুটীকে অপমানিত হইয়া যাইতে দেখিয়া যে কি মর্ম্মবেদনা পাইলেন; এ পৃথিবীর কোন লোক তাহা জানিল না। পূর্ব্ব রাত্রির স্বপ্ন ও অদ্যকার এই ঘটনা তাঁহাকে বিষম বিহ্বল করিয়া তুলিল। ইহার পর তিলক বাবু আসিয়া আবার যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। "এরূপ করিলে এখনই এ বাড়ী পরিত্যাগ করা উচিত"—তিলক বাবুর এ সকল কথা মুরলার প্রাণে দারুণ শেল বিদ্ধ করিল। মনে মনে বলিলেন, হা ঈশ্বর, দেবতাকে অপমানিত করিয়া বিদায় দিয়াছি বলিয়া কি সদ্য সদ্যই তাহার ফল ফলিল? আমার মুখের দিকে তাকাইতে পৃথিবীতে যে আর কেহ নাই। সকল দিক অকূল, আমি কোথায় যাইব? কে রাখিবে, কে ধরিবে, তুমি আমাকে আশ্রয় দেও। আমি হতভাগিনী বলিয়া ঘৃণা করিও না, জগদীশ, তুমি নিরুপায়ের উপায়, এবার আমাকে কোল দেও।

মুরলা এইরূপ কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়া সে রাত্রি কাটাইলেন, কিছুই আহার করিলেন না। তারপর দিন অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় সংবাদ পাইলেন, মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গিয়াছে। যে সদাশয় ব্রাহ্ম মুরলার নিকট এই সংবাদ আনিলেন, তিনি চুপে চুপে বলিয়া গেলেন, "আপনার কোন ভয় নাই, আপনি আহার করুন, আমি যেরূপে পারি, আপনাকে শীঘ্রই কলিকাতা পাঠাইয়া দিব।"

এই কথা শুনিয়া মুরলা কতক আশ্বস্ত হইলেন এবং এই কথার উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। তিলক বাবুদের মতানুসারে বরিশালে থাকিতে সম্মত হইলেন না বলিয়া তাঁহাকে যে সকল দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল, সে সকল ব্যক্ত করিতে আর ইচ্ছা নাই। মুরলা কলিকাতা যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে অরবিন্দ বাবুর একজন বন্ধু কলিকাতা হইতে একটী মোকদ্দমা উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে তিলক বাবু, মুরলাকে কলিকাতা পাঠাইতে, এক অনুরোধ

পত্র পাইয়াছেন। এই পত্র পাওয়ার পর তিলকবাবুরও মত পরিবর্ত্তিত হইল। সারদা বাবু প্রভৃতি সুসময় গণনা করিয়া মুরলাকে ঐ বন্ধুর সহিত কলিকাতা পাঠাইয়া দিলেন। তিলক বাবু আর কোন আপত্তি তুলিলেন না। মুরলা সানন্দে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। মুরলার জীবনের এক অধ্যায় এইরূপে পরিসমাপ্ত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিষম আকর্ষণে।

মোকদ্দমা যখন ডিস্‌মিস হইল, তখন সুপ্রসন্নের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। লোকের উত্তেজনায়, কাজের ভিড়ে, মোকদ্দমার জয় লাভের আশায় সুপ্রসন্ন কয়েকদিন বেশ্ ছিল, কিন্তু যখন মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইল, তখন সকল আশার মূলে যেন ভস্ম প্রক্ষিপ্ত হইল। এই পৃথিবী যেন সুপ্রসন্নের নিকট নিবিয়া গিয়াছে—আর কাহারও কথা ভাল লাগে না, আর কাহারও সংসর্গ পছন্দ হয় না, পুস্তকের নীরস কাহিনীতে প্রাণ ভুলে না, পিতামাতার স্নেহ, পত্নীদিগের অতুল ভালবাসা, সুপ্রসন্নের নিকট বড়ই তিক্ত হইয়াছে। একচিন্তা, এক ধ্যান, একরূপ, এক শোভা প্রাণ মন কাড়িয়া লইয়াছে। আহারে আর মন নাই, বিলাসে আর ইচ্ছা নাই, সুপ্রসন্ন কেমন একরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এখন পিতার সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া হয়, মাতা কত কি বুঝাইতে চেষ্টা করেন, সুপ্রসন্ন সে সকলকে তিক্তবোধে তুচ্ছ করে। হতভাগ্য দারুণ বিচ্ছেদে কেমন হইয়া উঠিয়াছে। গৃহের যে স্থানে মুরলা তিন দিন ছিল, সুপ্রসন্ন কখনও সেই স্থানে বসিয়া কাঁদে, কখনও যে রাস্তা দিয়া মুরলা তিলক বাবুর বাড়ী গিয়াছিল, সেই রাস্তায় বেড়ায়, কখনও ষ্টিমার ঘাটে, কখনও বা নির্জ্জন প্রান্তরে। সুপ্রসন্নের উদরে অন্ন নাই, পরিধানে তেমন বস্ত্র নাই, রাত্রে চক্ষে ঘুম নাই,—পৃথিবীর কোন বস্তুতে আর তার আসক্তি নাই। তাহার এক আসক্তি—মুরলা। সেই মুরলা আজ কোথায়? মুরলা কি তাহার ভালবাসা সত্যই ভুলিয়াছে? দিন রাত্রি সুপ্রসন্ন এই চিন্তা করে। লজ্জা নামক যে একটা জিনিষ মানুষকে অধর্ম্ম পথ হইতে ফিরাইয়া থাকে, সে লজ্জাকে সুপ্রসন্ন বিসর্জ্জন দিয়াছে। বিবেক নামক

সে একটা পদার্থ মানুষকে পাপ প্রলোভনে রক্ষা করে, সুপ্রসন্ন তাহার মাথা খাইয়াছে। বন্ধু বান্ধবেরা কত বুঝাইয়াছেন, পিতা মাতা কত প্রবোধ দিয়াছেন, সে সকল সে তুচ্ছ করিয়াছে। সুপ্রসন্ন বলে, "এ সংসারে আমার কেহই নাই,--পিতা নাই, মাতা নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, সন্তান নাই। আমি একাকী আসিয়াছি, একাকী যাইব। মুরলা যে পথে গিয়াছে, সেই পথে যাইব।" মুরলা যে তাহাকে তুচ্ছ করিতেছে, সে ভাবনাও সময়ে সময়ে মনে উঠে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। যখন মুরলার শেষ কথা মনে জাগে, তখন মনে ভাবে, "মুরলা কি আমাকে ভুলিবে? তাহা অসম্ভব। আমারই জন্য মুরলা গৃহত্যাগ করিয়াছে, আমারই জন্য সে অকূলে ভাসিয়াছে। সে আমাকে ভুলিয়া কি লইয়া থাকিবে? আমাকে ছাড়িয়া সে কি বাঁচিবে? আমি যে তার প্রাণ, মন, দেহ, সকলই। মুরলা কখনও নিষ্ঠুর নয়; আর যদি সে নিষ্ঠুর হয়, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, আমি তাহার সকল সাধ মিটাইব! আমি বাঁচিয়া থাকিতে সে পত্যন্তর গ্রহণ করিবে? সে আমাকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকে ভালবাসিবে, চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, আমি থাকিতে সে তাহা পারিবে না। সারদা বাবু, তিলক বাবু আমার পথে কণ্টক পুতেছেন, আমি কি তাঁহাদিগকে অল্পে ছাড়িব? অরবিন্দ বাবু পবিত্রচেতা ব্যক্তি, তিনি সত্য ও ন্যায়ের সহায়, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া মুরলা আমাকে কখনও ভুলিবে না। প্রথমতঃ অন্য চেষ্টা করি, তাহাতে অকৃতকার্য্য হই, তাঁহাকে সকল জানাইব। তিনি কি আমাদিগের বিবাহ দিবেন না? অথবা আমরা যে গন্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিয়াছি, তাহা কি তিনি অনুমোদন করিবেন না? শুনিয়াছি, তাঁহার মত লোক আর এ দেশে জন্মে নাই। তিনি কখনও আমাদিগের সুখের পথে বাধা দিবেন না? যদি বাধা দেন, তাঁহার প্রাণ লইতে কি পারিব না? বাল্যকাল হইতে আমি ভীষ্ম, এ জীবনে কত কুকার্য্য করিয়াছি, নয় আর দুটো কুকর্ম্ম করিব। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, আমি আর পথ না পাইলে এই পথই ধরিব। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, কি মধুর কথা। এ যে স্বর্গের বাণী। ইহা জগতে না থাকিলে, কাহারও শাসন হইত না। আমার মুখের গ্রাস যে কাড়িয়া খাইবে, আমি অল্পে তাহাকে ছাড়িব? আমি যে দুর্জ্জয় পিতার পুত্র, আমার দ্বারা তাহা কখনও হইবে না। আমি দরিদ্র, অসহায়। যাহা হই তাহা হই, কিন্তু প্রতিজ্ঞায় আমি ভীষ্ম। ভীষ্মের

কি দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা! আকাশ পাতাল আমার প্রতিজ্ঞায় কাঁপিবে না? মুরলা আমাকে জানে না? আমার প্রতিজ্ঞার কথা জানে না? আমি জীবনে যত নরহত্যা করিয়াছি, তাহা কি সে বৃথাই শুনিয়াছে? সে আমার ভয়ে কাঁপিবে না? আমি কত কুলবধূর মুখে কালী দিয়াছি, কত ভ্রূণ-হত্যার সহায় হইয়াছি, মুরলা কি না জানে? জানিয়াই ত সে আমাকে ভালবাসিয়াছে। জানিয়াই ত সে আমার প্রেমে মজিয়াছে। এখন সে আমাকে ছাড়িবে? আর আমি তাকে অল্পে ছাড়িব? আমি তার জন্য সব পরিত্যাগ করিতে পারি। সংসার তুচ্ছ, সব তুচ্ছ, তাহাকে ছাড়িতে পারি না। বন্ধুরা আমাকে ভুলাইতে চেষ্টা করে, জানে না, আমি মুরলার জন্য পাগল। লোকে বলে, আমি মুরলার বিষয়ের জন্য পাগল। কথাটা একেবারে অসত্য না হইলেও, আমি কি কেবল বিষয় লইয়া, টাকা লইয়া মুরলাকে ভুলিতে পারি?"

সুপ্রসন্ন সময় সময় এরূপও চিন্তা করে—"মুরলাকে ভুলিই না কেন? সে যখন মায়া ছাড়িল, আমাকে অপমান করিল, তখন তাহার জন্য পাগল হই কেন? সে অপমান করিল, কিন্তু আমি তাহাকে কয়েদ রাখিয়াছিলাম, একথা ত প্রাণান্তেও বলিল না। আমাকে বাঁচাইতে তাহার এত সাধ! বুঝেছি, আমার জন্য আজও তাহার প্রাণ কাঁদে। আমি যার জন্য অস্থির, সে কি আমাকে কখনও ভুলে থাক্‌তে পারে? ভালবাসায় ভালবাসা টানে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ কথা। আমি তার জন্য ভেবে ভেবে অস্থির, আর সে আমাকে ভুলিবে? এই কদিন সে গিয়াছে, ইহার মধ্যে আমি তাহার নামে ৫০ খান পত্র লিখিয়াছি। ৫০ খান পত্রের ৪ খান পত্র পাঠাইয়াছি। সে পত্র কি সে পায় নাই? পাইয়াও কি সে নীরব থাকিতে পারে? তার স্মৃতি আমার জীবন, আর সে কি আমাকে ভুলিয়া আছে? আমাকে ভুলিয়া সে কি সুখ পাইবে? তার কথা মনে করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, পুলকে হৃদয় নৃত্য করে। তার সে মনোমোহিনী মূর্ত্তি, সে আজানুলম্বিত সুচিক্কণ কেশরাশি, সেই সুদীর্ঘ ভ্রূযুগল, সেই বিস্ফারিত উজ্জ্বল নয়ন দুটী, সে অমিয়া-মাখা হাসি, সে কমনীয় চাহনি, তার কি ভুলিবার যোগ্য? আমি তার কি ভুলিতে পারি? তার অমৃতময় করস্পর্শ ভুলিতে পারি না, তার সুমিষ্ট মধুর বাক্য ভুলিতে পারিনা, আর সস্নেহ দৃষ্টি ভুলিতে পারি না, তার স্বর্গীয় কান্তি ভুলিতে পারি না। সে ভুলিলেও আমি তাকে

ভুলিতে পারি না। যদি এমন হয় যে, সে আর আমাকে ভালবাসে না, সত্যই যদি এরূপ হয়, তাহা হইলেও আমার ভালবাসিতে বাধা কি? আমি কল্পনায় তাহার মূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকিব। কল্পনায় তাঁহাকে প্রাণে জড়াইব। কল্পনা, কল্পনা, স্মৃতি, স্মৃতি, তোরা কি মধুর। আমার শরীর অবশ করিতে তোদের মত আর কে আছে,? তোদের সাহায্যে আমি হাসি, তোদের সাহায্যে আমি কাঁদি। কল্পনা, তোর পূজায় আমি স্বর্গ পাই, তোর পূজায় নরকে ডুবি। আমার স্বর্গ, মুরলার স্মৃতি; সে স্মৃতি তুই প্রাণে চির উজ্জ্বল করিয়া দে। আমি তার জন্য পাগল হই। সে যেথায়, সেথায় তুই লইয়া যা। মুরলার কাছে তুই একবার কি যেতে পারিস্ নে? যা স্মৃতি, তাহার কাছে যা। আবার নবীন হয়ে, তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে আবার প্রেমভরে নবীন হয়ে আমার কাছে আয়। তাহাকে চুম্বন করে, সেই আভাস আমার নিকট লয়ে আয়। তাহার আভাস আমাকে দে, আমার আভাস তাহাকে দে। তু-ই ত মিলনের ভূমি! তু-ই ত মধ্য-বিন্দু। তোর পায়ে ধরি, স্মৃতি, তুই কখনও আমাকে ছাড়িস্‌নে, তুই কখনও মুরলাকে ছাড়িস্‌নে। মুরলাকে ছাড়িলে সে যে আমাকে ভুলিবে! হায়, তাহা হইলে আমার দেহে যে আর প্রাণ থাকিবে না! বল্, কল্পনে, বল্ স্মৃতি, তাহাকে পরিত্যাগ করিস্ নাই ত? যদি পরিত্যাগ করে থাকিস্, বায়ুভরে এখনই উড়ে যা, মেঘের মাথায় উঠে চলে যা, ঐ সূর্য্যের রশ্মি ধরে তার কাছে যা। মুরলা কি করে, কি বলে, একবার দেখে আয়, শুনে আয়। সে যদি আমাকে ভুলে থাকে, তবে তাহাকে আবার জাগাইয়া আয়। মারিস্ ত দুই জনকে মার, রাখিস্ ত দুই জনকে রাখ। মিলনপুরের নৌকা যে তুই। তাহাকে ছাড়িয়া যদি কেবল আমাকে ধরিয়া থাকিস্, আমি যে বিচ্ছেদপুরের মরু-ভূমিতে মারা যাইব! তোর প্রাণে কি দয়া মায়া নাই? হায় মিলনপুরের সরস, সস্নেহ, মধুর বায়ু আমার প্রাণকে আর কি শীতল করিবে না? তুই সহায় না হইলে আমার আর সহায় নাই। তুই আমাকে যেমন সজীব রেখেছিস্, তাকে কিছুতেই ভুল্‌তে দিচ্ছিস্‌নে, তাহাকেও সেইরূপ কর। তোর পায়ে ধরি, চলে যা।”

সুপ্রসন্ন কখনও ভাবে—“আমি হলেম কি? এক রমণীর মায়ায় ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ডুবাইলাম!! মাতার চক্ষের জল, পত্নীদিগের চক্ষের জল, অবোধ সন্তানের চক্ষের জল, আমি সব ভুলিলাম? কিছুই আমাকে ফিরাইতে

পারিবে না? কলিকাতায় যাওয়াই কি ঠিক? ঘোর দারিদ্র্যে পিতা নিপীড়িত, সকল দিন পরিবারের অন্ন যুটে না, আমি উপযুক্ত পুত্র, পিতার কোন সাহায্যই করিব না? চক্ষে কত দেখা যায়? দেখিতে ত আর পারি না? এই জন্যই কি পিতা আমাকে পড়াইয়াছিলেন? হায়, তাঁহাদের কত আশায় ভস্ম ঢালিতেছি! কার জন্য? কেবল রমণীর প্রণয়ের জন্য। ছি, যৌবন ক'দিনের, রূপ ক'দিনের? মুরলার রূপ কি মলিন হইবে না, হায়, আমার বাসনার আগুন কি নির্ব্বাণ হইবে না? হায়, আমার রিপু কি নিস্তেজ হইবে না? দিন দিন আয়ু ক্ষয় হইতেছে, চিরদিন কি থাকিবে? ঐ শ্মশানের ভস্মে সকলই ত ডুবিবে, আমি থাকিব না, মুরলা থাকিবে না, পিতা মাতাই বা আর কত দিন এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে জীবন ধারণ করিবেন? মায়ের আমি একমাত্র পুত্র। আমি একমাত্র পুত্র, কিন্তু আমি নরাধম, তাঁহার জন্য কিছুই করিলাম না!! সর্ব্বনাশিনী মুরলা, তুই কালসর্প বেশে কেন আমাকে দংশন করিলি? ছাড়, ছাড়, আমি চাকুরী করিতে যাই। মায়ের চক্ষের জল মুছাইতে যাই। তোর পায়ে ধরি, আমাকে ছাড়। কিছু-তেই ছাড়বিনে? তোর স্মৃতি কিছুতেই নিবিবে না? তুই আমাকে জোর করিয়া টানিয়া কলিকাতা লইয়া যাইবি? বলত, কি খাইব, কোথায় থাকিব? আমি যে দরিদ্র, তবও ঘরের বাহির করবি? তবুও ভিখারী করবি! মুরলা, তোর পায়ে ধরি, আমাকে ছেড়ে দে, আমি বাঁচি। না, মুরলা আমাকে ক্রমাগত ডাকিতেছে, না যাইয়া বা থাকি কি ক'রে? সে আমার জন্য পাগল হয়েছে, কলিকাতা তার পক্ষে শ্মশান, আমি যেখানে নাই, সেখানে সে থাকিবে না, থাকিতে পারে না। তবে আমি যাই। দুঃখ কষ্ট অদৃষ্টে থাকে, কে খণ্ডাইবে? মায়ের চক্ষের জল কে ঘুচাইবে? আমি মুরলার আহ্বান ভুলিতে পারি না। আমি তবে যাই। মুরলে, প্রাণাধিকে, অধৈর্য্য হইও না, আমি শীঘ্রই যাইতেছি।

এইরূপ প্রলাপ চিন্তায় সুপ্রসন্নের শরীর জরজর। বরিশালে থাকা ক্রমে সুপ্রসন্নের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইয়া উঠিল। ৫।৬ দিনের পরই সুপ্রসন্ন বাড়ী হইতে পলায়ন করিল। একটি বন্ধুর বাক্স ভাঙ্গিয়া কয়েকটী টাকা আত্মসাৎ করিয়া অচিরে সে কলিকাতা রওয়ানা হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আরামপুরের কথা।

আরামপুর ফরিদপুর জেলার একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রাম পূর্ব্বে বরিশাল জেলার অধীন ছিল, ১৫ কি ১৬ বৎসর হইল মাদারিপুর মহকুমার সহিত ফরিদপুরের অধীন হইয়াছে। আরামপুরে অনেক কুলীন কায়স্থের বাস। বঙ্গজ কায়স্থের মধ্যে আরামপুরের বসু বংশ দেশ-বিখ্যাত। বসু মহাশয়দিগের উপাধি চৌধুরী। ইঁহারা বহুদিন হইতে আরামপুরে আছেন।

আরামপুরের চতুর্দ্দিকে বিল। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে আরামপুরের চতুর্দ্দিকের বিলের জল গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রেও শুকাইত না, বারমাস থাকিত। আরামপুরের চতুর্দ্দিকে বিল, বিলে শ্বেত পদ্ম, রক্ত পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি বহু জলজ ফুল শোভা পাইত। সে শোভায় আকাশ হইতে দেব দেবীগণের মর্ত্ত্যে অবতরণ হইত কিনা, জানি না; কিন্তু আরামপুরের সৌখিন বাবুরা বর্ষাকালে পদ্মবনে নৌকায় ভ্রমণ করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। আরামপুর বিলের বুকে বর্ষাকালে একটী দ্বীপের মত ভাসিতে থাকিত। কথিত আছে, মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে এই ভদ্র বংশের পূর্ব্ব-পুরুষেরা আরামপুরে আসিয়া বাস করেন। সে অনেকদিন পূর্ব্বের কথা।

আরামপুরের বাবুরা জমীদার, কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় অনেকেই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন। দারিদ্র্যের জন্য লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, অবশিষ্ট লোক বিবাহাদির পণের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যাঁহারা লেখাপড়ায় বিমুখ, তাঁহা-দের দুটী চারিটী ছেলে মেয়ে হইলে তাহাদের বিবাহের পণের দ্বারা কোন রূপ চলিবে, এ আশা অনেকে করিয়া থাকেন। আরামপুরের এজন্য নিন্দা নাই। আরামপুরে ছেলে মেয়ের বিবাহ দিতে বহুদূরের লোকেরাও উৎসুক।

কৌলিন্য প্রভাবে, আরামপুর দেশ বিদেশে সুবিখ্যাত। এই কৌলিন্যের জন্য আরামপুরে ছেলে মেয়ের অতি শৈশবে বিবাহ হয়। যাঁহারা অপকর্ম্ম করেন না, তাঁহারাও লোকের উত্তেজনায় বাল্যকালে ছেলে মেয়ের বিবাহ না দিয়া পারেন না। যাঁহারা অপকর্ম্ম করেন, তাঁহারা ত টাকার মায়ায় অতি শৈশবে একাজ সমাধা করিয়া থাকেন। এখন সে অবস্থা কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বের অবস্থা যাহা ছিল, ভাবিতেও কষ্ট হয়।

আরামপুরের বিল ভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর কিছুই নাই। আহারের জিনিসের মধ্যে খুব মৎস্য ও দুগ্ধ মিলে। বৃক্ষাদি এ গ্রামে বড় একটা নাই, হিজল, বন্যা, বেত, কুল, বকুল ও তেঁতুল গাছের সংখ্যাই এ গ্রামে অধিক। অন্যান্য বৃক্ষাদি কদাচিৎ দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষই বা জন্মিবে কোথায়, গ্রামের এত লোকের বসতি যে, গৃহস্থ ব্যক্তি ঘর করিতে স্থান পায় না। চৌধুরী বাবুরা কিন্তু বারমাস গৃহাবাসের কষ্ট সহ্য করিয়াও দেশান্তরে যান না। পুরুষ পরম্পরার প্রথা, দেশান্তরিত হইতে নিষেধ করে। আরামপুর গ্রামটী ছোট, কিন্তু খুব জনাকীর্ণ।

পক্ষীর মধ্যে চড়ুই, বাবুই, চিল, বাজ, বাদুর, বিলের বক, পানীকৌড়িই অধিক। শীতকালে যখন পাহাড়ের নানারূপ পক্ষী বিলে নামে, তখন রকম রকম সুন্দর সুন্দর পাখী দেখা যায়; এত রকম যে তাহার বর্ণনা হয় না। সরালী, পিপি, দিগরী, নাড়লী বহুবিধ পক্ষী এই সময়ে জলে ভাসে। বারমেসে পক্ষীর মধ্যে দয়েল, কোকিল ও পাপিয়াই প্রধান।

জ্যৈষ্ঠ মাসে বিদেশের ছাত্রেরা বাড়ী আসিয়াছে। হিজলের ফুল, শোভায় ও সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছে। দুটী যুবক বিলের ধারে পদ্মবনের নিকটে বসিয়া প্রাণে প্রাণে মিলিয়া কত কি কথা বলিতেছেন। একটী যুবক কলিকাতায় ও আর একটী যুবক দেশে থাকেন। দুটী যুবক, সম্পর্কে ভাই। দুটী ভাই, বাল্য বন্ধু।

ছোট ভাই। দাদা তুমি বিদেশে গিয়াছ পর, আমার আর দেশে থাকিতে মন নাই; দেশে থাকা বড় দায়। একে মদের স্রোতে দেশ ডুবিয়াছে, তাহাতে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যায় দেশ সদা সশঙ্কিত। ছোট ছোট বিধবা মেয়েগুলির প্রতি যে অত্যাচার, ভাবিলে হৃদয় শুকাইয়া যায়। তুমি দেশ ছাড়িয়াছ, বেশ আছ। আমার আর এক মুহূর্ত্ত এদেশে থাকতে ইচ্ছা হয় না।

বড় ভাই। নেপি, আমি বিদেশে গিয়া সদাই তোমার কথা ভাবি। কবে তোমাকে দেখিব, সকল সময়ে এই চিন্তা। তুমি যদি কলিকাতায় যাও, মনে কত আনন্দ পাই।

ছোট ভাই। ছেলে বেলা যেরূপ কাহারও কথা মানিতে না, এখনও কি দাদা তুমি সেই রূপ কর?

বড় ভাই। আমি কাহারও কথা মানিয়া চলিতে পারি না। এখানে মোটেই পড়িতাম না, সেখানে স্কুলে পড়ি বটে, কিন্তু ৫।৬ মাসের মধ্যে একটা শিক্ষকের খামখেয়ালি অবাধ্যতায় স্কুল ছাড়িয়া অন্য স্কুলে গিয়াছি।

ছোট ভাই। শিক্ষকের অবাধ্যতা কিরূপ?

বড় ভাই। শিক্ষক বালকদের দ্বারা পা টিপাইতেন, ইহা আমার অসহ্য। একদিন আমাকেও ঐ কার্য্য করিতে বলায় তাহা না করিয়া স্কুল ছাড়ি। তুমি জান, ছেলে বেলা হইতে আমি কাহারও অধীন হইয়া চলিতে পারি না। এজন্য লাঞ্ছনা অনেক সহিয়াছি বটে, কিন্তু একদিনও অসুখী হই নাই। এ পৃথিবীতে কাহারও মতে চলিতে আমার ইচ্ছা নাই।

ছোট ভাই। তুমি ত দেবদেবী কিছুই মান না, ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে সমান জ্ঞান কর, বলত এ শিক্ষা তুমি কোথায় পাইলে?

বড় ভাই। কোথাও পাই নাই, নিজের মন হইতে ইহা পাইয়াছি। কবে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে, আমি সেই চিন্তায় বড় অস্থির হইয়াছি।

ছোট ভাই। জাতিভেদ কি কখনও উঠিবে, মনে কর? মানুষের মনে ভেদ-বোধের অঙ্কুর যতদিন, এ ধরায় জাতিভেদ ততদিন। উপরে উঠিয়া কে নীচে নামিতে চায়? ধনী দরিদ্রকে, জ্ঞানী মূর্খকে, রাজা প্রজাকে চিরকাল ঘৃণা করিবে; ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমজ্ঞান হইলে কি হইবে? এদেশ হইতে পৌত্তলিকতাও উঠিবে না। মানুষ যতদিন কল্পনার পূজক, ততদিন পৌত্তলিক। দাদা, তোমার মনের অস্থিরতা কেমনে বিদূরিত হইবে?

বড় ভাই। ভাই, তুমি ঠিক বলেছ। যেখানে যাই, যেদিকে চাই, সর্ব্বত্র ভেদ-বোধের অঙ্কুর। জাতিভেদ, প্রেমের পথে চিরকালের তরে অর্গল বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ভাবিতেও কষ্ট পাই।

ছোট ভাই। তুমি ও সব বড় বড় বিষয় লইয়া মাথা ঘুরাও কেন? প্রেম প্রেম করিয়া অস্থির হও, কিন্তু জান না কি, কর্ম্ম ভিন্ন প্রেম থাকে

না? কই, কোন্ লোকের জন্য তুমি এ পর্য্যন্ত কি করেছ? আমি তোমার বন্ধু, তোমার ছোট ভাই, কই আমার জন্য কি করেছ? শোভা, তোমার কনিষ্ঠা বিধবা ভগ্নী, তার জন্য কি করেছ? প্রতুল তোমার কত ভালবাসার পাত্র, তার জন্য কি করেছ? বড় বড় কথা আর বলো না? কলিকাতায় যারা যায়, তারা কেবল বড় বড় কথা শিখে আসে, কিন্তু কাজে কিছুই করে না। আমার বড় ভয় হয়, পাছে তুমিও সেইরূপ হও!

বড় ভাই। ঠিক বলেছ ভাই। আমি কি করে কি করিব, ভেবে ঠিক পাই না। তুমি আমার সহায় হও ত অনেক কাজ করিতে পারি।

ছোট ভাই। আমি তোমার অকর্ম্মণ্য ভাই, তোমার সাহায্য করিতে সদা প্রস্তুত। যাহা বলিবে, বীরের ন্যায় করিব।

বড় ভাই। এস আমরা একটা সভা করি। সর্ব্বাগ্রে বিবাহের পণ তুলিতে চেষ্টা করি। তারপর শিক্ষা-বিস্তারে হাত দিব। কি বল নেপি?

ছোট ভাই। দাদা, সভাটভার প্রতি আমার কোন আস্থা নাই। অনেক লোক বিদেশে শিক্ষিত হয়ে দেশে এসে একটা হুজুগে সভা করেছিলেন, কিন্তু কাজে কেহই কিছু করেন নাই। ক্রমে ক্রমে সকলেই মদ ধরেছেন, জাল জুয়াচুরি ধরেছেন। সভা করে কি হবে? আমি বলি, তোমার মনের বল অধিক, তুমি একেবারে কাজ সুরু কর।

বড় ভাই। কি কাজ করিব?

ছোট ভাই। অমৃতের মা রোগে যারপর নাই কষ্ট পাইতেছে, তার একটী মেয়ে ভিন্ন আর কেহ নাই। সে মেয়েটাও পীড়িত। মুখে জল তুলে দেয়, এমন কেহ নাই। সে চণ্ডালিনী ব'লে সকল লোক তাকে ঘৃণা করে। একদিন তার চরিত্রে দোষ ছিল ব'লে, কেহ ধারে ঘেসে না। তুমি আমি চল যাই, তাদের সেবা করে কৃতার্থ হই।

বড় ভাই। এ বেশ কথা। আর কি করিতে বল?

ছোট ভাই। এইরূপ যে যেখানে রোগে কষ্ট পাইবে, আমরা তাদের সেবা করিব। তারপর এস আমরা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাতে পড়ানের একটা বন্দোবস্ত করি।

বড় ভাই। আমি যে একমাস পরেই চলে যাব।

ছোট ভাই। কাজ আরম্ভ করে যাও, তোমার এ দাস শেষে সব চালাইবে।

বড় ভাই। আর কি করিতে বল?

ছোট ভাই। আরো বলি, শোভার একটা উপায় কর। তুমি আমি উভয়েই ছেলে বেলা বিবাহ করিতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু এস প্রতিজ্ঞা করি, আর কাহারও যাহাতে এত অল্প বয়সে বিবাহ না হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। অন্ততঃ আমাদের দুটী পরিবারেও যদি একটা আদর্শ দাঁড় করাইতে পারি, এ সামান্য জীবদিগের পক্ষে যথেষ্ট। ক্ষুদ্র কাজ বলে যে তাহা করিতে অবহেলা করে বা অসমর্থ হয়, সে কখনও বড় কাজ করিতে পারে না। তোমার স্ত্রী ও আমার স্ত্রী এখন বালিকা, এস, তাহাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করি। তারা যে কিছুই বুঝে না!

বড় ভাই। বেশ বলেছ। ভাই নেপি, তোর মন এত উন্নত যে আমি ছেলেবেলা হইতে তোর কথা ভেবে অবাক্ হই। এই জন্যই তোকে এত ভালবাসি। এত বড় সহর কলিকাতা দেখে এলেম, তোর মত প্রাণ কোথাও পেলেম না। তুই নরপুরে অমর দেবতা। তুই মর্ত্ত্যধামে নর-নারায়ণ; তুই আমার ছোট ভাই, কিন্তু তুই আমার শিক্ষাগুরু। বেঁচে থাক্ ভাই। আশীর্ব্বাদ করি, তোর দ্বারা এই আরামপুরের মুখ উজ্জ্বল হউক। এখন চল, অমৃতের মাকে দেখি যেয়ে। আমাদের একাজে কেহ বাধা দেয় ত তাহার সর্ব্বনাশ করিব।

দুই ভাই গলা ধরাধরি করিয়া অমৃতের মায়ের ঘরে চলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বড় আশায় ছাই পড়িল।

দুই ভাই যখন অমৃতের মায়ের ঘরে উপস্থিত হইলেন, তখন অমৃতের মা রোগ কষ্টের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া অমৃতধামে চলিয়া গিয়াছে, অমৃতও রোগে জীর্ণ শীর্ণ, সে মায়ের গলা ধরিয়া শুইয়া আছে। দুঃখিনীর মৃত শরীর স্পর্শ করে, এমন লোক নাই। এ দৃশ্য দেখিয়া দুটী ভ্রাতার মন যে কিপ্রকার শোকে দুঃখে অবসন্ন হইল, লেখা অসাধ্য। দুটী ভাই অমৃতের হাত ধরিয়া তুলিলেন, অমৃতকে অনেক বুঝাইলেন, তার চক্ষের জলে অনেক চক্ষের জল মিশাইলেন। অমৃতকে লইয়া ছোট ভাই আপন গৃহে গমন

করিলেন। ছোট ভ্রাতার স্ত্রীর বয়স এই বারো বৎসর, তাহাকে বলিলেন, "অমৃতের ধারে বসো, কাহারও কথা শুনে পলাইও না। অমৃতের মা মরেছে, তার সৎকারের উপায় করিতে আমি যাইতেছি।" তারপর ছোট ভাই দুই একজন বাল্যবন্ধুকে লইয়া আবার অমৃতের মায়ের শবের ধারে আসিলেন। দুই ভাই নানাপ্রকার পরামর্শ করিয়া সৎকারের বন্দোবস্ত করিলেন। উভয়ে শব বহন করিয়া শ্মশানে গেলেন, এবং তার পর যাহা যাহা করিবার, সকল করিলেন। একটী চাকর বাধ্য হইয়া কেবল সাহায্য করিল। আর দুটী বাল্যবন্ধু ভালবাসার মায়ায় কতক সাহায্য করিল। কোনরূপে কার্য্যোদ্ধার হইল। কিন্তু এই ঘটনায় আরামপুরে দুই ভাই-য়ের নামে অনেক কুৎসা রটিল। দুই ভাই কিন্তু সে সকল কথায় দমিলেন না।

কয়েক দিনের সেবা শুশ্রূষায় অমৃত সুস্থ হইল। অমৃত বালিকা নয়, যুবতী। ইহাকে রক্ষা করিতে দু ভাইকে বড়ই বিভ্রাটে পড়িতে হইল। স্ত্রীলোকের প্রতি এদেশের সম্মানটা খুব বেশী বলিয়াই হউক, বা সচ্চরিত্র-তার আধিপত্যটা হিন্দু সমাজে যথেষ্ট বলিয়াই হউক, অমৃতের দিকে অনেক কুটিল নয়নের তীব্র আক্রমণ। সে আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করা দুটী যুব-কের পক্ষে কঠিন ব্যাপার। মেয়েরা এ কার্য্যে খুব সাহায্য করিল। দুই ভ্রাতার দুই স্ত্রী একার্য্যে প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। দুই ভাই আরো অনেক কাজে হাত দিলেন। রোগীর চিকিৎসা, বালিকার শিক্ষা, যুবকদের চরিত্রোন্নতি-বিধান, এ সকল কাজে তাঁহারা খুব মনোযোগী হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে আরাম-পুরে একটু বিশেষ আন্দোলন উঠিল। কিন্তু কালের মহিমা কে বুঝিবে, এক মাসের মধ্যে ছোট ভ্রাতা প্রাণত্যাগ করিলেন। এমন ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হইলেন যে, তাহা হইতে আর উঠিলেন না। ছোট ভ্রাতার স্ত্রীর কপালের সিঁদূর উঠিল, হাতের শাঁখা ভাঙ্গিল। এই ঘটনায় বড় ভাই যে প্রাণে কি যাতনা পাইলেন, আরামপুরের কেহ তাহা জানিল না। মৃত্যু সময়ে ছোট ভাই স্ত্রীকে বলিলেন,—"আমি তোমার এই বয়সে তোমাকে অকূলে ভাসাইয়া চলিলাম। তুমি এখন বড় হয়েছ, ভাল মন্দ সকলই বুঝিতেছ, দাদার পরামর্শ মত চলিও। বিষয় ইত্যাদি থাকে না থাকে, সেদিকে চাহিও না; ধর্ম্মকে রক্ষা করিবে, পরোপকার করিবে, লেখাপড়া করিবে, তবেই তোমার দিন ভালভাবে যাইবে।"

এই দুইটী ভাই সহোদর নহে, জেঠাত খুড়াত ভাই, এক বাড়ীতে কিন্তু পৃথক পৃথক ঘরে থাকিতেন। দুটী ভাই বাল্যকাল হইতে সহোদরের ন্যায় পরস্পরকে ভালবাসিতেন। একজন অপরের প্রাণের জিনিস। ছোট ভ্রাতার মৃত্যুতে বড় ভ্রাতার মস্তকে বড় গুরু ভার চাপিল। কি করিবেন, ভাবিয়া তিনি ঠিক পাইলেন না। আরো দুই মাস অপেক্ষা করিলেন। ছোট ভ্রাতার শ্বশুর আসিয়া মেয়ের ভাসুরের সহিত বিষয় লইয়া মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন। আরামপুরের একশ্রেণীর লোক মোকদ্দমায় মাতিয়া উঠিল। কতক এ পক্ষে কতক ও পক্ষে যোগ দিল। বড় ভাই আর অধিকদিন গ্রামে থাকিতে পারিলেন না, কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। ইঁহারই নাম অরবিন্দ চৌধুরী, ইঁহার স্ত্রীর নাম অশোকা, ছোট ভ্রাতার নাম নেপালচন্দ্র চৌধুরী, স্ত্রীর নাম মুরলা। মুরলা ১২ বৎসর বয়সে অমূল্য স্বামীরত্নে বঞ্চিতা হইলেন।

নেপালচন্দ্র যেমন অরবিন্দের ছোট ভাই, মুরলা তেমনি অশোকার ছোট ভগ্নী। নেপালের পিতা, অরবিন্দের পিতার বড় ভাই, অশোকার পিতা মুরলার পিতার বড় ভাই। নেপালের পিতা অরবিন্দের পিতার সহোদর নয়; কিন্তু অশোকা ও মুরলার পিতা সহোদর। দুটী ভগ্নী সমবয়স্কা, বাল্য সখী। দুই ভাই সমবয়স্ক, বাল্য বন্ধু। নেপালের মৃত্যুতে অশোকা দারুণ বেদনা পাইলেন। অরবিন্দের মনে যে কি আঘাত লাগিল, ব্যক্ত করা কঠিন। এই সময় হইতে অরবিন্দ যেন নব জীবন লাভ করিলেন। পূর্ব্বাধ্যায়ে বিবৃত নেপালের কথা কয়েকটী অরবিন্দের জীবনে ঘোরতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। তিনি বক্তৃতা ছাড়িয়া কাজ ধরিলেন, তিনি দেশের অগণ্য অভাব রাশির মধ্যে ক্ষুদ্র প্রাণ ডুবাইবেন, সঙ্কল্প করিলেন। সিদ্ধিদাতা বিধাতা অরবিন্দের সঙ্কল্পের সহায় হইলেন।

বহুদিন হইল নেপালের পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে। একটী জেঠাত ভাই ভিন্ন নেপালের আর কেহই নাই। মুরলার পিতা তাহার সহিতই মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন। নেপালের বিষয়ে তিন চারি শত টাকা আয় হইবে। অরবিন্দের পিতা নাই, মাতা নাই। অরবিন্দ যখন কলিকাতায় গমন করিলেন, তাহার অব্যবহিত পরেই মুরলা ও অশোকা পিত্রালয়ে গেলেন। এদিকে মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। আর সেই অসহায়া অমৃত? অমৃতও দুঃখের সহচরী মুরলার সহিত চক্রধরপুর যাত্রা করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অরবিন্দের জীবন আরম্ভ।

এবার কলিকাতায় যাইয়া অরবিন্দ সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। গুরুতর কর্ত্তব্যের বোঝা যাহার মস্তকে, তাঁহার সুস্থির থাকিবার যো নাই। নেপাল চন্দ্রের উপদেশ প্রাণে গাথা,—দেশের অনন্ত অভাব রাশি কিরূপে দূর করিবেন, এই চিন্তা এক দিকে, অন্য দিকে মুরলা, অমৃত ও শোভার চিন্তা। অশোকার চিন্তাও সামান্য নহে। অরবিন্দ কলিকাতার অধীন চেত্‌লায় থাকিতেন, এবং এই সময়ে ভবানীপুরের লণ্ডন-মিশনারি স্কুলে পড়িতেন। চেত্‌লা পৌছিয়া তিনি এই কয়েকটী কাজে প্রবৃত্ত হইলেন।

১। কালীঘাট ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন। ২। ছাত্রদিগের চরিত্র ও শিক্ষার উন্নতির জন্য চেত্‌লা বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা। ৩। যুবকদিগের শারীরিক উন্নতির জন্য চেত্‌লা জীবনাষ্টিক-ক্লব প্রতিষ্ঠা। ৪। পরিবার-সংস্কার-সভা সংস্থাপন। কালীঘাটের ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার খুব উন্নতির অবস্থা। ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য অরবিন্দ এত ব্যস্ত হইলেন যে, প্রত্যহ চেত্‌লার বাসায় ৩০। ৪০ টী ছাত্রকে রীতিমত পড়াইতেন। যুবকদিগের নৈতিক উন্নতির জন্য বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং এজন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। জীবনাষ্টিক ক্লবে, দুর্গাপুরে, প্রত্যহ: ২৫। ৩০ জন যুবক ব্যায়াম করিতে উপস্থিত হইত। পরিবারের মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান ও শিল্পের উন্নতি প্রভৃতিই পরিবার-সংস্কার-সভার উদ্দেশ্য ছিল। ৩। ৪ টী পরিবার অরবিন্দের কার্য্যক্ষেত্র ছিল। একটী পরিবারের বৃদ্ধ স্ত্রীলোকেরা অরবিন্দের পত্রে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। অনেক স্থানে পত্রাদির দ্বারা কাজ হইত। বলা বাহুল্য যে, মুরলা, অশোকা ও শোভাও এই সভার অধীন ছিলেন। এই সময়ে চেত্‌লার ছাত্র এবং অন্যান্য লোকদিগের উপর অরবিন্দের এতদূর আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল যে, তাস পাশা প্রভৃতি খেলিবার সময় অরবিন্দ হঠাৎ উপস্থিত হইলেই তাহা বন্ধ করিত। আলীপুরের কয়েক

জন শিখ-সৈন্যও অরবিন্দের প্রতি এই সময়ে বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজন, অরবিন্দের ভালবাসার খাতিরে চাকুরি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিল। বাসার একটী ব্রাহ্মণ-কুমার উপবীত পরিত্যাগ করেন। অরবিন্দ সমস্তদিন চর্‌কির কলের মত কার্য্যক্ষেত্রে ঘুরিতেন ;—কখনও ছাত্র পড়াইতেছেন, কখনও বিদ্যোৎসাহিনী সভার রচনা লিখিতে-ছেন, কখনও নিজ হস্তে ফুলের বাগান প্রস্তুত করিতেছেন, কখনও সূত্রধরের কাজ করিতেছেন, কখনও দরজির কাজ করিতেছেন, কখনও জীব্‌নাষ্টিক ক্লবের কাজ করিতেছেন,কখনও নির্জ্জন চিন্তা ও পত্রাদি লিখিতেছেন,কখনও পাঠ, কখনও উপাসনা। সমস্ত দিন এইরূপ বহু কাজে লিপ্ত থাকিতেন। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত একটী ঘণ্টা অপব্যয় হইত না। এত কাজের ভিড়, কিন্তু তবুও মনে শান্তি নাই। মনে দুই চিন্তা, এক চিন্তা এই,—"দাদারা কত আশা করিয়া চাকুরির উপযোগী করিবার জন্য আমাকে শিক্ষা দিতেছেন, আমি ত সেই চাকুরি করিব না, না জানি ইহাতে দাদারা মনে কত কষ্ট পাইবেন।" দ্বিতীয় চিন্তা এই,—"দেশের জন্য জীবন ঢালিব, কিন্তু অশোকা, মুরলা, শোভা ও অমৃতের উপায় কি হইবে ?" এই দুই চিন্তায় শরীর মন জর্জ্জরিত। দিন, কাজের ভিড়ে, তবুও একরূপ ভাল ভাবেই কাটিয়া যায়, রাত্রে আর কিছুতেই ঘুম হয় না। উপাসনার সময় বিধাতার নিকট ইহাদের জন্য কত প্রার্থনা করেন, বন্ধুদের নিকট কত আক্ষেপ করেন, কিন্তু কেহই মনে শান্তি দিতে পারে না। আহার পরি-চ্ছদে মন নাই, সদাই দারুণ চিন্তায় বিভোর। অরবিন্দ তাঁহার দাদার নিকট শোভার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া ১০০ পৃষ্ঠার একখানি পত্র লিখিলেন ; কিন্তু দাদা কিছুই উপায় করিলেন না। মন ইহাতে আরও খারাপ হইল। অরবিন্দ উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। নির্জ্জনে বসিয়া যাহা মনে উঠিত, বলিতেন। এক দিন উপাসনার সময় এইরূপ বলিতেছিলেন—"ঈশ্বর, আমার মস্তকে এত গুরু চিন্তা কেন চাপাইলে, আমি যে মারা যাই। ভারতে কত হাহাকার, কত অশ্রুপাত, কত নির্য্যাতন, দেব, এ সকল কি কখনও দূর হইবে না ? আমি কি এ সম্বন্ধে একটুও সাহায্য করিতে পারিব না ? আমি অপবিত্র জীব, আমার সেবা কি তোমার কাজে লাগিবে না ? আমি কি করি ? দাদাদের হাত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাই ? শোভার চক্ষের জল কিরূপে মুছাই ? মুরলা

ও অশোকার কি উপায় করি? তুমিই ত বল ভরসা, আমাকে উপায় বলে দেও। মুরলা বালিকা, শোভাও বালিকা, ইহারা বৈধব্যাগুনে পুড়িয়া যে ক্ষতবিক্ষত হইল? আমরা আনন্দে উন্মত্ত, আর ইহারা ভাল খেতে, ভাল পরতে পাওয়া দূরে থাকুক, দুটো ভাল কথাও শুন্‌তে পায় না! ইহা কি সহ্য করা যায়! দুইজনই রূপের ডালি, যৌবনে ষোলকলা-পূর্ণ হইয়াছে, ইহাদের মুখের দিকে আমি ত চাহিতে পারি না? তুমি উপায় কর। তুমি আমার সহায় হও। বল ত নচেৎ আমি দাঁড়াই কোথা?"

অরবিন্দ ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতেন, কিন্তু কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না। এ জগতে চিরকাল অপ্রকাশে থাকিবেন, ইহাই অভিপ্রায় ছিল। স্বীয় নামে পরিচিত হইতে কখনও বাসনা ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্ম-সমাজের গণ্য লোকেরা কেহই অরবিন্দকে জানিত না। অরবিন্দ এই সময়ে তেজের খনি, প্রতিভার আকর। যে দেখিত, সেই মুগ্ধ হইত। খুব প্রাচীন হইতে খুব ছোট ছেলেও অরবিন্দের অমায়িক ব্যবহারে বিমুগ্ধ। অরবিন্দের শত্রু নাই। অরবিন্দের ভালবাসার অভাব নাই। কিন্তু তবুও মনে শান্তি নাই। সমস্ত দিন খাটিয়াও কর্ত্তব্য শেষ হয় না, প্রাণের ক্ষোভ মিটে না। কি দারুণ কর্ত্তব্যের টান!

কয়েকমাস এইরূপ চিন্তায় অতিবাহিত হইল। পত্র লেখা ভিন্ন, শোভা, অশোকা ও মুরলার জন্য আর কিছুই করিতে পারিতেন না। কিন্তু এ পত্র লেখাতেও বাধা উপস্থিত হইল। অরবিন্দ ব্রাহ্ম-সমাজে যান, এ কথা চক্রধরপুর রাষ্ট্র হইয়াছে। মুরলা পাছে হিন্দু-সমাজের মুখে কালী দেয়, এই ভয়ে মুরলাকে বড়ই নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে। শোভা চক্রধরপুরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে স্বামীর বাড়ীতে থাকিতেন। সেখানে তাঁহার প্রতিও দারুণ অত্যাচার হইতেছে। সে সকল কাহিনী বিবৃত করিলে পুস্তক বড় বাড়িয়া যায়। অরবিন্দ অশোকার পত্রে সকলই জানিতে পারিতেন। তাহাতে মনের কষ্ট আরও বৃদ্ধি পাইত। এইরূপ কষ্টে এবং এইরূপ কার্য্যে অরবিন্দ পূর্ণ দুই বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মুরলার বৈধব্য।

যৌবনের উষায় মুরলা বিধবা হইলেন। বাল্যকালে বিবাহ হইলে পতির প্রতি অনুরাগ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই অঙ্কুরিত হয়। মুরলা পতির প্রতি একান্ত অনুরাগিনী ছিলেন, তাঁহার তিরোধানে মনে যে দারুণ আঘাত পাইলেন, বলা বাহুল্য। কিন্তু যৌবন এখনও সম্মুখে, বিচ্ছেদের আগুন এখনও তেমন প্রজ্জ্বলিত হয় নাই।

মুরলা বিষয় পাইবে, মুরলার পিতা এই চিন্তায় বিভোর, জামাই মরিয়াছেন, সে জন্য মুরলার পিতার কষ্ট নাই। মুরলার পিতা তনয়াকে বাড়ীতে আনিলেন, কতক বুঝাইলেন, তারপর মোকদ্দমায় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মোকদ্দমায় অবশ্য ডিক্রি পাইলেন। মোকদ্দমার খরচাবাবতে যাহা আদায় হইল, তিনি নিজে গ্রহণ করিলেন। তারপরও যাহা যখন আদায় হইত, নিজেই গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

মুরলা পিত্রালয়ে আসিয়া পূর্ব্বে যেরূপ আদর পাইতেন, এবার তাহা পাইলেন না। মুরলার মাতার মৃত্যুর পর পিতা আর দুই বার বিবাহ করিয়াছেন। এবার আবার, স্ত্রীবিয়োগ হওয়ায়, অল্পদিন হইল বিবাহ করিয়াছেন। পিতার বয়স এখন কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ হইবে। প্রথম পক্ষের ভাই ভগ্নী ভিন্ন, দ্বিতীয়, তৃতীয় পক্ষের ভাই ভগ্নী যথেষ্ট আছে। চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী মুরলার সমবয়স্কা। বিমাতা, মুরলাকে ভালচক্ষে দেখিতে পারিতেন না।

যেমন সচরাচর সর্ব্বত্র দেখা যায়, পিতা বৃদ্ধ বয়সের ভার্য্যার মন যোগাইয়া চলিতে ভালবাসিতেন। মুরলাকে আনয়ন করার অর্থ স্বার্থসাধন, তাহা হইয়াছে। এখন আর সম্বন্ধ কি, তিনিও মুরলার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। মুরলা ভাই ভগ্নী, বিমাতা, পিতা, ঠানদিদি, জেঠামহাশয়, জেঠিমাতা সকলের মন যোগাইয়া চলিতেন। কিন্তু বিমাতা সদাই বলিতেন, "মেয়ে আমাকে দেখ্‌তে পারে না, আমি গলায় দড়ি দিয়া মরব্, নয় পিত্রালয়ে চলে যাব।"

এইরূপ বিপুসংগমরূপ সোণার আদর্শের ভিতরে মুরলার বৈধব্য বা

ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ হইল। সান্ত্বনা, একমাত্র দিদি অশোকা। অশোকা দুঃখের সময় মুরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দেন, ধর্ম্মোপদেশ দেন, সংসারটা কিছুই নয়, ইত্যাদি কত প্রকার বুঝাইয়া মুরলাকে সুস্থ করেন। ক্রমে পিত্রালয় সম্ভোগ যত অধিক দিন হইতে লাগিল, বিরক্তি নির্য্যাতন ততই বাড়িতে লাগিল। মুরলা আর সহ্য করিতে পারেন না। তিনি নৌকা ভাড়া করিয়া আরামপুর গমন করিলেন। জানিতেন না, আরামপুরে তাঁহার আর আপনার কেহ নাই। স্বামী গিয়াছেন, সেই সঙ্গে সব পর হইয়াছে। যাঁহারা ছিলেন, পিতার উত্তেজনায় তাঁহারা শত্রু। আরামপুরে দুই চারি জন স্বামীর বন্ধু ছিল, তাহারা এখন বিকৃত নয়নে মুরলাকে দেখিল। স্বামীর দাদাকে অনুনয় বিনয় করিয়া লোক দ্বারা বলাইলেন—"আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, পিতার উত্তেজনায় ও লোকের কুপরামর্শে যাহা হইয়াছে, সে জন্য আমাকে আর কষ্ট দিবেন না, বিষয় সম্পত্তি আপনার হাতেই থাকুক, আমাকে একটু স্থান দিন্; আমি আর চক্রধরপুর যাইব না। আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই প্রতিপালন করিব।"

মুরলার ভাসুর ঠাকুর নিদারুণ ভাষায় উত্তর করিলেন, "আরামপুরে স্থান হইবে না। যেখানে হয়, তিনি গমন করুন।"

এইরূপ কথায় অপমানিতা হইয়াও মুরলা কিছুদিন আরামপুর রহিলেন। কিন্তু সাধের ভাসুর ঠাকুর নানা রূপ চক্রান্ত আরম্ভ করিলেন। মুরলার ধর্ম্মনাশ করিবারও আয়োজন হইল। শেষে এমন সকল ঘটনা হইল যে, মুরলা আর আরামপুর থাকিতে পারিলেন না; আরামপুরেও ব্রহ্মচর্য্য সাধনের আশ্রয় পাইলেন না। তিনি আবার পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। বিমাতার ক্রোধ এবার আরো বৃদ্ধি পাইল। এবার হইতে পিতার গৃহে আর মুরলার স্থান হইল না। দিদি অশোকা পিতাকে বলিয়া মুরলাকে আপনাদের ঘরে আশ্রয় দিলেন। এরূপ অবস্থায়ও মুরলা শান্তি পাইলেন না। দাদার ঘরে মেয়ে থাকে, মুরলার পিতা ইহা সহ্য করিতে পারেন না। ছেলে মেয়েদিগকে আর মুরলার নিকট যাইতে দেওয়া হয় না। যদি কখনও কোন ভাই কি ভগ্নী মুরলার সহিত একটী কথা বলে, সে জন্য অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। ক্রমে মুরলার পিতা ও জেঠার সহিত ঝগড়া বাধিল। মুরলা, হতভাগিনি, তোর কপালে কি আছে, কে জানে?

অশোকার উত্তেজনায়, মুরলার জন্য, অশোকার পিতা অনেক অর্থ ব্যয়

করিলেন। বিবাদ থামিল না, ক্রমে সামান্য সামান্য কারণে ভাইয়ে ভাইয়ে ফৌজদারী মোকদ্দমা পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল।

মুরলার কাণে এই সময়ে অশোকা শিক্ষার মন্ত্র দিলেন। আর কিছুতেই যখন শান্তি পাইলেন না, তখন মুরলা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। অশোকার নিকট অনেক পুস্তক ছিল, মুরলা দেখিতে দেখিতে অনেক পড়িয়া ফেলিলেন। মুরলার তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও স্মরণশক্তির পরিচয় পাইয়া অশোকা মুগ্ধ হইলেন। স্বামীর নিকট লিখিয়া লিখিয়া আরো অনেক পুস্তক আনাইলেন। ক্রমে অধ্যয়নের প্রতি মুরলার গভীর অনুরাগ জন্মিল। ইহাতে খুব শান্তিও পাইলেন। আর একটু বাকী ছিল, অশোকা তাহাও মুরলার কাণে দিলেন। অশোকা জানিতেন, মুরলাকে ভাল রাখিতে হইলে শিক্ষা ও ধর্ম্ম ভিন্ন আর উপায় নাই। মুরলার কাণে অশোকা ধর্ম্মমন্ত্র প্রদান করিলেন। মুরলা সমস্ত দিন পুস্তক লইয়া থাকেন এবং সন্ধ্যার সময় দিদির সহিত মিলিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করেন। এইরূপে মুরলার দিন কোন রূপে চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠোৎসব।

দেখিতে দেখিতে দুইবৎসর কাটিয়া গিয়াছে, আবার জ্যৈষ্ঠ মাস উপস্থিত হইয়াছে। শোভা, মুরলা ও অশোকার মনে আনন্দের তরঙ্গ ছুটিতেছে। শোভা এবার দাদা আসিবেন ভাবিয়া আনন্দে বিহ্বলা, অশোকা হৃষ্ট মনে স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছেন, চৌধুরী মহাশয় ভিন্ন মুরলার এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় সান্ত্বনা নাই। তিন জনই সময় গণিতেছে, তিন জনই আনন্দে বিভোর। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে খুলনা রেল হয় নাই। বরিশালে ষ্টিমার যাতায়াত করে না। কলিকাতা হইতে নৌকায় সুন্দরবনের ভিতর দিয়া আসিতে হয়। এই সময়ে কলিকাতার পথে বড়ই দস্যুর ভয় ছিল। নদীর ভয়, ঝড় বৃষ্টির ভয়, তা'ত আছেই। অশোকা আনন্দে দিন গণিতেছেন, কিন্তু সময়ে সময়ে দুশ্চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হইতেছে। আকাশে মেঘ দেখিলে অশোকার মুখ মলিন হয়, মনে ভাবেন,

হায়, বুঝি বা স্বামী সন্দর্শন আর জীবনে নাই। এক রাত্রে খুব ঝড় হইল, তখন স্কুল বন্ধ হইয়াছে, অরবিন্দ তখন কলিকাতার পথে। অশোকা সমস্ত রাত্রির মধ্যে ঘুমাইলেন না। তারপর দিন কিছু খাইলেন না, সমস্ত সময় কাঁদিয়া কাটাইলেন। ভালবাসা, তুই নরপুরে দুশ্চিন্তার ঢেউ তুলিয়া কত অনর্থ ঘটাইয়া থাকিস্, ভাবিলেও শরীর কম্পিত হয়।

অরবিন্দ পথে, এই ঝড়ে বড়ই কষ্ট পাইলেন। সমস্ত রাত্রি জলে দাঁড়াইয়া ভীষণ তরঙ্গাঘাত হইতে নৌকা বাঁচাইতে হইল। অরবিন্দের দুর্জ্জয় সাহস। পরদিন খুলনা ও বঠেকাটার হাটের মধ্যের নদীতে দস্যুর হাতে পড়িলেন। ৪।৫ খান দস্যুর নৌকা সমবেত। অরবিন্দ একখানি তরবারি লইয়া ছইয়ের উপরে বীরবেশে দাঁড়াইয়া, আর একটী মাত্র লোক একখানি লাঠী হাতে করিয়া ছইয়ের সম্মুখে। প্রথমতঃ, কথা কাটাকাটী হইল, পরে দস্যুরা নৌকা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, অরবিন্দ ভীমস্বরে বলিলেন, "যে অগ্রে নৌকায় পা তুলিবে, তার মস্তক দ্বিখণ্ড করিব।" সে স্বর শুনিয়া দস্যুরা একটু পশ্চাৎপদ হইল। আবার ক্ষণকাল পর আক্রমণে উদ্যত হইল। এবার কিছু হাতাহাতি, লাঠালাঠিও হইল, অরবিন্দ বীরের ন্যায় আপন কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, একজনকে এরূপ গুরুতর রূপে আঘাত করিলেন যে, সে হতচেতন হইয়া জলে পড়িল। ইহার পর দস্যুরা নৌকা বাহিয়া গালিগালাজ দিতে দিতে পলায়ন করিল। সমস্ত রাত্রি অরবিন্দের চক্ষে নিদ্রা বসিল না। এইরূপ কষ্ট বহন করিয়া অরবিন্দ কলিকাতার পথে চলিয়াছেন। মনে উৎসাহ নাই, আশার স্ফুলিঙ্গ মাত্রও নাই। শোভার কালিমাময় মলিন মূর্ত্তি আর তিনি দেখিতে পারেন না। আর মুরলার কথা ভাবিলেই চক্ষের জলে অরবিন্দের বক্ষ ভাসিয়া যায়। অসহায় স্কুলের ছাত্রের চক্ষের জল ভিন্ন আর কি সম্বল আছে? হায়, অরবিন্দ যেন চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন! মুরলার সমস্ত বৎসরের সকল কষ্টের কথা অশোকার পত্রে অবগত হইয়াছেন; কত অশ্রুপাত করিয়াছেন, কে জানে? পথে সদা বুক দুরু দুরু করিতেছে, ভাবিতেছেন, "কোথায় যাইতেছি? শোভার হৃদয়ে ভীষণ শ্মশান, মুরলার অন্তরে দারুণ শ্মশান! শ্মশান দেখিতে ছুটিয়াছি? হা বিধাত, এ হতভাগ্যকে কি কেবল শ্মশান দেখাইতে সৃজন করিয়াছ? নেপি আমার ছোট ভাই, প্রাণের পুতলী, তাকেও লইয়াছ যখন, তখন আমাকে রাখিয়াছ

কেন? আমার বল নাই, বুদ্ধি নাই, আমি সহায়হীন, সম্বলহীন। নেপি সহায় থাকিলে, কোন অবস্থাকে ডরাইতাম না, এখন আমি যে অসহায় যুবক? আমাদ্বারা জগতের কি কাজ হইবে? আমার স্থায় হতভাগ্যের দ্বারা কি কোন কাজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে? আমার সহায় কেবল তুমি। আমার চক্ষে নিদ্রা নাই, বুকে সাহস নাই, শরীরে তেজ নাই। হস্তে অর্থবল নাই, বাহিরে বন্ধুবল নাই। একাকী তোমাকে বুকে জড়াইয়া রহিয়াছি। যাহা করিতে হয়, কর, আমি ত আর সহ্য করিতে পারি না।”

অরবিন্দের মনে কোন আশা নাই, আবার ভাবিতেছেন, “মুরলা ও শোভা ডুবিয়াছে ত একেবারে ডুবিয়াছে। হিন্দুসমাজে রাক্ষস পুরুষে দশবার বিপত্নীক হইলে বিবাহ করিবে, আর অসহায়া স্বামীহীনা বালিকারা কেবল ব্রহ্মচর্য্য করিবে!! ব্রহ্মচর্য্য করিতে তাহারা নারাজ নয়, কিন্তু পুরুষের অত্যাচার, প্রলোভন, পাশব ব্যবহারের হাত হইতে তাহারা কিরূপে নিস্তার পাইবে? সহায় কে? রাখে কে? অবলা বিধবা যুবতীর পানে কুটিল চক্ষে তাকায় না, এদেশের অতি অল্প লোক। বিধবাদিগকে ডুবাইতে তাহারা সদা ব্যস্ত। ভ্রূণহত্যার স্রোতে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে। দেশের লোকেরা অবলা বধ করিতে উল্লসিত। হায়, এই হতভাগ্য দেশে মুরলা ও শোভাকে কিরূপে রক্ষা করিব? কোথায় ইহাদিগকে লুকাইব? বড় দাদাকে লিখিলাম, তিনি শোভার জন্য কিছুই করিলেন না। শোভা দারুণ রোগে আক্রান্ত, চিকিৎসার যৎসামান্য ঔষধ মিলে না, আত্মীয়দের মনে ধারণা, শোভা মরিলেই হয়। আমি ত আর শোভার কষ্ট দেখিতে পারি না! যা থাকে কপালে, ঘটিবে, না হয় ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব; আমি এবার শোভার একটা গতি করিব। শোভাকে যদি কলিকাতা লইয়া যাই, দাদারা কি সাহায্য করিবেন না? তাঁহারা আমাকে যারপর নাই ভালবাসেন, কখনও আমার ইচ্ছায় বাধা দেন না। আমি শোভাকে কলিকাতা লইয়া গেলে তাঁহারা সাহয্য করিতে বিমুখ হইবেন কি? বোধ হয়, তাঁহারা সাহায্য করিবেন না। বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের মুখ হেট হইবে, তিন কুলীন সমাজের কুলে কালী পড়িবে, তাঁহারা কখনও আমার সহায় হইবেন না! তাঁহাদের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া কি কিছু করা যায় না? তাহাও অসম্ভব, আমি ব্রাহ্মসমাজের কাহাকেও জানি না।” আবার ভাবেন, “বড় দাদা সমাজকে ভয় করেন না, মেঝ দাদা ব্রাহ্মধর্ম্মকে ভালবাসেন, ইঁহারা যে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন,

বোধ হয় না। আমার প্রতি ইহাদের কত আশা ভরসা। যদি ইহারা আমাকে পরিত্যাগ করেন, বিধাতার চরণে ভক্তির অঞ্জলি দিব। ইহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে আমি সদা সশঙ্কিত, তা ইহারা যদি আমার এই মহৎ কার্য্যের জন্য আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহাতে মহৎ কল্যাণ প্রত্যাশা করি। আমি না হয়, না খাইয়া মরিব; না হয়, ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব, না হয়; বিধাতার নিকট কেবল প্রার্থনা করিয়া মরিব। মরিতে ভয় কেন? জন্মিয়াছি যখন, একদিন মরিবই। দশবৎসর পরে যে মৃত্যু ঘটিবে, আজ যদি তাহা উপস্থিত হয়, ভীত হইব কেন? কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলে মৃত্যুকে ভয় করিব কেন? বিধাতা, তুমি আমায় কর্ত্তব্যের পথে লইয়া চল। তুমি যাহা বুঝাইবে, আমি তাহাই করিব। তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে?”

এইরূপ ভাব লইয়া অরবিন্দ যথাসময়ে চক্রধরপুর পৌঁছিলেন। শোভাকে তাহার শ্বশুর বাড়ী হইতে পূর্ব্বেই অশোকা আনিয়াছিলেন, মুরলা, অশোকা ও শোভার আনন্দের সীমা নাই। মুরলা, অরবিন্দের সহিত পূর্ব্বে ভাল করিয়া কথা বলিতেন না, কেন না, এক সম্বন্ধে তিনি ভাসুর। প্রথম সম্পর্ক অপেক্ষা দ্বিতীয় সম্পর্ক এখন উজ্জ্বল, এই বিশ্বাসে মুরলা এবার অরবিন্দের সহিত কথা বলিলেন। আনন্দের বাজারে আনন্দের লীলা চলিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কঠিন সমস্যা।

শোভা এখন শোভাহীনা। রোগের দুর্জ্জয় আক্রমণে রূপ মলিন হইয়াছে, শরীর জীর্ণ হইয়াছে, কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে। উঠিতে বসিতে কষ্ট হয়, আহারে রুচি নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই। অশেষ কষ্ট মাথার উপরে চাপা কিন্তু শোভার মনে তবুও অশান্তি নাই। শোভা সদা প্রফুল্ল, সদা অন্যমনস্ক। কি যেন এক স্বর্গীয় ভাবে সে সদা মাতোয়ারা।

মুরলার মস্তক রাখিবার স্থান নাই। মুরলা বিষয় থাকিতে অর্থহীনা। মুখের দিকে চাহিতে এ পৃথিবীতে কেহ নাই, পিতা বিমাতার বশ, ভাসুর অর্থের গোলাম। একদিকে যৌবনের উত্তেজনা—একদিকে লোকের প্রলোভন, কিন্তু

তবুও মনে অশান্তি নাই। শোভা ও মুরলা, অশোকার সহবাসে দেবপ্রকৃতি লাভ করিয়াছেন। অরবিন্দ তিনের অপরূপ প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া বিমুগ্ধ হইলেন, ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন।

অরবিন্দ সকলের পবিত্রতা-মাখা কান্তি দেখিয়া সুখী হইলেন বটে, কিন্তু শোভার পীড়ার জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "এখন কি করি? বড় দাদার নিকট কত করিয়া লিখিলাম, তিনি কোন উপায় করিলেন না। আমি অর্থহীন, অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি, আমি শোভাকে লইয়া যাইয়া কি করিব? বড়ই নিরুপায় দেখিতেছি। কলিকাতা শোভাকে লইয়া গেলে দাদারা কি সাহায্য করিবেন না? আমাকে ও শোভাকে তাঁহারা ভাসাইবেন? সর্ব্বোপরি বিধাতা আমাদের কি একটা পথ ধরাইয়া দিবেন না? কি করিব, কিছুই ভাবিয়া পাই না।"

অশোকাকে অরবিন্দ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করি, পরামর্শ দেও।" শোভা ও মুরলা সেখানে বসিয়াছিল। অশোকা বলিলেন, "তুমি শোভাকে লইয়া কলিকাতায় যাও। আমি ও মুরলা থাকি। শোভার পীড়া আরোগ্য হইলে এবং তোমার পড়া শেষ হইলে আমাদের উপায় করিও।"

অশোকার পরামর্শ সৎ, সন্দেহ নাই। কিন্তু অরবিন্দের হাতে একটী পয়সা নাই যে পথ খরচ চালাইবেন। নৌকা ভাড়া দিবেন। কলিকাতা গেলে যদি দাদারা সাহায্য না করেন, তবেই বা কি করিবেন? অর্থ ভিন্ন এক মুহূর্ত্ত যে কলিকাতা সহরের কাজ চলে না, সেই কলিকাতায় শূন্য হস্তে কিরূপে যাইবেন? ক্ষণকাল অরবিন্দ এ সকল কথা ভাবিলেন। তারপর বলিলেন, "অশোকা, আমার হাত যে একেবারে খালি।"

অশোকা বলিলেন, টাকার জন্য পৃথিবীর কোন সৎ কাজ বন্ধ হইয়াছে, শুনিয়াছ কখনও? বিধাতা আছেন, যাহা হয় তিনি করিবেন। এখনকার মত আমার অলঙ্কার বন্ধক দিয়া কয়েকটী টাকা যোগাড় করিয়া দিতেছি। তাহাদ্বারা নৌকা করিয়া শোভাকে লইয়া তুমি যাও। শোভা বাঁচিলে তারপর সব হইবে।

অশোকার কথা শুনিয়া অরবিন্দের দু ফোটা চক্ষের জল পড়িল। মনে মনে ভাবিলেন, দাদারা সহোদরার জন্য যাহা করিলেন না, অশোকা তাহা করিতে প্রস্তুত। অশোকার হৃদয় কি স্বর্গীয় প্রেমে গঠিত। আবার বলি-

লেন,—দেখ অশোকা, শোভাকে কলিকাতা লইয়া গেলে দাদারা যদি সাহায্য না করেন, বাধ্য হইয়া আমাকে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইতে হইবে। সে অবস্থায় তোমাদিগের উপর দারুণ অত্যাচার হওয়ার সম্ভাবনা। তোমরা সে অবস্থায় কি করিবে?

অশোকা। আমার জন্য কিছুই ভাবি না, যাহা হয় হইবে। সে অবস্থায় তোমার কি হইবে এবং মুরলার কি হইবে, কেবল তাহাই ভাবিতেছি।

মুরলা বলিল, ঠাকুরঝি রক্ষা পাইলে সব দিক বজায় থাকিবে। তিনি যদি বাঁচেন, কোন কষ্টই আমাদিগকে ক্লেশ দিতে পারিবে না। তিনি যাহাতে রক্ষা পান, আপনি তাহাই করুন। অন্য কিছু ভাবিয়া এখন প্রয়োজন নাই।

অশোকা অরবিন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মুরলাকেও তুমি লইয়া যাওনা কেন?

অরবিন্দ বলিলেন, তাহা পারি না। প্রথমতঃ শোভা পীড়িতা বলিয়াই তাহাকে নিতে চাহিতেছি, নচেৎ আমার বর্ত্তমান অবস্থায় কাহাকেও নেওয়া উচিত নহে। দ্বিতীয়তঃ মুরলাকে আমি নিলে লোকে বলিবে, মুরলার বিষয়ের লোভে আমি তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতেছি। আমি কাহা-রও কথাকে ভয় করি না, সত্য, কিন্তু যে কাজে মুরলার অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহাতে যোগ দিতে পারি না। মুরলা হিন্দু-বাল-বিধবা, আমার ভ্রাতৃবধূ, আমার একান্ত ইচ্ছা সে ব্রহ্মচর্য্য পালন করুক, এদেশের বিধবা-কুলের আদর্শ হউক। ব্রাহ্মসমাজে যাইলেই হইবে, এবং হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। বিবেকের আদেশানুসারে কর্ত্তব্য পালন করা উচিত, এই মাত্র বুঝি। আত্মীয় বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা নূতন সমাজ গঠনে যত্নবান, তাহাদের সহিত আমার মতের মিল নাই। ভাল মন্দ সর্ব্বত্র—সকলকে আদর করিতে শিক্ষা করিলেই মহত্ত্ব জন্মে। মুরলা হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিবে কেন? যদি করে, সে বড় হইয়া নিজে করিবে, আমাদের এ সম্বন্ধে এখন নিরপেক্ষ থাকা উচিত।

অশোকা। মুরলা কোথায় থাকিবে, বল ত? চক্রধরপুরে তাহার পিতা ঘরে স্থান দেন না, আরামপুরে ভাসুর আশ্রয় দেন না! এমন অবস্থায় মুরলা কোথায় দাঁড়াইবে? মুরলা কোন্ বলের উপর নির্ভর করিবে? জান না কি, সে বালিকা!

অরবিন্দ। সকলের আশ্রয় বিধাতা। তিনি রাখেন, মুরলা বাঁচিবে; নচেৎ কে মুরলাকে রাখিতে পারে? মুরলার ভিতরে বিধাতার ইচ্ছা যখন কার্য্য করিবে, মুরলা তখন নিজে কলিকাতা যাইবে। বালিকাকে ভুলাইয়া আমি ব্রাহ্মসমাজে কখনও নিতে পারিব না!

অরবিন্দ বড় নিষ্ঠুরের মত এ সকল কথা বলিতেছিলেন। অশোকার মনে সে জন্য বড়ই কষ্ট হইতেছিল। মুরলার কিন্তু একটুও কষ্ট হয় নাই। মুরলা বুদ্ধিমতী, অরবিন্দের সকল কথারই তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, দিদি, তুমি কষ্ট পাও কেন? চৌধুরী মহাশয় বড় পাকা কথা বলিয়াছেন। বিধাতার ইচ্ছা হয়, আমি নিজে কলিকাতা যাইব। তুমি কি জাননা, এখনই কত লোকে কত কথা বলে? দেবতার চরিত্রের নিন্দা আমার সহ্য হয় না। আমি চৌধুরী মহাশয়ের পবিত্র স্বভাবে কলঙ্ক লেপন করিবার জন্য কখনও কোন কাজ করিব না। তিনি নিতে চাহিলেও আমি এখন যাইব না। আমার কপালে যা আছে, ঘটিবে, কে তাহা খণ্ডাইবে? ঠাকুরঝিকে লইয়া চৌধুরী মহাশয় যান্।

অশোকার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। শোভা যেমন অরবিন্দের, মুরলা তেমনি অশোকার প্রাণের জিনিস। শোভাকে অশোকা, এবং মুরলাকে অরবিন্দ ভালবাসেন, কিন্তু বোধ হয়, তাহা একটু পরোক্ষ। অশোকার চক্ষের জল ধারাবাহী হইয়া পড়িতে লাগিল।

অরবিন্দ কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না বলিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইলেন। শোভা এতক্ষণ নীরবে বসিয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন, অবশেষে বলিলেন, "আজ থাকুক, কাল পরামর্শ ঠিক হইবে। দাদা কাল ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া যাহা বুঝিবেন, সেইরূপই কাজ হইবে। বৃথা বকাবকিতে কাজ নাই।" এই কথার পর সে দিনকার মত কমিটী ভাঙ্গিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দেব-পূজা।

আজ অশোকা কিছু চাঞ্চল্য দেখাইতেছেন, স্বামী অরবিন্দ শোভাকে লইয়া কলিকাতা যাইবেন, ঠিক হইয়াছে। অশোকা পিতাকে ধরিয়া কিছু

টাকা যোগাড় করিয়াছেন, অলঙ্কারাদি বন্ধক দিয়া আরো কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, স্বামীর সাহায্যের জন্য উপযুক্ত ভার্য্যার যাহা করার প্রয়োজন, তাহা সকলই করিয়াছেন; কিন্তু তদুপরি কিছু চপলতারও আয়োজন করিয়াছেন। শোভা এবং মুরলার বৈধব্যের পর অরবিন্দ কোন বিলাসের দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না, সুখ-স্পৃহাকে কিছু দিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। যাহার ঘরে দুঃখের আগুন জ্বলিতেছে, তাহার সুখ-স্পৃহা সাজেনা, অরবিন্দের ইহাই ধারণা। অরবিন্দ বড় কঠোর আত্ম-সংযত ব্যক্তি। কিন্তু অশোকা যুবতী, তাঁহার মন বুঝিবে কেন? তিনি স্বামীর মুখে একটু হাসি দেখিতে চান, একটু আনন্দ এবং সুখ দেখিতে চান। তাই আজ তিনি বড় সাধ করিয়া একটু সুখের আয়োজন করিয়াছেন। মুরলা এখন আর ভ্রাতৃবধূ নন্। তিনি এখন অরবিন্দের স্ত্রীর ভগ্নী। দিদির কথা পালন করা মুরলার কাজ। মুরলা আজ ভাল ভাল ফুল তুলিয়া আনিয়াছেন, গোলাপ, বেল, যুঁই, বকুল, গন্ধরাজ কত কি ভাল ভাল ফুল তুলিয়া আনিয়াছেন। অশোকাকে মুরলা এবং অন্য কয়েক জন সহচরী বনদেবী করিয়া সাজাইয়াছেন। ফুলের মালা, ফুলের বলয়, ফুলের চিক, ফুলের বাজু, ফুলের পাঁচলহরী, ফুলের কর্ণবলয়, ফুলে ফুলে সকলে মিলিয়া অশোকাকে বনদেবী করিয়া সাজাইয়াছেন। ঘরে ফুলের ঝাড়, ফুলের শয্যা, ফুলের পানদানি,—ফুলময় গৃহ। এ যেন বাসরঘর, এ যেন ফুলশয্যার বাড়ী। অশোকার সুদীর্ঘ সুচিক্কণ কেশ, আজ মুক্ত বায়ুতে ফুলের সুবাসে হেলিতেছে, দুলিতেছে। ফুলময় বনদেবী আজ স্বামীকে একটু হাসাইবেন, এবং সুখে মাতাইবেন, এই সাধ। সে সাধ কি পূর্ণ হইবে?

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, এ সময়ে অরবিন্দ কঠোর সংসার-বিরাগী যোগী। বিবাহ করিয়াছেন, স্ত্রী পরিত্যাগ করা পাপ, এবিশ্বাস না থাকিলে অশোকার জীবনে যে কি হইত, জানিনা। আহার না করিলে মানুষ বাঁচে না, তাই অরবিন্দ আহার করিতেন, কিন্তু সে আহার অতি সামান্য। আহারান্তে পান খাইতেন না। কোন দিন কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। স্ত্রীর সহিত কোন প্রকার বিলাস-সুখ-সম্বন্ধ রাখিতেন না। অরবিন্দ আত্ম-সংগ্রামে জয়ী বীর, চরিত্রের ভিত্তিতে অটল ও অবিচলিত নর-দেবতা। এই নর-দেবতা কি অশোকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন? অশোকার সুখে মুরলার সুখ, মুরলার মনোরথ কি পূর্ণ করিবেন?

স্বামী অথবা দেবতা যখন ঘরে আসিলেন, তখন অশোকাকে দেখিয়া প্রথম চিনিতে পারিলেন না; অপ্রতিভ হইয়া ঘরে ঢুকিয়াই বাহির হইলেন। চতুর্দ্দিকের সহচরীরা সকলে অরবিন্দের এই ভাব দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। অরবিন্দ খুব অপ্রতিভ হইলেন। বুঝিলেন, অশোকা সে ঘরে আছেন। বুঝিলেন, ফুলভূষণে ভূষিতা যুবতীই অশোকা। তাঁহার প্রাণে দারুণ বেদনা উপস্থিত হইল। চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং অশোকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ছি অশোকা, তোমার কি এবেশ সাজে? দুদিন পূর্ব্বে মুরলার জন্য তুমি চক্ষের জল ফেলিয়াছ, আজ সেই জন্মদুঃখিনী মুরলার সম্মুখে তোমার এ সাজ পরিতে একটুও কষ্ট হলো না? তোমার ভগ্নী বাল-বিধবা, তাহার প্রাণে বৈধব্যের আগুন ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছে। তোমার ঠাকুরঝি শোভা মৃত্যুশয্যায়। তোমার স্বামী আজ পথের ভিখারী হইতে চলিয়াছেন, তোমার কি আনন্দ সাজে? আমি এই যে চলিয়াছি, আর যে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, কে জানে? কঠোর কর্ত্তব্য পালনে এ জগতে সকল ব্যক্তিই কি কৃতকার্য্য হয়? তোমার স্বামী কর্ত্তব্য পালনে অক্ষম হইলে জীবন রাখিবে, মনে ভাবিতেছ? তাঁহার দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা জান না? যাঁহার মনে দিবানিশি দেশের অভাবরাশি ঘোরতর কালিমা-মাখা দুশ্চিন্তা আঁকিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাকে তুমি সুখ দিবে, ভাবিয়াছ? জান না যে, আমার সুখ ঐ শ্মশান। যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই ঘরে বাহিরে অভাব দেখিয়া হত-জ্ঞান হইতেছি। গুরুতর কর্ত্তব্য-চিন্তায় আমার মাথা ঘুরিতেছে, কি করিয়া কি করিব, ভাবিয়া ঠিক পাইতেছি না। তুমি কোথায় আমার সহায় হইবে, না আমাকে সুখস্পৃহায় ডুবাইতে চাহিতেছ? আমি যে উন্মত্ত, আমি যে চিরকালের জন্য গিয়াছি, হায়, তুমি তাহা জান না? শোভা ও মুরলার কথা প্রাণে জাগিলে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাই। শোভা ও মুরলার ন্যায় কত জন্মদুঃখিনী এই বঙ্গদেশে আছেন, তাঁহাদের কথা চিন্তা করিলে আমার রক্ত শুকাইয়া যায়। আমার আর কোন সাধ নাই। কেবল কঠোর পরোপকার-ব্রত, কেবল আত্ম-সংযম, কেবল বিলাসিতা-বিসর্জ্জন আমার জীবনের লক্ষ্য। তুমি আমার ভার্য্যা হইলে এখনই এ সকল ভূষণ পরিত্যাগ কর। আমি তোমার এবেশ দেখিতে পারি না।"

অশোকা লজ্জায় অবনত-মস্তক, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে,

মুখে কথা সরিতেছে না। আর আর সহচরী সকলেই অরবিন্দের সে গভীর উপদেশ পূর্ণ কথা শুনিয়া অবাক হইয়াছে; কাহারও মুখে আর কথা সরিতেছে না। মুরলা জানু পাতিয়া করযোড় অরবিন্দকে বলিতে লাগিলেন;—"দেব, আমরা সামান্য বালিকারা না বুঝিয়া এইরূপ করিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনি যে দেবতা, একথা ভুলিয়া আমরা ঘোরতর অন্যায় করিয়াছি। সকল অপরাধ আমার। আমি দিদির মুখে হাসি দেখিলে প্রফুল্ল হই। আমি দিদির সুখে জীবিতা; আমার আর কি বাসনা আছে? দেব, আমার দিদিকে ক্ষমা করুন।" এই বলিয়া একে একে অশোকার অঙ্গের ফুলের মালা, ফুলের বলয় প্রভৃতি খুলিয়া খুলিয়া অরবিন্দের পদে অঞ্জলি দিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, "দেব, আপনার চরণে দিদির সব উৎসর্গ করিয়া দিতেছি। বাসনা, কামনা, সুখ দুঃখ, ভয় ভক্তি, আশা নিরাশা, দিদির ও সকল আজ এই ফুলোপহারের সহিত আপনার চরণে বিসর্জ্জন দিতেছি। আপনি যদি যোগী হন, দিদি আপনার যোগিনী হইবেন; আপনি যদি গৃহী হন, দিদি লক্ষ্মীরূপে বামে বসিবেন। আপনি যদি শ্মশান-বাসী হন, দিদি আমার ভৈরবী হইবেন। আপনি যে পথে, দিদিও সেই পথে।" এই বলিয়া মুরলা একে একে সমস্ত ফুল ছিঁড়িয়া উপহার দিলেন, মুখের চন্দন মুছিয়া ফেলিলেন, পৃষ্ঠদেশ-প্রবাহী কেশরাশি হস্ত দ্বারা প্রসারণ করিয়া অশোকার সমস্ত শরীর ঢাকিলেন। অশোকা দেখিতে দেখিতে অশোক-বনের সীতা সাজিলেন। অশোকা এই অবস্থায়, মুরলার ইচ্ছানুসারে, অরবিন্দের শ্রীচরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করিলেন। তারপর মুরলা প্রণাম করিলেন। তারপর আর আর সকল মেয়েরা একে একে অরবিন্দকে প্রণাম করিল। অরবিন্দ আর কিছুই বলিলেন না, দেব-গৃহে দেব-পূজা শেষ হইল, আনন্দের পরিবর্ত্তে ভক্তির প্রবাহ ছুটিল। সব মধুময় হইল। সব সরস হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কঠোর পরীক্ষায়।

অরবিন্দের মুখে আর হাসি নাই। অশোকার ব্যবহারে সেদিন প্রাণে যে আঘাত লাগিয়াছে, আজও তাহা শেলসম বিদ্ধ হইতেছে। এক দিন,

দু'দিন, তিনদিনে যে দাগ মুছিল না, এ জীবনে তাহা ঘুচিবার আশা কি ?

আজ অরবিন্দ কলিকাতায় রওয়ানা হইবেন। আরো ভাই ভগ্নী আছে, কিন্তু শোভা ও অরবিন্দের যেরূপ ভালবাসা, এরূপ ভালবাসা প্রায় দেখা যায় না। দাদার সঙ্গে শোভা চলিয়াছেন, তাঁর কোন চিন্তা নাই; কিন্তু একটী চিন্তা প্রাণে জাগিতেছে, "দাদা এবারই কি পরিবারের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে-ছেন ? আমার জন্যই কি দাদা সকল হারাইবেন ?" এ চিন্তায় প্রাণে একটু একটু বেদনা দিতেছে, কিন্তু যাহা অপরিহার্য্য, তাহা প্রতিরোধ করিবে, শোভার সাধ্য নাই। যাহা ঘটিবে, ভবিষ্যত তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত জিনিসপত্র নৌকায় উঠান হইল। মুরলা অরবিন্দের মন ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অরবিন্দের মন ফিরে নাই। অরবিন্দ ভাবিতেছেন, পারিবারিক জীবনে তাঁহার সুখ নাই। অশোকা অনেকবার অরবিন্দের ধারে গিয়াছেন, কিন্তু অরবিন্দ ভালভাবে কথা বলিতে পারেন নাই। অশোকাকে দেখিলেই প্রাণটা যেন অস্থির হইয়া উঠে। কতবার অশোকাকে বলিয়াছেন—"অশোকা, এখন কি তোমার সুখের সময় ? তোমার স্বামী ভাসিয়া চলিয়াছে, এখন কি তোমার আনন্দের সময় ?"

যথাসময়ে অরবিন্দ নৌকায় উঠিলেন। অশোকা স্বামীর পা ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেন, অরবিন্দ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে কিছুই বলিতে পারিলেন না, সেই এক কথাই বলিলেন,—"এখন কি তোমার সুখের সময়, চেয়ে দেখ, তোমার স্বামী ভাসিয়া চলিলেন !" মুরলা অরবিন্দকে প্রণাম করিলেন। আর আর সকলে একে একে কেহ বা প্রণাম, কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিলেন। অরবিন্দের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিতে লাগিল। অশোকা ও মুরলার প্রাণ কিরূপ অস্থির হইল, পৃথিবীর কেহই তাহা জানিল না। তাঁহারা অনিমেষ নয়নে, দৃষ্টিপথের অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত, নৌকার দিকে তাকা-ইয়া রহিলেন। চক্ষের জলে অলক্ষিতে বক্ষ ভাসিতে লাগিল।

যথা সময়ে অরবিন্দ কলিকাতায় পৌছিলেন। কলিকাতায় পৌছিয়া মধ্যম দাদার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন এবং এক দিন শোভাকে লইয়া কালীঘাটের গঙ্গায় নৌকায় রহিলেন। অরবিন্দের মধ্যম দাদা শোভার জন্য কোনই

যোগাড় করিলেন না। অরবিন্দ খুব উৎকণ্ঠিত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের কোন লোক অরবিন্দকে জানে না। দাদার শ্বশুর বাড়ীতে ভগ্নীকে লইয়া উঠিতে পারেন না। আর বন্ধু বান্ধব সকলেই স্কুলের ছাত্র, তাহাদের নিকট কোন সাহায্য পাওয়ার আশা নাই। একটী স্কুলের শিক্ষকের সহিত অরবিন্দের কিছু ভালবাসা ছিল, তাঁহাকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। তিনি অরবিন্দের মধ্যম দাদার নিকট গমন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। এদিকে মাঝীরা নৌকা খালাস করিতে বারম্বার বিরক্ত করিতে লাগিল। অবশেষে অরবিন্দ শোভাকে লইয়া কলিকাতায় নিজ বাসায় যাইতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে অরবিন্দ মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। বাসায় দেশীয় কয়েক জন ছাত্র ছিল, তাহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিল। কিন্তু তাহাদের সাহায্যে কুলাইল না। ইতিমধ্যে চতুর্দ্দিকে রব উঠিল যে, অরবিন্দ চৌধুরী তাঁহার বিধবা ভগ্নীকে লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়াছে। ইহাতে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে তুমুল আন্দোলন উপ-স্থিত হইল। বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে এরূপ ঘটনা আর ঘটে নাই, সুতরাং চতুর্দ্দিকে বিষম আন্দোলন চলিতে লাগিল। দেশীয় ছাত্রেরা সে আন্দো-লনে অরবিন্দের বাসা পরিত্যাগ করিল। অরবিন্দ বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মদের আশ্রয় লইলেন। ইহার পর চতুর্দ্দিক হইতে আত্মীয় কুটুম্বেরা কলিকাতায় আসিল, অরবিন্দের বড় দাদা এই সময়ে ময়মনসিংহে চাকুরী করিতেন, তিনি সেখান হইতে আসিলেন। শ্বশুর বাড়ীর লোক সকল আসিল। চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শোভাকে হস্তগত করিবার জন্য একদিকে প্রলোভন, অন্যদিকে নির্য্যাতন, একদিকে তোষামোদ, অন্যদিকে তিরস্কার—যত উপায় ছিল, সকল অবলম্বিত হইল। এ সকল যখন পরাস্ত হইল, তখন কাঁদাকাটীর পালা আরম্ভ হইল। তাহাতেও কিছু যখন হইল না, তখন চেত্‌লার বাসায় একদিন ডাকিয়া অরবিন্দকে অপমানিত করা হইল। ভর্ৎসনা তিরস্কারের আর কিছু বাকী রহিল না। ইহাতেও যখন কিছু হইল না, তখন ব্রাহ্মদের মন ভাঙ্গিবার জন্য শোভার চরিত্র সম্বন্ধে নানা মিথ্যা কুৎসা পর্য্যন্ত রটনা করিল। অরবিন্দের একখানি পুস্তকের অর্দ্ধেক ছাপা হইয়াছিল, সেই অবস্থায় তাহা বন্ধ করা হইল, একটী ছাপাখানা ছিল, তাহা বড় দাদা লইয়া গেলেন। একখানি পত্রিকা ছিল, তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইল। খরচ পত্র সমস্ত বন্ধ হইল। অরবিন্দ বিষম বিপদে পড়িলেন।

অরবিন্দ শোভাকে এই সময়ে বলিলেন—"ভগ্নি, একদিকে কেবল আমি, আর একদিকে তোমার সকল আত্মীয়। দরিদ্র ভ্রাতার মুখ চাহিয়া থাকা তোমার উচিত নহে, তুমি বড় দাদার কাছে যাও।"

শোভার নামে কলঙ্ক রটনা হইয়াছে বলিয়া তিনি লজ্জায় মৃতবৎ হইয়াছেন, আর বড় দাদাকে মুখ দেখাইতে ইচ্ছা নাই, বলিলেন, আমি প্রাণান্তেও যাইব না।

অরবিন্দ বলিলেন, আমি তোমার দরিদ্র ভাই, আমাকে ধরিয়া থাকিলে তোমাকে কত কষ্ট পাইতে হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ, হয় ত তোমাকে অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। দাদার সহিত গেলে তোমার কত সুখ হইবে।

শোভা বলিলেন, আমি মরিবার জন্যই আপনার সঙ্গে আসিয়াছি, মৃত্যুই আমার পক্ষে ভাল।

অরবিন্দ আর কোন কথা বলিলেন না। শোভার চিকিৎসা আরম্ভ হইল। একজন দয়ালু ডাক্তার বিনা ভিজিটে শোভার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন; কিন্তু ঔষধ পথ্য যোগাইতে অরবিন্দকে যে কষ্টে পড়িতে হইল, তাহা আর বর্ণনা করা যায় না। অরবিন্দের খরচ বন্ধ হইয়াছে, সমস্ত জিনিস পত্র দাদারা কাড়িয়া লইয়াছেন। অরবিন্দের সব দিন আহার জুটিত না। একটী ৫৲ টাকার প্রাইব্রেট টুইসনি আরম্ভ করিলেন। যে পুস্তক খানির অর্দ্ধেক ছাপা হইয়াছিল, নানা দিক ভাবিয়া তাহাই প্রকাশ করিয়া দিলেন। অপরিচিত, অনামা লেখক হইলেও পুস্তক খানির প্রতি দেশের লোকেরা কৃপাকটাক্ষপাত করিলেন; কিন্তু অসম্পূর্ণ পুস্তক অধিক বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা কোথায়? দুই দশখানি যাহা বিক্রয় হইত, তদ্দ্বারা শোভার ঔষধ, পথ্য ও ডাক্তারের গাড়ী ভাড়া যোগাইতেন, নিজে অনেক সময় উপবাসে থাকিতেন। ক্ষুধায় যখন শরীর অবসন্ন হইত, তখন রাস্তার কল টিপিয়া পেট ভরিয়া জল খাইতেন এবং আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতেন—"হে ঈশ্বর, দূরের মৃত্যুকে আমার নিকটে আনিবার ইচ্ছা করিয়া থাকিলে তাহা আনায়ন কর, দুঃখ নাই। কেবল এই প্রার্থনা, শোভার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া যেন মরিতে পারি। দয়াময়, আমি মরিলে, তুমি শোভার ভার লইও।" 'কখনও এক পয়সার মুড়ি, কখনও এক পয়সার ছোলা, কখনও বা

বহুবাজারের শ্রীনাথদাসের গলির ঠিক পূর্ব্ব ধারে, বড় রাস্তার উপরে যে একটী হিন্দু হোটেল ছিল, তাহাতে দুই তিন দিন অন্তর যাইয়া পেট ভরিয়া আহার করিতেন। এইরূপ ভাবে ঘোর নির্য্যাতনের অবস্থায় দিন কাটিতে লাগিল। এই সময়ে হিন্দুসমাজের আত্মীয় স্বজনেরা কেহ অরবিন্দের সহিত কথা পর্য্যন্ত বলিত না। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাও অপরিচিত; অরবিন্দ কোথায় দাঁড়াইবেন? দুই চারিটী সদাশয় ব্রাহ্ম একটু দয়া করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, হিন্দু বন্ধুরা শোভার মিথ্যা-কুৎসা ঘোষণা করায় তাঁহারাও বিরক্ত। অরবিন্দকে যে কঠিন পরীক্ষায় পতিত হইতে হইল, তাহা আমরা বর্ণনা করিতে অক্ষম। কেহ সহায় নাই, কেবল বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া দরিদ্র যুবক বুক পাতিয়া দুঃখ দারিদ্র্য সহ্য করিতে লাগিলেন। সকল নির্য্যাতন, তিরস্কার, গঞ্জনা অম্লানচিত্তে বহন করিতে লাগিলেন। অরবিন্দ দিন দিন অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিলেন; কিন্তু বিধাতার কৃপায় শোভা দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন। শোভাকে অরবিন্দ এই সকল নির্য্যাতন ও কষ্টের কথা কিছুই বলিতেন না। দাদা সব দিন খায় না—শোভা ইহাও জানেন না। অরবিন্দ, ভগ্নীর জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন।

আর হতভাগিনী মুরলা ও অশোকা? হিন্দুসমাজের লোকেরা অরবিন্দকে যখন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারিল না, তখন অশোকা ও মুরলার প্রতি ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিল। বিশ্বাস এই, ইহাদিগের কষ্টের কথা শুনিলে অরবিন্দের মতি ফিরিবে। অরবিন্দ ও শোভার নামে এত মিথ্যা কুৎসা তাঁহাদের কাণে বর্ণনা করা হইল যে, তাঁহারা সে সকল শুনিয়া অবাক্ হইলেন। তারপর কালী কলম পুস্তক সমস্ত অপহরণ করা হইল। তারপর অশোকা ও মুরলাকে ঘরে আবদ্ধ করা হইল। অবলার প্রতি সে অত্যাচারে দেবতার সিংহাসন পর্য্যন্ত টলিল। মুরলা ও অশোকার চক্ষের জলে ধরা ভাসিতে লাগিল, পাষণ্ডেরা উল্লসিত চিত্তে তাহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইল। হায় হিন্দুসমাজ, নিরপরাধিনী অবলাদের প্রতি এরূপ নির্য্যাতন কি বিধাতার প্রাণে সহিবে? চক্রধরপুরে অশোকা ও মুরলার দিন আর যায় না। হায়! দুই ভগ্নী দিন রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইতেছেন! আর কলিকাতায় অরবিন্দের দিন কিরূপে

যাইতেছে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। নানা কারণে সকল কথা বিস্তৃত ভাবে লিখিতে আমরা অনিচ্ছুক।

নবম পরিচ্ছেদ।

দুইখানি পত্র।

এই সময়ে অরবিন্দের প্রধান সান্ত্বনা ছিল, অশোকা ও মুরলার পত্র। অন্যদিকে অরবিন্দের পত্রের অমূল্য উপদেশ পাঠ করিয়া, অশোকা ও মুরলা জীবন ধারণ করিতেন। কিন্তু ইহাতেও প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। অরবিন্দ আর চক্রধরপুরের পত্র পান না, অশোকা ও মুরলাও আর কলিকাতার পত্র পান না। ভাবিয়া ভাবিয়া তিনজনের জীবনই শেষ দশায় উপস্থিত হইল। বিধাতা আজ কোথায়? হায়, এ দরিদ্র কর্ত্তব্যপরায়ণ দল বুঝি কালের গর্ভে বিলীন হয়!

অরবিন্দের শেষ পত্র মুরলা ও অশোকা দিনরাত্রি পাঠ করেন, আর চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়; সে পত্র খানি এই—

অশোকা,

আমি কি কষ্টে আছি, তাহা পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি। আমার কষ্টে আমি কাতর নহি; তোমার পত্রে তোমার, বিশেষতঃ মুরলার কষ্টের কথা পাঠ করিয়া অবধি আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। আমি কি করিব, কিছুই ঠিক পাইতেছি না। এখনই ইচ্ছা হইতেছে, তোমাদিগকে যাইয়া লইয়া আসি। তারপর—তিন জন এক সঙ্গে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, সেও ভাল। একদিন ত মরিবই, কিন্তু আমার ন্যায় তিল তিল করিয়া কে কবে মরিয়াছে? এক একটা ঘটনা ঘটিতেছে, আর আমার শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। বিধাতার দিকে তাকাইয়া, তবুও ছিলাম। কিন্তু তোমরা অবলা, তোমাদের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার হইতেছে, বাঁচিয়া থাকিয়া তাহা যে আর সহ্য করিতে পারিতেছি না! হায়, মুরলা, তোর ভাগ্যে কি এত কষ্টও ছিল? পৃথিবীতে তোর মুখের দিকে তাকাইতে কেহই নাই। তোর প্রতিভা, তোর শিক্ষানুরাগ, তোর স্বর্গীয় কান্তি, মনে পড়িলে আমি যেন স্বর্গে উঠিয়া যাই, বিধাতার অপরূপ সৃষ্টির

কথা ভাবিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হই, আর এই ধরার নর-রাক্ষসগুলো তোর রক্তপান করিতে উল্লসিত? তোর ধর্ম্মনাশ করিতে ব্যতিব্যস্ত? হায়, এ ধরা জীববাসের উপযোগী হইল কেন? হা সমাজ, তোর বুকে কেন আমাকে ধারণ করিলি? হা বিধাত, আমি কোন্ পাপে তব চরণে অপরাধী যে, আমাকে এত সহ্য করিতে হইতেছে!!

অশোকা, আমার দ্বারা তোমাদের কোন আশা নাই। আমি হতভাগ্য, দুর্ব্বল জীব, এক ভগ্নীর প্রতিই কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলাম না, আর তোমাদের জন্য কি করিব? তোমাদের জন্য কিছু করিতে পারিতে-ছিনা, তবে আর দেশের জন্য কি করিব? আমি নরাধম, আমার দ্বারা কাহারও কোন কাজ হইবে না। আমি কাহারও সেবায় লাগিব না। হায়, সেবায় যখন লাগিলাম না, তখন রহিলাম বা কেন?

তোমার প্রতি অনেক কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, তোমার পা ধরিয়া এই মিনতি করিতেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করিও। আমি দেশের কর্ত্ত-ব্যের ভাণ করিয়া তোমার কোমল প্রাণে যে দারুণ আঘাত দিয়াছি, বুঝি বা আমার সেই পাপে এই দুর্ব্বিসহ মনোকষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। যে আপন স্ত্রীর প্রতি, ভগ্নীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে না, তাহার জীবন ধারণে কাজ কি? তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, নচেৎ আমার জীবন ধারণের আর উপায় নাই। রমণীর অভিশাপে সোণার লঙ্কা ছারখার হইয়া গিয়াছে, বঙ্গভূমি ছারখারে যাইতে বসিয়াছে, সেই সঙ্গে আমিও চলিয়াছি। তোমার পায়ে ধরি, আমাকে ক্ষমা করিবে।

ভালবাসাবাসির কথা আমি কিছুই জানি না। আমি এ জীবনে কাহাকেও ভাল বাসি নাই। খ্রীষ্ট, জগতকে ভালবাসিতেন, জগতের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন; শ্রীচৈতন্য পাপীকে ভালবাসিতেন, তাহাদের জন্য সংসারের সুখবিলাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; ম্যাট্‌সিনি ইটালিকে ভাল বাসিতেন, ম্যাট্‌সিনি ইটালির জন্য প্রাণ দিয়া গিয়াছেন। যে যাকে ভালবাসে, সে যদি তার জন্য প্রাণ দিতে না পারে, তবে আর ভালবাসা কি? সে ত প্রতারণা, সে ত ব্যবসাদারী। আমি তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারিলাম কই? আমি বিধাতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারিলাম কই? মুরলার জন্য সংসার ছাড়িতে পারিলাম কই? শোভার জন্য যদি বা কষ্ট সহিতেছি, কিন্তু তাহাতেও আমার প্রসন্নতা নষ্ট হইতেছে

কেন? আমি অধৈর্য্য হইতেছি কেন? আমার ভালবাসাটা কেবল ভণ্ডামী মাত্র। এই ভণ্ডামীতে ভুলিয়া যদি সুখ পাও, তবে তুমি এবং মুরলা তাহাই করিবে। কিন্তু নিবেদন এই, আমাকে ক্ষমা করিবে। তুমি এই সময়ের মানুষের ব্যবহার লিখিতে লিখিয়াছ কেন? এ জগৎ সম্বন্ধে সর্ব্বদাই নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। দুই চারিজন ধর্ম্মবন্ধু পরামর্শ দিতেছেন, বিষয় বাড়ী, প্রেস প্রভৃতি লইয়া দাদাদের সঙ্গে আমি বিবাদ করি। তাঁহারা জানেন না যে, ভগ্নীর প্রতি আমার যে কর্ত্তব্যের একাংশ পালনের জন্য দাদারা আজ বিরক্ত, সেই কর্ত্তব্যর অপরাংশ তাঁহাদের প্রতি এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। আমি আজ পর্য্যন্ত ভ্রাতৃঋণ পরিশোধ করিবার উপযুক্ত হই নাই। হায়, আমার দাদারা আমার জন্য কি না করেছেন? আমি তাহার প্রতিশোধে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত করিব? এখনকার দিনে সর্ব্বত্রই দেখি, উপকারী বন্ধুর বক্ষে ছুরিকাঘাত না করিলে কাহারও মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। আমি এ নরকের মনুষ্যত্ব চাই না। যাহা পারি নাই, তাহা কখনও পারিব না। আমি অনাহারে মরিলেও দাদাদের সহিত একদিনও বিবাদ করিব না। এ পৃথিবীতে আমার স্থান না থাকে, তোমাদিগকে ছাড়িয়া পিতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইব।

আর যে সকল বন্ধুরা আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই আমার উপকারী। আমি তাঁহাদিগের অনেক উপকার করিয়াছি, —কাহাকে না খাইয়া খাওয়াইয়াছি, কাহাকে না পরিয়া পরাইয়াছি, তাঁহারা সময় পাইয়া আজ আমার পরম উপকার করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে তাঁহারা মহা আন্দোলন না তুলিলে আমার শক্তির পরীক্ষা হইত না। বলিতে কি, তাহা হইলে আমার শক্তি জাগ্রত হইত না। আমি পিতার কর্ত্তব্য পালনের জন্য মরিতে পারি কি না, চতুর্দ্দিকে তাহারই পরীক্ষা হইতেছে। এ পরীক্ষার আয়োজন যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে, অশোকা, তোমার স্বামীর পরম উপকারী বন্ধু বলিয়া জানিও। মূল কথা কাহাকেও ঘৃণা করিও না, কাহাকেও তুচ্ছ করিও না। বিরক্তি ও ঘৃণাকে সংসার-শ্মশানে ভস্ম করিয়া জগতের জন্য খাটিতে শিক্ষা কর। আমার আশা পরিত্যাগ কর।

মুরলা ও অমৃত তোমার উপর নির্ভর করিয়া আছে। গুরুতর দায়িত্ব। ইহাদের পবিত্রতার জন্য তুমিই দায়ী। এই ঘোর দুর্দ্দিনে, সর্ব্বদা, আর

সকল বিস্মৃত হইয়া ইহাদিগের সেবা করিবে। যে কাঙ্গাল দরিদ্রের সেবায় জীবন ঢালিতে পারে, দেবতা তাহার উপর সন্তুষ্ট হন। যে পাপীকে আলিঙ্গন করিতে পারে, স্বর্গ তাহার নিকটস্থ হয়। এই কথা মনে রাখিয়া সেবা-ব্রত লইবে। কষ্ট ও দুঃখকে কষ্ট ও দুঃখ বলিয়া মনে করিবে না। দুঃখ কষ্টে যে আত্ম সমর্পণ করে, দুঃখ কষ্ট তাহারই মস্তকে চাপিয়া বসে। কখনও আত্মহারা হইবে না। একদিন জন্মিয়াছি, একদিন মরিব, তাতে দুঃখ কি? যাহারা সুখে থাকে, তাহারাও ত মরে, আমরা যদি দুঃখে থাকিয়াও মরিতে পারি, ফলত একই। ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা সকলেরই পরিণাম ঐ শ্মশানের ছাই। পরসেবা, পরোপকার ব্রত কেবল জীবন্ত। সর্ব্বদা পরের চিন্তায় আত্মহারা হইবে, তাহা হইলে আর কোন কষ্টই তোমাদিগকে ক্লেশ দিতে পারিবে না।

বিধাতা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তোমরা তাঁহার প্রিয়পাত্রা হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হও। তোমার পদাশ্রিত—

অরবিন্দ

এই শেষ পত্রের উত্তর মুরলা অরবিন্দের নিকট এইরূপ লিখিয়াছিলেন। অশোকা পত্রের উত্তর দিতে পারেন নাই। পত্রের কথা স্মরণ হইলে ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, লিখিবার শক্তি থাকিত না।

—দেব,

আপনি দিদির নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমরা পাইয়াছি। কয়েকদিন অপেক্ষা করা গেল, দিদি কিছুতেই এ পত্রের উত্তর দিতে পারিলেন না। আমি তাঁহার ও আমার মনের কথা লিখিলাম। আর এখানে থাকিয়া আপনার নিকট পত্র লিখিতে পারিব না—আপনার পত্র পাইবও না। কোন একজন বিদেশী বন্ধুর সাহায্যে অতি কষ্টে এই পত্র-খানি পাঠাইলাম। আর সুযোগ পাইব বলিয়া আশা নাই।

আপনার পত্র-খানি অনেকবার পড়িয়াছি। যতবার পড়িয়াছি, প্রতিবারই যেন নূতন হইয়াছে। ইংরাজি বাঙ্গলা অনেক পুস্তক পড়িয়াছি, কিন্তু এরূপ উপদেশ আর কুত্রাপি পাঠ করি নাই। আমি সামান্যা স্ত্রীলোক, আপনার প্রশংসা করিলে আপনার গৌরব কিছুই বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বলিতে কি, আমি এ পত্রে নবজীবন পাইয়াছি। আমি এ পত্রের প্রতিছত্রের স্বর্গীয় ভাবে মজিয়াছি। আমি আপনার পদধূলি মস্তকে লইয়ে

আজ কৃতার্থ হই। আপনি মানুষ নহেন, আপনি দেবতা, আমার দুঃখ এই, আমি দেবতার সেবা করিতে পারিলাম না। আমার দিদি আজ আপনার চরণ-প্রান্তে যদি বসিতে পারিতেন, বুঝিবা বৈকুণ্ঠ আজ ধরায় অবতীর্ণ হইত। আপনাকে পাইলে, বুঝি বা আমরা আজ হাসিতে হাসিতে মরিতে পারি। আমাদের আত্মীয় বান্ধবেরা আপনাকে চিনিল না, এই দুঃখ। না চিনুক, তাতেই বা আপনার কি? সংসারের কত লোক ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে, তুচ্ছ করে, তাহাতে ঈশ্বরের কি আসিয়া যায়? আপনি সংসারের অতীত। আপনাকে বুঝিতে সংসারের লোকের বহুদিন লাগিবে। আপনার চিতাভস্মে যখন এদেশের নরনারীর সর্ব্বাঙ্গ অনুরঞ্জিত হইবে, তখন মানুষেরা আপনাকে চিনিবে। আমি দেখিতেছি, সে দিন নিকটে আসিতেছে। আপনি মর্ত্ত্যলোকে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আপনাকে মুরলা আজ একান্ত ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছে, অনুপযুক্ত না হইলে তাহা গ্রহণ করুন।

আমাদের আর দুঃখ কষ্ট নাই। সত্যই বলিতেছি, সকল অত্যাচার হাসিতে হাসিতে ভুলিতে পারিতেছি। আপনার ভালবাসা যখন পাইয়াছি, তখন আর কিসের কষ্ট? আপনার পবিত্র চরিত্রের আভাস যখন পাইয়াছি, তখন আর কিসের দুঃখ? দুঃখ কষ্ট আজ ভুলিয়াছি। আজ আপনাকে কাছে পাইলে, আপনার ঐ পবিত্র মূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া মরণকে আলিঙ্গন করিতেও ভীতা হইতাম না। আপনা ধনে আমরা যখন ধনী হইয়াছি, তখন আমাদের আর কিসের অভাব? যা কিছু অত্যাচার, যা কিছু কষ্ট—সব যেন আজ তুচ্ছ, নগণ্য হইয়া গিয়াছে। আরো দুঃখকে আজ আহ্বান করিতেছি। আপনার আদর্শে আজ সব সহ্য করিতে পারি।

সেবায় যে লাগে, তার বৈকুণ্ঠ সন্নিকট। এ কথা সত্য। আমার ইচ্ছা হইতেছে, আজই পর-সেবায় জীবন ঢালিয়া দেই। আমি সামান্যা রমণী, আমার সেবায় জগতের কি হইবে, এ চিন্তা আর আমার মনে নাই। বিধাতা যখন পাঠায়েছেন, কিছু না কিছু আমার করিবার আছেই। সেই টুকু করিতে পারিলেই কৃতার্থ হই। আমরা আজ ক্ষুদ্র ও নগণ্য হইয়াও মহৎ হইয়াছি। আপনার উচ্চ হৃদয়ের আদর্শে আজ ক্ষুদ্রত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে। দেব, দূরে আছি বটে, কিন্তু জগৎ-পূজায়, জগৎ-সেবায়

মুরলা আজ আপনার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। আপনার আদর্শে এ জীবনকে ভাসাইয়াছি।

বিধাতা আপনাকে আরো শক্তি দিন্, আরো স্বদেশানুরাগ দিন্, আরো দয়া ও সহৃদয়তা দিন্। আপনার আদর্শে অচিরে এ দেশ পতনের পূতি-গন্ধময় নরক হইতে উঠিবে বলিয়া আশা হইতেছে। জয় বিশ্বপতির জয়। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আপনার সেবিকা—মুরলা।

কলিকাতায় বসিয়া মুরলার এই পত্র পাইয়া অরবিন্দ যেন নব বলে বলীয়ান্ হইলেন। "মুরলা, মুরলা," বলিয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করি-লেন। "মুরলা, তুই কি শাপভ্রষ্টা দেববালা, তুই কি স্বর্গের অমিয়া-ধারা" এই বলিয়া অরবিন্দ পাগলের মত কত কি বলিলেন। মুরলার পত্রখানি অনেকবার পড়িলেন, অনেকবার চুম্বন্ করিলেন। মনে ভাবিলেন, মুরলার ন্যায় দশটী হৃদয় পাইলে আমি দেশের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে পারি। মুরলার পত্রে অরবিন্দকে সিংহের বলে মাতাইয়া তুলিল। কলিকাতার শক্তি চক্রধরপুরে এবং চক্রধরপুরের শক্তি কলিকাতা পৌঁছিয়া তিন জনকে নব শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিল। এ এমন এক মহাশক্তি, যাহার নিকট মানুষের সকল নির্য্যাতন ও তিরস্কার ফুৎকার-প্রক্ষিপ্ত বালুকণার ন্যায় উড়িয়া যায়। দেবশক্তি, তুই এই তিন জন অসহায় দরিদ্রকে ধরিয়াছিস্ ত তিন জনকেই মাতাইয়া তোল্। তোর অসাধ্য এ জগতে আর কি আছে?

দশম পরিচ্ছেদ।

"চিরদিন কখনও সমান না যায়।"

দিনে দিনে অরবিন্দের মহত্বের ছায়ায় কলিকাতার শত্রু মিত্র সকলের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে সকল আন্দোলন থামিল। স্বর্গীয় শক্তির জয় হইল, অরবিন্দ জয়ী বীর বলিয়া অভিহিত হইলেন। দুঃখ কষ্ট অরবিন্দের নিকট পরাজিত হইয়া ম্লান মুখে অন্তর্হিত হইল।

অরবিন্দ যে পুস্তকের পূর্ব্বভাগ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তত বিক্রয় হইত না, কিন্তু অল্পদিন পর যখন কোন বন্ধুর সাহায্যে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল, তখন এ পুস্তকের সর্ব্বত্র আদর পড়িয়া গেল। লক্ষ্মী, হাসি

মুখে অরবিন্দের পানে তাকাইলেন। অভাব ভয়ে ভয়ে বিদায় লইল। অর্থ চতুর্দ্দিক হইতে ছুটিয়া ছুটিয়া অরবিন্দের নিকট আসিতে লাগিল। যখন অরবিন্দ বহুবাজারের হোটেলে দুই তিন দিনের ক্ষুধা একদিনে দূর করিতেন, তখন সেই হোটেলের একটি ক্ষুদ্র গৃহ দেখিয়া মনে মনে ঈশ্বরের নিকট বলিতেন, "আমি যদি এইরূপ একটী ঘর পাই, তবে সেখানে আমার পুস্তক কয়েকখানি রাখি এবং সংসারের পরিত্যজ্য ও অনাশ্রিত নরনারীকে সেই খানে রাখিয়া তাহাদের সেবা করিয়া কৃতার্থ হই।" এইরূপ আরো কত ছোট ছোট প্রার্থনা আকাশে প্রেরিত হইত। বিধাতার নিকট প্রার্থনা কি কখনও বিফল হয়? অরবিন্দের প্রার্থনা স্বর্গ হইতে কত কি অবতরণ করাইল, তাহা দেখিয়া পৃথিবীর লোক কেহ অবাক্ হইল, কেহ হিংসায় উদ্দীপ্ত হইল, কেহবা পরমানন্দ লাভ করিল। অরবিন্দের আত্মীয়সকল, অল্প কালের মধ্যে সুদিনের অভ্যুদয় দেখিয়া লজ্জায় অবনত হইলেন।

শোভার কলিকাতা আগমনের পর হইতে অরবিন্দ আর কোন আত্মীয়ের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগের নিকট শোভার জন্য কিছু সাহায্য লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা অতি অল্প সময়ের জন্য। অরবিন্দ এক মাত্র প্রার্থনাকে সম্বল করিলেন। প্রার্থনা বলে যাহা চাহিতেন, তাহাই পাইতেন। এ যে কি এক স্বর্গীয় শাস্ত্র, অবিশ্বাসীদিগকে বুঝান কঠিন। অরবিন্দের প্রার্থনা বলে আজ সত্যই কল্পতরু গৃহে শোভিত। দুই বৎসরের মধ্যে অরবিন্দ তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তিন খানিই প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইয়াছে। টাকার অভাব এখন আর নাই। অরবিন্দের পূর্ব্ব ব্যবহারে বরং দোষ পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন প্রকৃতি দিন দিন মধুময় হইয়া উঠিতেছে। যে সকল আত্মীয়েরা কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি এত সদয় হইয়াছেন যে, কাহারও অভাব জানিলেই তাহা দূর করেন। যে টাকা পাইতে লাগিলেন, তদ্দ্বারা গরীব দুঃখী বন্ধুদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। অরবিন্দ বাল্যকাল হইতে চাকুরীর প্রতি বিরক্ত ছিলেন। শিক্ষিত লোকেরা চাকুরী চাকুরী করিয়া অস্থির, ইহা ভাবিয়া অনেক সময় অশ্রু ফেলিতেন। যখন অর্থ পাইতে লাগিলেন, যাহারা অর্থাভাবে কোন ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিত না, এমন অনেক পরিচিত ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য দ্বারা দোকান করিয়া দিলেন। অনেক দরিদ্র বন্ধু অর্থাভাবে শিক্ষা লাভ করিতে পারিত না, তাহাদিগকে

প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া উপযুক্ত রূপ শিক্ষার বন্দোবস্থ করিয়া দিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অরবিন্দের প্রতি হিন্দুসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগের কেমন একটা ভালবাসা জন্মিল। সকলেই মুগ্ধ হইল। অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় ও মস্তিষ্ক পরিচালনা করায়, এই সময়ে, অরবিন্দ দারুণ মস্তিষ্ক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। এদিকে খুব দুরবস্থার সময় অশোকা যে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, নানা কষ্টে ও দারুণ পীড়ায় সে মৃত্যু শয্যায়। এখন মুরলা ও অশোকার পত্রাদি লেখায় কোন বাধা ছিল না। অরবিন্দ এই সময়ে অশোকার এই পত্রখানি পাইলেন।

"তুমি ত আর আসিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, কিন্তু একবার এই শিশুটীকে দেখিয়া গেলে কি হইত না? তোমাকে কোন অনুরোধ করিতে সাধ নাই। কিন্তু যেরূপ দেখিতেছি, এ শিশু যদি পিতৃদর্শনে বঞ্চিত থাকিয়াই চলিয়া যায়, আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না। আমার বড় ইচ্ছা হয়, তুমি একবার আসিয়া ইহাকে দেখিয়া যাও" তোমার দাসী—অশোকা।

শোভা এ পত্রের কথা শুনিয়া অবধি অরবিন্দকে তাড়না করিতেছেন। অরবিন্দ মস্তিষ্কের বেদনায় অস্থির, অশোকার পত্রের কথায় সেই বেদনা আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। নৌকায় বেড়াইলে মস্তিষ্ক রোগ আরোগ্য হইবে, ভাবিয়া, অশোকার অনুরোধে, তিনি চক্রধরপুর যাত্রা করিবেন, স্থির করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই মস্তিষ্ক পীড়ার জন্য অরবিন্দ কলেজ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অশোকাও চলিলেন।

মুরলা ও অশোকার প্রতি অত্যাচার পূর্ব্বাপেক্ষা একটু কমিয়াছে, কিন্তু অরবিন্দের প্রতি চক্রধরপুরের লোকের বিজাতীয় বিতৃষ্ণা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। অরবিন্দ চক্রধরপুর আসিবেন, এই কথা যখন প্রচারিত হইল, তখন শত্রুপক্ষীয় লোকেরা মাতিয়া উঠিল, কেহ বলিতে লাগিল যে, অরবিন্দের নৌকা ডুবাইব; কেহ বলিল, অরবিন্দকে হত্যা করিব; কেহ বলিল, অশোকার পিতা যদি আমাদের সহিত যোগ না দেন, তবে তাঁহাকে একঘরে

করিব। যে আন্দোলন একটু থামিয়াছিল, তাহা আবার জাঁকিয়া উঠিল। অশোকা বুঝিলেন, অরবিন্দকে আসিতে লিখিয়া ভাল করি নাই। আরো বুঝিলেন, তাঁহার আসার কথা চক্রধরপুর ব্যক্ত করিয়া আরো অন্যায় করিয়াছি। অশোকা ব্যস্ত হইয়া পুনঃ এই পত্রখানি কলিকাতা পাঠাইলেন,—

"তুমি আসিবে, এ সংবাদ পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়াছি। কিন্তু এ কথা প্রচার হওয়ায় আবার ভয়ানক আন্দোলন উঠিয়াছে। বাবাকে একঘরে করিবার আয়োজন হইতেছে। তোমাকে প্রহার করিবে, তোমার নৌকা ডুবাইয়া দিবে, কেহ কেহ এরূপও বলিতেছে। এদেশের, এই বরিশালের লোকেরা না পারে, এমন কাজ নাই। সে জন্য আমার বড় ভয় হইতেছে। তুমি না আসিলেই ভাল হয়। কি জানি, তোমার কোন অমঙ্গল হইলে আর আমাদের উপায় নাই। ছেলের জীবনের আশা নাই। তুমি তাহাকে দেখিলে না, একথা ভুলিতে পারিতেছি না, কিন্তু আমার মন নানাপ্রকার দুর্ভাবনায় অস্থির। তুমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে। তিনি যাহা করিতে বলেন, তাহাই করিবে। আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরের আদেশ পালন করিয়া চলিলে কোন বিপদ ঘটিবে না। মুরলা ও অমৃত ভাল আছে। তাহারা, তুমি আসিবে শুনিয়া, আনন্দে নৃত্য করিতেছে। তোমার দাসী—অশোকা।"

এ পত্র পাওয়ার পূর্ব্বেই অরবিন্দ বিধাতার আদেশে বুঝিয়াছিলেন যে, এই সময়ে একবার চক্রধরপুর যাওয়া একান্ত উচিত। এ পত্রে সুতরাং তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হইল না। তিনি মানুষের কথায় কখনও ভয় পাইতেন না। চক্রধরপুরে যাইলে তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হইবে, প্রহার খাইতে ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে, অনেক লোকের মুখে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে এক বিন্দুও তিনি ভয় পান নাই। মানুষের ভয় করিয়া ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক চলিবে? তবে আর বাঁচিয়া থাকিয়া প্রয়োজন কি? অরবিন্দের এইরূপ বিশ্বাস। তিনি ভয় পাইবার লোক নহেন, ভয় পাইলেন না। তিনি এই পত্র খানি চক্রধরপুর পাঠাইয়া নৌকায় উঠিলেন।

"অশোকা, তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি কোন অবস্থাকে ডরাই না। যাহা ঘটিবার, ঘটুক। বিধাতার ইচ্ছায় আমি তোমাদিগকে দেখিতে অদ্যই রওয়ানা হইব। সাক্ষাতে সমস্ত বলিব। তোমারই অরবিন্দ।"

যথা সময়ে এ পত্র চক্রধরপুর পৌছিল। যথা সময়ে অরবিন্দও চক্রধরপুর পৌছিলেন। প্রথমতঃ অরবিন্দ বাজারের ঘাটে নৌকা রাখিয়া শ্বশুর

বাড়ী সংবাদ পাঠাইলেন। শ্বশুর বাড়ীর লোক আসিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে উঠিতে নিষেধ করিল। শেষে অনেক কথাবার্ত্তার পর, রাত্রিতে উঠিতে বলিল। অগত্যা অরবিন্দ তাহাতেই সম্মত হইলেন। অরবিন্দের সঙ্গে আরও দুই একজন বন্ধু ছিল।

রাত্রে অশোকার সহিত অরবিন্দের সাক্ষাৎ হইল। অশোকার নিকট সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। মুরলার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবার কোন উপায় নাই, বুঝিলেন। আরো বুঝিলেন, অশোকাকে কলিকাতায় না লইয়া গেলে পুত্রটীর বাঁচিবার উপায় নাই। অধিক ক্ষণ দেখা হইবে না। অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত অবস্থা শুনিয়া অরবিন্দ অশোকার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, আজই চল, কলিকাতা রওয়ানা হই।

অশোকা সম্মতা হইলেন না। প্রথমতঃ মুরলাকে রাখিয়া অশোকার যাইতে ইচ্ছা নাই। দ্বিতীয়তঃ পিতা মাতাকে না বলিয়া যাইতে অশোকার প্রাণে লাগে। অশোকা বলিলেন, আমি যাইব, কিন্তু আজ নহে, কাল প্রাতে সকলকে বলিয়া বিদায় লইয়া যাইব; গোপনে যাইব কেন?

অরবিন্দ অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, তাহা হইলে তোমার যাওয়া হইবে না। প্রকাশ্যে ইঁহারা কখনও তোমাকে যাইতে দিতে পারেন না, সমাজে তাহা হইলে বিষম গোল উপস্থিত হইবে।

অশোকা। আমি কোন অন্যায় কাজ করিতেছি না, স্বামীর সহিত যাইব, ইহাতে বাধা দিবে কেন?

বাধা দিবে কেন, তাহাও ভাল করিয়া অরবিন্দ বুঝাইলেন। কিন্তু অশোকা সে রাত্রে কিছুতেই যাইতে সম্মতা হইলেন না। পরদিন পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া অরবিন্দকে অপেক্ষা করিতে হইল।

পরদিন প্রাতে অশোকা পিতা মাতাকে বলিলেন যে, আমি কলিকাতা যাইব, এখানে আর থাকিব না। অরবিন্দ যেমন বলিয়াছিলেন, এ কথায় তাঁহারা খুব বিরক্ত হইলেন। অশোকাকে পিতা মাতার অনেক ভর্ৎসনা সহিতে হইল। তাঁহারা বলিলেন, এইজন্য কি তোকে এত করে মানুষ করেছিলাম? যেতে হয়, এখন আমাদিগকে খুন করে তার পর যা।

অশোকা অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কোন ফল ফলিল না। শেষে বল পূর্ব্বক যাইতে চাহিলেন। যাইবার সময় অশোকাকে অনেকে

বাধা দিল। অশোকার যাওয়া হইল না। অরবিন্দের প্রতি নানারূপ অত্যাচার হইল। সমস্ত দিন অনাহারে থাকিতে হইল। অরবিন্দ অপমানিত হইয়া অপরাহ্নে নৌকায় উঠিলেন। অশোকার জন্যই এত কষ্ট সহ্য করিতে হইল ভাবিয়া বড় মনোকষ্ট পাইলেন। নৌকা খুলিবার সময় অশোকা চিৎকার করিয়া বলিলেন, "যেরূপে পার, আমাকে লইয়া যাইবে, না হইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব।"

এ অনুরোধ রক্ষা করা অরবিন্দের পক্ষে বড়ই কঠিন হইল। বুঝিলেন, ইহার পর চিঠিখানা পর্য্যন্ত অশোকার হস্তে পৌঁছিবার উপায় নাই। মুরলা ত একেবারে ঘরে আবদ্ধা। একমাস পর্য্যন্ত অরবিন্দ নৌকায় ২ ফিরিলেন। কখনও বরিশাল, কখনও স্বরূপকাঠী, কখনও কাঁচাবালিয়া ইত্যাদি স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক চেষ্টা করিলেন, কিছুতে কিছু করিতে পারিলেন না। অরবিন্দ উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। অশোকাই যত সর্ব্বনাশের মূল, ইহা ভাবিয়া ভাবিয়াই তিনি অধীর হইলেন। অশোকার প্রতি ক্রমে অত্যাচার ভয়ানক রূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কোন ছদ্মবেশধারী লোক পাঠাইয়া অবশেষে অশোকার পলায়নের পথ সুস্থির করিলেন। যে দিন আসিবার কথা ছিল, কোলের ছেলে রাখিয়া সে দিনও অশোকা আসিলেন না। অবশেষে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া যে দিন অরবিন্দ কলিকাতা রওয়ানা হইবেন, সেইদিন রজনী যোগে একমাত্র পীড়িত সন্তানকে লইয়া অশোকা গুপ্তভাবে অরবিন্দের নৌকায় উঠিলেন। মুরলার সহিত এদিকে অশোকার আর প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হইত না, যখন দেখা হইত, তখনই মুরলা জেদ করিয়া বলিতেন, "দিদি, তুই কি পাগল হইয়াছিস্, কেন গেলি না? যতশীঘ্র পারিস্, চৌধুরী মহাশয়ের সহিত যা। আমি তোর পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইব। আমার জন্য ভাবিস্‌নে। আমার সহায় ঈশ্বর, তিনি যা করেন, হইবে। তুই আর কিছুতেই এখানে থাকিস্ নে।"

মুরলার এ উপদেশ না পাইলে বুঝি বা অশোকা যাইতেন না। অশোকাকে সকলে ভয় দেখাইয়াছিল, যে "অরবিন্দ তোকে কলিকাতা লইয়া গিয়া বাজারে বেঁচিবে, তোকে বেশ্যা করিয়া দিবে।" এই কথাতেই অশোকা পূর্ব্বে আসেন নাই। নৌকায় আসিয়া তিনি এ সকল কথা অরবিন্দকে বলিলেন। আরো বলিলেন যে, চিৎকার করিয়া যে যাইবার কথা বলিয়াছিলাম, সেও মুরলার উত্তেজনায়। অরবিন্দ এ সকল কথা শুনিয়া খুব আনন্দিত

হইলেন। মুরলাকে মনে মনে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তার পর নৌকা খুলিলেন।

পথের মধ্যে চক্রধরপুরের লোকেরা নৌকা আক্রমণ করিল। কিন্তু অরবিন্দের দুর্জ্জয় সাহসের সম্মুখে সে আক্রমণে কোন ফল ফলিল না। তাহারা বলিল, কলিকাতা যাওয়ার সময় পথ হইতে অশোকাকে ছিনাইয়া লইব।

অরবিন্দ নানা দিক্ ভাবিয়া কয়েকদিন বরিশালে রহিলেন। তাঁহার জনৈক বন্ধু এই সময় খুব সাহায্য করিল। ১০।১২ দিন পর কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন। দীর্ঘকাল নদীতে নদীতে বেড়ানে তাঁহার মাথার পীড়া একটু সুস্থ হইল, এই সময়ের মধ্যে এক মাত্র পুত্রটীও অনেকটা ভাল হইল। বিধাতা, অশোকা ও মুরলাকে বিচ্ছিন্ন করিলেন। মুরলা ও অমৃত কষ্ট সহিতে সেই নিরানন্দপুরেই রহিলেন। পথিমধ্যে অরবিন্দকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইল। বলেশ্বর দিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাঝীরা গুণ টানিয়া যাইতেছে, হঠাৎ তটে দস্যুরা দুজন মাঝীকে আক্রমণ করিল এবং গুণ কাটিয়া দিল। নৌকা ঘুরিতে ঘুরিতে নদীর মধ্যে উপস্থিত হইল। অরবিন্দ নিমেষের মধ্যে দেখিলেন, তাঁহার নৌকা ধরিতে একখানি নৌকা উপস্থিত। অরবিন্দের চিন্তা করিবার সময় নাই। কাহারও সাহায্য পাইবেন, সে আশাও নাই। মধ্য নদীতে সপরিবারে মরিলাম, এই চিন্তা বিদ্যুৎবেগে মনে উপস্থিত হইল, তিনি বন্দুক লইয়া নৌকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বীর-স্বরে বলিলেন, "যে নৌকা স্পর্শ করিবে, তাহারই প্রাণ লইব।" দস্যুরা সে কথায় কাণ না দিয়া নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি দেখিলেন, নৌকায় তাঁহার শ্যালক ও আরো কতিপয় লোক। অরবিন্দ পূর্ব্ববৎ ভাষায় বলিলেন, নৌকাস্পর্শ করিলেই বিপদ ঘটিবে। নৌকার লোকেরা অরবিন্দকে বিলক্ষণ জানিত। তাহারা আর নৌকা ধরিল না। নৌকায় আর দুজন মাঝী ছিল, তাহারা অতিকষ্টে নৌকা তীরে বেরিল। যাহারা গুণ টানিতে তীরে গিয়াছিল, তাহাদের একজনকে বিপক্ষের লোকেরা এমন আঘাত করিয়াছে যে, জীবন সংশয়। আর একজনও প্রহার খাইয়া মৃতবৎ হইয়াছে। অরবিন্দ সেদিন সে নৌকায় আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া ভাঁটা দিয়া পিরোজপুর ফিরিয়া গেলেন। মাঝীদিগের দ্বারা থানায় এজেহার দিলেন, এবং পৃথক নৌকা ভাড়া করিয়া কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন।

কলিকাতা পৌছিয়া কিছুদিনপর শুনিলেন, ঘুষের মোহিনী মায়ায় এই মোকদ্দমা পুলিসেই নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ঐশ্বর্য্যের মোহিনী মায়ায়।

নবোৎসাহে অশোকাকে বিদায় দিয়া মুরলা বড়ই চিন্তার মধ্যে পড়িলেন। এই পৃথিবীর মধ্যে অশোকা ভিন্ন মুরলার সুখ দুঃখের ভাগী আর কে আছে? অশোকা, মুরলার পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, সকলই। অশোকা, মুরলার ইহকাল ও পরকাল। দিদির মুখ চাহিয়াই মুরলা এতদিন জীবন ধারণ করিতেছিলেন। অশোকাকে বিদায় দিয়া মুরলা দারুণ চিন্তার মধ্যে পড়িলেন। চতুর্দ্দিকে প্রলোভন, যৌবনের উত্তেজনা, অবলা বিধবাকে কে রক্ষা করিবে? মুরলা আপন অদৃষ্ট ভাবিলেন। ভাবিলেন, "আজ যদি পাপে ডুবি, জগতের কেহই ফিরিয়াও দেখিবে না, কেহই হাতে ধরিয়া তুলিবার নাই; বরং ডুবাইতে চতুর্দ্দিকে লোক। দুটো মিষ্ট কথা বলিতে, একটু সান্ত্বনা দিতে, চক্রধরপুরে আর কেহই নাই! হায়, দিদিকে বিদায় দিয়া কি নির্ব্বুদ্ধির কাজই করিলাম! বিমাতার চক্রান্ত, আমাকে ডুবাইতে পারিলেই হয়। মা, না রাক্ষসী? এখন কি করি? অমৃতকে কেমন করিয়া বাঁচাই? বিষ খাইয়া মরিব কি?" মুরলা দিনরাত্রি এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এ শ্মশানপুরে, যদি চরিত্র ও ধর্ম্ম রাখিতে না পারি, তবে মরা কি ভাল নহে? আমার জন্য দিদি যার তার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া মরিতেন। আমাকে বুকে করিয়া যেন রাখিয়াছিলেন! এখন তেমন করিয়া কে রাখিবে? আমি কি প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারিব? আমি একাকিনী কি করিয়া বিমাতার কুমন্ত্রণার জাল ছিন্ন করিব? হায়, দিদিকে বিদায় দিয়াছি, এখন কি লইয়া থাকিব?

অমৃত মিষ্ট কথা বলিয়া মুরলাকে ভুলাইতে চেষ্টা করে, মুরলা তাহাতে ভুলে না। ভাবনায় চিন্তায় মুরলার মুখ কালিময় হইয়া গিয়াছে।

অশোকার পলায়নের জন্য মুরলার প্রতি আরো নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। "মুরলা সব জানে, অথচ বলে নাই"—কল্পনায় এ কথা ভাবিয়া যে সে ব্যক্তি

মুরলাকে তিরস্কার ও ভৎসনা করিল। মুরলা, সকল কথায় নির্ব্বাক। মুরলা সমস্ত দিন মলিন মুখে আপন ভাবনা লইয়া থাকেন। কয়েদের অবস্থায় আর কি করেন, পরোপকার ব্রত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, শিক্ষা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। বিরস মনে দিবারাত্রি অদৃষ্ট ভাবেন। হায়, বঙ্গবিধবা, তোর কষ্ট এ জগতে কে বুঝিবে ?

অশোকার মনে শান্তি নাই। কলিকাতা যাইয়া দিনরাত্রি মুরলার কথা ভাবেন। কত লোকের কাছে যে মুরলার কথা বলিয়াছেন, তাহার শেষ নাই। কেহই মুরলার গতি করে না। অশোকা প্রত্যহ মুরলার নিকট এক একখানি পত্র লিখিতেন, কিন্তু মুরলা তাহার একখানিও পাইতেন না। দস্যুরা সে সকল ডাকঘর হইতে আত্মসাৎ করিত এবং পত্রের সেই সকল কথা লইয়া মুরলাকে বিদ্রূপ করিত। এইরূপ ভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হইল।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ প্রথম ব্রাহ্ম সমাজে যান। ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়ার দিন হইতে পরিবারের লোকেরা বুঝিয়াছিল, অরবিন্দের দ্বারা পিতৃধর্ম্ম রক্ষা পাইবে না। কিন্তু তেজীয়ান অরবিন্দকে কেহ কিছু বলিত না, অপিচ তাঁহার সুমিষ্ট সংস্বভাবের গুণে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শোভাকে কলিকাতায় আনয়ন করার পর সকল আত্মীয় অরবিন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অশোকা কলিকাতা আসিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে মহাত্মা কেশবচন্দ্রের বড় কন্যার বিবাহ লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। অরবিন্দ এই সময়ে অশোকাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। যাঁহারা কেশব বাবুর কন্যার বিবাহে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এই সময়ে তাঁহাদের আশ্রয়ে অরবিন্দকে কিছু দিন কাটাইতে হইল। ইঁহাদের নিকট অনেক উপকার পাইয়া অরবিন্দ খুব অনুরক্ত হইলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের সময় অরবিন্দ দিবারাত্রি এই নবসমাজের জন্য পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল আর মুরলার বিষয় ভাবিতে বড় একটা অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। অশোকা মুরলার চিন্তায় অধীরা, কিন্তু স্বামীর নিকট কোন সাহায্য পাইতেন না। সমাজের বিষম আন্দোলনে গা ঢালিয়া দিয়া কিছুদিন এত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল যে, আর কোন বিষয় ভাবিবার সময় ছিল না। বিধাতার কৃপায় অশোকার আগমনের পর হইতে অরবিন্দের আর মস্তিষ্ক রোগের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অবস্থার

সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে করিতে বিধাতা অরবিন্দের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। ক্রমে ক্রমে অরবিন্দ অনেক পুস্তক লিখিলেন, ক্রমে ক্রমে সকলগুলিরই খুব কাট্‌তি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে অপরিচিত থাকিতে অরবিন্দের একান্ত ইচ্ছা ছিল, এইজন্য কোন পুস্তকে নাম দিতেন না। কিন্তু ঘটনাক্রমে নানা প্রতারক অরবিন্দের পুস্তকের প্রণেতা বলিয়া মফঃস্বলের লোকদিগকে ঠকাইতে লাগিল দেখিয়া অরবিন্দ শেষে পুস্তকে নাম প্রচার করিলেন। ৬।৭ বৎসরের মধ্যে অরবিন্দ ব্রাহ্মসমাজের দশজনের মধ্যে একজন হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সকল লোক অরবিন্দকে বিশেষ স্নেহ ও চরিত্রের মাধুর্য্যের জন্য সম্মানের সহিত দেখিতে লাগিল। অরবিন্দ বিধাতার কৃপায় কিছু ইষ্টক কুড়াইয়া একটী ছোট বাড়ী প্রস্তুত করিলেন এবং বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া শোভার বিবাহ দিলেন। এই সময়ে দুঃখীর প্রতি অবারিত দয়া, দেশের প্রতি প্রগাঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, আপামর সাধারণের প্রতি ভালবাসা, জন্মভূমির উন্নতির জন্য একান্ত অনুরাগ তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। স্বদেশের উন্নতির জন্য একটী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার জন্য অক্লান্ত অন্তরে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশ্রেণীর লোক অরবিন্দের প্রতি অনুরক্ত হইল। অরবিন্দের স্বভাবের বিশেষ মাধুর্য্য এই, যখন খুব দরিদ্র ছিলেন, তখনও কাহারও প্রাপ্য টাকার জন্য দ্বিতীয়বার তাহার নিকট তাগাদা করিতে হইত না। কোন লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া কখনও অসন্তুষ্ট হইয়া যাইত না। কিন্তু অরবিন্দের কর্ত্তব্যে বাধা দিতে কেহই সাহসী হইত না, বাল্যকাল হইতে কেহই অরবিন্দকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে সাহসী হয় নাই। অবস্থার পরিবর্ত্তনেও এ সকল ভাব একটুও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত অনেকের মাথা ঘুরিয়া যায়, অনেকে অহঙ্কারী হয়, সামান্য পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করে, গাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া নবাবী আরম্ভ করে। অরবিন্দ পূর্ব্বেও যেমন, আজও তেমনি।

অরবিন্দ অনেক কাজ করিলেন, কিন্তু অশোকা দেশের উপকার বুঝেন না, সমাজের উন্নতিও বুঝেন না, কিছুই বুঝেন না, তিনি বুঝেন কেবল "মুরলা"। অশোকা ভাবেন,—মুরলার কথা ভুলিয়া অরবিন্দ যে অধর্ম্ম ক্রয় করিতেছেন, সে জন্য ভবিষ্যতে অরবিন্দকে অনেক সহ্য করিতে হইবে। মুরলার ভার, নেপালচন্দ্র, দাদা অরবিন্দের হস্তে অর্পণ করিয়া

গিয়াছিলেন ; ঐশ্বর্য্য, যশ, মানের কুহকে অরবিন্দ সে কথা ভুলিয়া গেলেন। এ একটী অসামান্য পরিবর্ত্তন, সন্দেহ নাই। বিধাতা অলক্ষিত ঘটনার অঙ্কে, বুঝিবা, অরবিন্দের এই পাপের জন্য অনেক কষ্ট যন্ত্রণা লিপিবদ্ধ করিলেন।

[যে তোমাকে সরলপ্রাণে ভালবাসে, তাহার ভালবাসা কখনও তুচ্ছ করিও না। কাহাকে ভালবাসিয়া তাহা কখনও প্রত্যাখ্যান, করিও না। যদি কর, এ পাপ বিধাতা কখনও ক্ষমা করিবেন না। ভালবাসা-হীনতার পোড়াবাজারে চিরকাল তোমাকে দগ্ধ করিবেন এবং যে সুখ ঐশ্বর্য্যের মায়ায় ভালবাসা তুচ্ছ করিয়াছিলে, সেই সুখ ঐশ্বর্য্যে তোমাকে চিরবঞ্চিত করিবেন।] অরবিন্দের এই গুপ্ত পাপে প্রসন্ন বিধাতা যেন অপ্রসন্ন হইলেন। অথবা কে জানে তাঁহার বিধি? সুখ দুঃখ চিরদিন সমান থাকে না। দুঃখের পর সুখ পাইয়া যে ব্যক্তি আত্মহারা হয়, তাহার মনে রাখা উচিত, আবারও দুঃখ আসিতে পারে। নেপাল এবং মুরলা হইতেই অরবিন্দের জীবন আরম্ভ, সেই মুরলাকে ভুলিয়া অরবিন্দ ভাল করিলেন না ; কিন্তু মানুষের স্বভাবের গতি কে থামাইবে ?

দুঃখিনী মুরলার দিন কি বসিয়া থাকিল ? দিন কি কাহারও জন্য বসিয়া থাকে ? অরবিন্দ মুরলাকে ভুলিলেন, তবুও মুরলার দিন যাইতে লাগিল। অশোকা ভুলিলেন না, কিন্তু মুরলা তাঁহারও কোন পত্র পান নাই, সুতরাং অশোকা সম্বন্ধেও মুরলা ভাবিলেন, দিদিও আমাকে ভুলিয়াছে। ভাবিতে দারুণ কষ্ট হইল, “কিন্তু মানুষের মন সব পারে” এ কথা অগত্যা মুরলা ভাবিলেন। কিছুদিন পর আপনার পথ আপনি পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। শিক্ষার প্রতি তাঁহার বাল্যকালাবধি যে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তাহা অবলম্বন করিলেন, বিবিধ উপায়ে ইংরাজি বাঙ্গলা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। আর পরোপকারের কথা কি বলিব?—যে রোগীর পার্শ্বে ঘৃণায় আর কেহ যায় না, সে রোগীর পার্শ্বেও মুরলাকে দেখিবে। মুরলা পরের সেবা শুশ্রূষায় দিন দিন আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মানুষ হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

উৎপীড়নে।

বৎসরে বৎসরে অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, অরবিন্দ এখন ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারে মন দিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ দেশসংস্কারে ব্যাপৃত, অরবিন্দ ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারে নিযুক্ত। দুর্বুদ্ধি আর কাহাকে বলে? যাহারা সকল সংস্কারের উপরে উত্থিত, তাহারা অরবিন্দের বাল-চাপল্যের কথা শুনিবে? অরবিন্দ খুব অবিবেচকের কাজ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজে এই সময়ে বিবাহ বিষয়ে বড়ই স্বেচ্ছাচারিতা প্রবেশ করিতেছিল,—কোন প্রতিবন্ধক নাই, কোন বাধা নাই, যে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতেছে দেখিয়া এবং নানা অবৈধ পাপকার্য্য প্রশ্রয় পাইতেছে বুঝিয়া, তাঁহার মন বড়ই বিচলিত হইল। ব্রাহ্মসমাজনীতি জগতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে বলিয়া তাহার প্রাণে দারুণ যাতনা উপস্থিত হইল। তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। কোন কোন বিবাহের প্রতিবাদ করিলেন এবং কোন কোন বিবাহে যোগ দিলেন না, এবং নানারূপ উপায়ে সমাজসংস্কার করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমাজের লোকেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অপিচ, ব্রাহ্মসমাজের এক শ্রেণীর লোক অরবিন্দের প্রতি বড়ই খড়্গহস্ত হইলেন। কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে, এইরূপে অরবিন্দ স্বীয় নির্ম্মল যশোরাশিতে নিন্দা-কলঙ্ক নিক্ষেপ করার সুযোগ করিয়া দিলেন। একবার পথ পরিষ্কার পাইলে আর ভাবনা কি? যুবকের দল এইরূপ স্বেচ্ছা বিবাহে মাতিয়া উঠিল। দুর্নীতি যখন এইরূপে প্রশ্রয় পাইতে লাগিল, তখন এ সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ্য পত্রিকায় বিশেষ আন্দোলন তুলিলেন। আন্দোলনের ফলে এ দিকে অনেকের দৃষ্টি পড়িল বটে, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসাধারণের নিকট বড়ই ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিলেন। যে সকল লোকের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন, তাহারা ত অরবিন্দের চিরশত্রু হইল; তাহাদের আত্মীয় বান্ধবেরাও শত্রু হইল। অরবিন্দের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উত্থিত হইল। বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে চটিয়া গেলেন। এক সময়ে অরবিন্দ যে সকল ব্যক্তির প্রচুর উপকার করিয়া-

ছিলেন, তাহারাও এখন সময় পাইয়া ভয়ানক শত্রু হইয়া উঠিল, প্রত্যুপকারের সুসময় পাইয়া তাহারাও নাচিয়া উঠিল। সমাজে অরবিন্দের নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল; নানা মিথ্যানিন্দা ঘোষণা করিয়া শত্রুপক্ষীয়েরা অরবিন্দের সম্বন্ধে সাধারণের মন খারাপ করিয়া দিতে লাগিল। বহু আত্মীয় বন্ধুপরিপূর্ণ হিন্দুসমাজের তীব্র আন্দোলনে যে বীর জয়ী হইয়াছিলেন, সে বীরের বিরুদ্ধে এরূপ আন্দোলন তোলা ব্রাহ্মসাধারণের পক্ষে কতদূর যুক্তিযুক্ত হইল, জানি না; তবে ইহাতে এই হইল, হিন্দুসমাজের অনেক প্রবীণ প্রবীণ ব্যক্তি অরবিন্দের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। অরবিন্দের মিথ্যা নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করিয়া হিন্দুসমাজের লোকদিগকে পরাস্ত করিতে ব্রাহ্মেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাকুক, ব্রাহ্মসাধারণ সাধারণের নিকট দিন দিন খুব ঘৃণার জিনিস হইয়া উঠিল। যে কাগজে ব্রাহ্মবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল, সে কাগজের লেখক এবং গ্রাহক ভাঙ্গিবার জন্য অনেক ব্রাহ্ম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু তাহারও ফল ভাল হইল না। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা পত্রিকা ছাড়িল বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজের সহৃদয় লোকেরা সে অভাব পূরণ করিলেন, তারপর, যত নীচ উপায় কল্পনা করা যায়, সে সকল ও অবলম্বিত হইল। বলিতে লজ্জা হয়, কেহ কেহ অরবিন্দকে বাড়ী হইতে তাড়িত করিবার জন্য পর্য্যন্ত চেষ্টা করিলেন। অরবিন্দের নিন্দায় দেশ ছাইল। অরবিন্দ এই সময়ে তাহার একজন বিশেষ বন্ধুকে বলিলেন,—"তুমিও বিপক্ষে যোগ দিলে? এক সময়ে যে ব্যক্তি অত্যাচার ও অনাহারে মরিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তবুও হিন্দুসমাজের অত্যাচার ও আন্দোলনে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয় নাই, তুমি কি মনে কর, একমুষ্টি ব্রাহ্মের অত্যাচারে সে ব্যক্তি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবে? যে চটিবে, সে ঘরের ভাত অধিক পরিমাণে খাইবে, আমার তাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না। বিধাতার কৃপায় কর্ত্তব্য পালনের জন্য আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত; তোমরা কি ভয় দেখাও? আমার ব্রহ্মকৃপার ফুৎকারে তোমাদের সকল আন্দোলন উড়িয়া যাইবে। কোন কথা থাকে, আমি কোন অন্যায় করিয়া থাকি, সাহসপূর্ব্বক আমাকে বল; ভীরু কাপুরুষের ন্যায় অন্ধকারে গোপনে নিন্দা-ইষ্টক নিক্ষেপ কর কেন?"

বন্ধু লজ্জায় মুখ নত করিয়া বলিলেন,—"আমি আপনার বিরুদ্ধে কি করিয়াছি?"

অরবিন্দ।—কি করিয়াছ, বিধাতা জানেন। একদিনও যদি তুমি কাপুরুষের ন্যায় আমার অসাক্ষাতে আমার নিন্দা করিয়া থাক, নরকেও তোমার স্থান হইবে না। কিছু বলিবার থাকিলে, আমাকে বলিলে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় কাজ করা হইবে। আমার দোষ থাকে, আমাকে বলা উচিত; অসাক্ষাতে যাহারা নিন্দা করিয়া বেড়ায়, তাহারা কাপুরুষ।

বন্ধু আর কথা বলিলেন না, কিন্তু গোপনে গোপনে আরো ষোল আনা বিপক্ষে যোগ দিলেন। যখন ব্রাহ্মসমাজের কোন লোকেরা এই বন্ধুকে জানিত না, তখন এই বন্ধুর জন্য অরবিন্দ কত অশ্রু ফেলিয়াছেন। আজ অবস্থার পরিবর্ত্তনে তিনিও কত চক্রান্ত করিতেছেন! অরবিন্দ বীরদর্পে অবিচলিতভাবে কর্ত্তব্যপথে চলিতেছেন, কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত নাই। কেহ তাঁহার সঙ্গে কথা বলে না, কেহ বিপদের সময় ধারেও ঘেষে না, অরবিন্দের এখন এইরূপ অবস্থা। এতদূর পর্য্যন্ত আন্দোলনের ফল হইয়াছে যে, শোভা ও শোভার স্বামীও এখন বিপক্ষে। তাহারা ও অশোকা, অরবিন্দের এ সকল ব্যবহার ভালবাসে না। অবশ্য এ ভাব দীর্ঘকাল তাহাদিগকে মলিন রাখিতে সমর্থ হয় নাই। সমাজের সব লোক চটা, ইহা অশোকার সহ্য হয় না। স্বামীনিন্দা রমণীর কত সয়? অশোকা সমাজে যাওয়া, পাড়ায় যাওয়া বন্ধ করিয়াছেন; কিন্তু মনে মনে স্বামীর প্রতি তিনিও বিরক্ত। অরবিন্দের সহায় কেবল বিধাতা। তিনি দুবেলা বিধাতাকে বলেন,—"জগজ্জননি, আমি যেন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি। তুমি আমাকে বল দেও, আমায় আশীর্ব্বাদ কর।"

এই সময়ে একজন সহৃদয় বিলাত-প্রত্যাগত বন্ধু অরবিন্দকে লিখিয়াছিলেন,—"মনে রাখিবেন, সৎকাজের জন্য এ জগতে আপনিই কেবল নির্য্যাতন সহ্য করিতেছেন না, খ্রীষ্ট ও রামমোহন রায়কেও অনেক সহ্য করিতে হইয়াছিল। আপনার শরীর মাটীতে ভস্ম হইলে তবে কর্ত্তব্যের সুফল ফলিবে। ভয় কি, বিধাতা আপনার সহায়।" একদিন অরবিন্দের পুত্রটী দারুণ অবিচ্ছেদ জ্বরে মৃত্যুশয্যায় শয়ান, ১০৬ ডিক্রী দেহের উত্তাপ; চাকরটী ফুস-ফুস-প্রদাহে এখন-তখন; আর একটী দেশস্থ আত্মীয়—মুরলার বিশেষ আত্মীয় ক্ষয় কাশীতে মৃত্যু শয্যায়—এমন দিনে একজন কৃতবিদ্য, উচ্চ বেতনধারী লোক বাড়ীতে আসিয়া নানারূপ অপমান করিলেন; ভয় দেখাইলেন যে, অরবিন্দকে আদালতে যাইতে হইবে। কয়েকদিন খুব

রাষ্ট্র হইল যে, অরবিন্দের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উঠিবে। কি আশ্চর্য্য, অরবিন্দের তাহাতেও ভয় নাই।

অশোকা বড়লোকের আস্ফালনে ভয় পাইয়া অরবিন্দকে একদিন বলিলেন—"অবশেষে তুমি জেলে যাইবে, ইহাই কি মনস্থ করিয়াছ ?"

অরবিন্দ। জেল মন্দ স্থান কি? কর্ত্তব্যপালন করিয়া তোমার স্বামী যদি জেলে যান, তিনি কৃতার্থ হইবেন। ভয় পাও কেন? মুরলা হইলে কখনও এরূপ ভয় পাইতেন না।

অশোকা। মুরলার কথা ভুলিয়াই তুমি এত ভোগ ভুগিতেছ; আমাদের সমাজের উন্নতি দিয়া কাজ কি ? আমরা দরিদ্রের সেবা করিয়া দিন কাটাইব, ইহাই ব্রত হওয়া উচিত। বড় বড় লোকের বিরুদ্ধে লেখনী চালাইয়া বড়ই অনর্থ ঘটাইবার উপায় করিতেছ, দেখিতেছি। গোবিন্দ বাবু মাসে ১৫০০৲ টাকা বেতন পান, জ্ঞানদা বাবু সামাজের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, ইহাদের সাত খুন মাপ; টাকার সম্মান কোথায় নাই, বল ত? ইহাদের ন্যায় ধনীলোকের সম্বন্ধে না লিখিলেই কি নয় ?

অরবিন্দ। সকল বাবুকেই জানি। টাকাকে ভয় করিতে হয়, তুমি করগে, আমি বাবাকে, দাদাকে ভয় করি নাই, জান না কি? জ্ঞানদা বাবু, গোবিন্দ বাবুর বিরুদ্ধে ইচ্ছা করিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছু লিখি নাই। যাহা লিখিয়াছি, সমাজের মঙ্গলের জন্য কর্ত্তব্যের অনুরোধে লিখিয়াছি, এ জন্য যত কষ্ট থাকে, সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা অবৈধ প্রণয়ের খাতিরে হিন্দুসমাজের মেয়ে উদ্ধার করিয়া আজ দিগ্বিজয়ী জয়ডঙ্কা বাজাইয়া আকাশে নিশান তুলিতেছেন, আমি ইহা সহিতে পারি না। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে কত ছেলে মেয়ে অধর্ম্ম ও পাপের পথে যাইতেছে; সকলের বিবেক নির্ব্বাক্, কেহ মুখে কথাটী বলে না। ব্রাহ্মসমাজকে দুর্নীতির পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিধাতা আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি যাহা করিতেছি, তাঁহার আদেশে করিতেছি। আমি ভয়ে জড়সড় হইয়া কখনও কর্ত্তব্য ভুলিতে পারিব না, বিধাতার যাহা ইচ্ছা, পূর্ণ হইতে দেও। সত্য ধরিয়া, নির্য্যাতন নিন্দা তুচ্ছ কথা, মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি।

অশোকা দেখিলেন, অরবিন্দের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, বলিলেন,

তোমাকে কর্ত্তব্য ভুলিতে বলিতেছি না। কিন্তু মুরলাকে উদ্ধার করা কি তোমার কর্ত্তব্য ছিল না ?

অরবিন্দ। মুরলা আপনি আসিলে আমি তাহার জন্য যাহা করিতে হয়, করিব। তাহাকে আমি উদ্ধার করিতে গেলে লোকে বলিবে, বিষয়ের লোভে আমি পড়িয়াছি।

অশোকা। লোকের কথায় তোমার কি ? তুমি বলিয়াছ, লোককে তুমি ভয় কর না, তবে আবার কেন এ কথা বল ? তুমি জান না কি, লোকেরা তোমার কত কুৎসা করে ? তুমি যে বাড়ীতে এত অনাথ ছেলে মেয়ে রাখ, ইহাতে লোকে বলে যে, ইহা তোমার একটা ব্যবসা, টাকার লোভে এরূপ করিতেছ ! কেহ কেহ তোমার চরিত্রেও দোষ দেয়। এ কথা শুনিয়া কি তুমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবে ?

অরবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, আমি এইরূপ করিয়াই নয় বড়মানুষ হইলাম, তাতেই বা দোষ কি ? মুরলার উদ্ধারের ভার তোমার উপর দিয়াছি। সে যে তোমার ভগ্নী।

অরবিন্দের ঠাট্টায় অশোকা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমি অবলা, আমি কি পারি ? তুমি বড় কাজ হাতে লইয়া ছোট কর্ত্তব্য ভুলিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছ ; যে ছোট কাজ ভাল করিয়া করিতে পারে না, সে বড় কাজও সম্পন্ন করিতে পারিবে না।

অরবিন্দ। তোমার এ কথা ঠিক। স্বীকার করিলাম, মুরলার জন্য কিছু না করিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি।

অশোকা। তুমি জান না কি, সে কি কষ্টে আছে ? তাহার ধর্ম্মনাশ করিতে সকলে ব্যতিব্যস্ত। হতভাগিনীর বিশ্ববিমোহিনী রূপই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। তুমি কি ভাবিতেছ ? এখনও তার জন্য কিছু কর। এ সকল আন্দোলন ছাড়িয়া এই পথ ধর। বৃথা হুজুগ করিলে কি হইবে, দুটী লোককেও যদি পাপের হস্ত হইতে কাড়িয়া আনিতে পার, জীবন সার্থক হইবে ?

অরবিন্দ। তোমার উপদেশে ? মহাত্মা কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন,— "লোকের কথায় ভাল কাজও করিব না, কিন্তু বিধাতার কথায় করিব।" আমারও এই কথা। তুমি রাগ করিও না,—তুমি জান, আমি বাল্যকালাবধি কাহারও কথায় কোন কাজ করি নাই। এজন্য লোকে আমাকে

একগুয়ে বলে, গোঁয়াড় বলে, কত কি বলে। তুমি জান, আমি বিধাতার ইঙ্গিত না বুঝিলে কিছুই করি না। এজন্য আমাকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে, আরো সহ্য করিতে হইলে তাহাও অবনত মস্তকে করিব। সত্য কথা বলিতেছি, মুরলার কর্ত্তব্য নেপি দিয়াছে, কিন্তু আজও বিধাতা আমার হাতে দেন নাই। তিনি যদি এ ভার আমাকে দিতেন, এতদিন যাহা করিবার, করিতাম। তুমি বল, সময়ে সময়ে আমারও মনে হয়, মুরলার কর্ত্তব্য অবহেলা করার দরুণই বুঝিবা আমার এত কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু বিধাতা এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই আদেশ করেন নাই। আদেশ গোপন করিয়া কষ্ট দেওয়া যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয়, আমি তার সামান্য দাস, কি করিব? প্রভুর অবমাননা করিতে পারিব না। বাল্যকাল হইতে আমি তাঁহার আদেশ পালন করিয়া আসিয়াছি, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত করিব। পৃথিবীর বন্ধু থাকে, ভাল; না থাকে, সব যাক্। তুমিও যদি পর হও, একটুও ডরাই না। কেবল তিনি ও আমি—আর কাহাকেও চাই না। তুমি আমাকে ভয় দেখাইও না। স্ত্রীর কাজ এ নহে। মায়ার ছলনে ভুলাইও না, সত্যই বলিতেছি, স্ত্রীর কাজ এ নহে। আমাকে বিধাতার আদেশ পালনে অগ্রসর হইতে দেও, পুণ্যবতি, তুমি বীরপত্নী হও। পৃথিবীর ভাই বন্ধু, সকলেই ত আপন আপন পথে, আপন আপন মতে চালাইতে চায়। তুমিও কি সেই জঘন্য পথ ধরিবে? আমি জগতের সকলকে মান্য করি, সকলকে আদর করি, সকলকে ভালবাসি, তুমি জান; কিন্তু কাহারও দাস হইতে চাই না। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, আমি কখনও গোলামী করিব না। ইহাতে সুখ হয়, হইবে, দুঃখ থাকে, ঘটিবে; ভয় পাই না। লোকগুলো কত ভয় দেখায়, বন্ধুরা কত ভালবাসার ফাঁদে ফেলিয়া মতের গণ্ডীতে ঢকাইতে চান; আমি ভয়ে বা ভালবাসার খাতিরে কাহারও মতের গোলামী করিতে পারিব না। তুমি মুরলার জন্য অস্থির, তাহা কি আমি জানি না? কিন্তু কি করিব, অশোকা, বিধাতা আজও আমার কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেন নাই। তুমি জান, বিধাতা আদেশ করেন নাই বলিয়া, কত ব্রাহ্ম ঘৃণা করিলেও আমি আজও মৎস্য মাংস ছাড়ি নাই।

অশোকা স্বামীর এ সকল কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। আর কিছুই বলিলেন না। বিধাতার আদেশে যে মানুষ মরিতে যায়, তাহাকে কে ফিরাইতে পারে? খ্রীষ্ট যখন ক্রুসে দেহত্যাগ করিলেন, কে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট

করিতে পারিয়াছিল? ম্যাট্‌সিনি যখন দেশান্তরিত হইলেন, কে তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারিয়াছিল? এ সকল ভাবিলেন এবং স্বামীর দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা এবং বিধাতার প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরের কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় নতমুখে ধীরে ধীরে বলিলেন, বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, তোমার সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে আমি প্রস্তুত।

অরবিন্দ আর কোন কথা না বলিয়া অন্যমনস্ক হইয়া স্থানান্তরে গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

স্বামীর ঈঙ্গিতে।

কয়েদের অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া মুরলা এখন একাকিনী, ভাবিয়া ভাবিয়া উন্মাদিনী। কিছুদিন অনেক সময় একদৃষ্টে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। "যে পথে দিদি অশোকা গিয়াছে, আমি কবে সেই পথে যাইব?" কিছু দিন এই চিন্তা করিতেন। কখনও ভাবিতেন, "অমৃতকে কি করিয়া বাঁচাইব? লোকগুলো না পশুগুলো, সকলে রিপুর জ্বালায় উন্মত্ত; এ দুই যৌবন-ভরা রাখিব কি রূপে? চতুর্দ্দিক হইতে ভরা ডুবাইতে লোকগুলো ব্যতিব্যস্ত, কেমনে কুল রাখিব?" কখনও নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতেন; স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কত ছাই ভস্ম বলিতেন--"তুমি গেলে ত আমাকে রেখে গেলে কেন? আমি যে আর তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারি না!" মুরলা চুল বাঁধেন না, মাথায় তেল দেন না। পরিধানে মলিন সামান্য সাদা কাপড় পরেন, একবেলা একমুষ্টি হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন। পৃথিবীর সমস্ত সাধ যেন চলিয়া গিয়াছে। পিতার গৃহে আশ্রয় নাই; বিমাতার উত্তেজনায় গৃহত্যাগিনী। জেঠা মহাশয় সম্প্রতি পুনঃ বিবাহ করিয়াছেন, সে ঘরে যে আশ্রয় ছিল, তাহাও ছিন্নমূল হইয়াছে। সবই যেন পর, কেহই আপনার নাই। যখন কিছুই ভাল লাগে না, তখন কেবল কাঁদেন। অমৃত মুরলার চক্ষে জল দেখিলেই ছুটিয়া আসিয়া তাহা মুছাইয়া দেয় এবং বলে, "মা, তুমি আর কেঁদনা, তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার প্রাণ যে অস্থির হয়!" মুরলা ভাবেন, অমৃতের হৃদয়টা কি মধুর ভালবাসা-

ময়। ভাবেন, হায়, বুঝি আর তাহাকে রাখিতে পারিলাম না! মুরলার এই বিষণ্ণ ভাব দীর্ঘকাল রহিল না।

প্রলোভন-সংগ্রামে এ পৃথিবীতে কয় জন জয় লাভ করিতে সমর্থ? সমস্ত জগৎ যুড়িয়া যদি ফাঁদ পাতিয়া রমণীর প্রাণ কাড়িতে প্রয়াসী হয়, অবলার কি সাধ্য রিপু জয় করিতে পারে? মুরলা পূর্ব্বে কোন পুরুষের সহিত কথা বলিতেন না; কিন্তু মনে মনে ঠিক্ করিয়াছেন, যেরূপেই হউক, কলিকাতা যাইতেই হইবে। এই কাজে কোন লোকের সাহায্য পাইতে ইচ্ছা। চক্রধরপুরের ইষ্টকুটুম্ব কোন কোন লোকের সহিত ইদানীং এই জন্য দুইচারিটী কথা বলেন। কিছু দিন হইল চক্রধরপুরে দুটো এণ্ট্রাঞ্চ স্কুল হইয়াছে। স্কুল জাঁকাইবার জন্য বহু বিদেশী ছাত্রদিগকে উভয় পক্ষের লোকেরা বাড়ীতে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে। মুরলার পিতাও দুই চারি জন ছাত্রকে আশ্রয় দিয়াছেন। একজন ছাত্র বড় দুর্বৃত্ত। সে মুরলার রূপে বিমুগ্ধ। সে মুরলাকে মজাইবার জন্য নানা ফাঁদ পাতিতেছে। মুরলা, সাবধান, সাবধান!

একদিন মুরলা ও অমৃত বকুলতলায় বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছেন, সেখানে আর কেহই নাই দেখিয়া সেই ছাত্রটী হঠাৎ সেখানে উপস্থিত। মুরলা ছুটিয়া পলাইতেছেন দেখিয়া সে বেহায়া বলিল—লজ্জা বড় জিনিস! আমি পেটের ছেলের মত, আমাকে আবার লজ্জা?

মুরলা কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। অমৃতও পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইল।

আর একদিন মুরলার ছোট ভগ্নীর কাছে চাহিয়া সেই বেহায়া ছাত্র মুরলার একখানি কাপড় পরিল। মুরলা সেজন্য যখন তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন, তখন বেহায়া বলিল, গরীব ছাত্রের মায়ের এত রাগ!

আর একদিন বেহায়া পরোক্ষে মুরলাকে পড়ানের প্রস্তাব করিল। বলিল, আপনি মা, আমি ছেলে, আপনার পড়িতে বড় বাসনা, আমার নিকট পড়ুন না কেন?

যে মা বলিয়া ডাকে, কোন্ মেয়ের তার প্রতি সন্দেহ থাকে? দু'দশ দিন পর মুরলা একটা আধটা কথা ছেলে ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ছাত্র মনে মনে উল্লসিত হইল। ভাবিল, এবার পথ পাইয়াছি।

বাসনা কি সহজে নিবৃত্তি হয়? ছাত্র শেষে ক্রমেই মাতিয়া উঠিল। স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া শেষে সমস্ত দিন মুরলাকে পড়াইতে লাগিল। পবিত্র

কুসুমের সহিত কীট যে দেবপূজার বিভ্রাট ঘটায়, মুরলা সে কথায় অনভিজ্ঞা। মুরলার পাঠে দারুণ অনুরাগ। এই অনুরাগ, কাল সর্পকে দংশনের জন্য সাজাইয়া তুলিল।

অমৃত এ সকল চক্রান্ত বুঝিয়াছে, সে মধ্যে মধ্যে ছাত্রের সহিত কথা বলিতে মুরলাকে নিষেধ করে। মুরলা বলে, এ আমার ছেলে, ভয় কি? কতকটা পাঠ্ শেষ করিয়া লই।

ছাত্রটী ক্রমেই মাতিতে লাগিল। মুরলার কথা শুনিতে, মুরলার রূপ দেখিতে, মুরলার ধারে বসিতে সে সদা লালায়িত। বড়ই আশ্চর্য্য, এ দিকে মুরলাকে সে মা বলিয়া ডাকে। সন্তানের মনে কু অভিপ্রায় থাকিতে পারে, অতি পাষণ্ডেরও একথা মনে জাগে না। কেহই সন্দেহ করিত না। হত-ভাগ্য ছাত্র প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিল।

মুরলার অসুখ হইলে ছাত্র এখন মুরলার ধারে বসিয়া শুশ্রূষা করে। মুরলা, তুই নিজে হাতে তুলিয়া বিষ খাইলি, এখনও সাবধান হ! কিন্তু হায়, মুরলা অনেক বুঝেন, একথাটা বুঝিলেন না, ভালবাসায় ক্রমে ছাত্রের বশ হইলেন। বৃথা আব্দার এখন বাধ্য হইয়া তাহাকে শুনিতে হয়। যে সকল পাপের কথা লিখিতে লেখনী কম্পিত হয়, এরূপ ঘটনাও দুই একটী ঘটিল। মুরলা এখনও সাবধান হইলেন না। ক্রমে ক্রমে ছাত্রটী বড় বাড়িয়া উঠিল, একদিন হঠাৎ মুরলার নিদ্রাবস্থায় আক্রমণ করিল। ভালবাসার খাতিরে, মুরলা ধর্ম্ম ডুবাইলেন; কিন্তু আজও সজাগ হইলেন না। মানুষ ডুবে যখন, তখন বুঝিবা এমন করিয়াই ডুবে।

পাপ চিন্তায় পাপ-বাসনা বলবতী হয়। পাপ কর্ম্মের আস্বাদনে, পাপের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। তার পরের কথা আর কি লিখিব? দুই দশ দিন মুরলা সুখে ঘর করিলেন। মুরলার আদর্শই যখন এরূপ মলিন ও নিস্প্রভ হইল, মেয়ে অমৃতও তখন ডুবিল। অমৃত দীর্ঘকাল আর চক্রধরপুরে থাকিল না, জনৈক ছাত্রের সহিত এক রাত্রে পলায়ন করিল। চক্রধরপুরের স্কুলের সুফল এমনই করিয়া ফলিতে লাগিল। যখন অমৃত পলায়ন করিল, তখন মুরলার চেতন হইল। "আমি কি করিলাম? নিজেও ডুবিলাম, অমৃতকেও ডুবাইলাম? ছি, এমন কাজ আর করিব না।" এইরূপ ভাবিয়া মুরলা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, কিন্তু ছাত্র ছাড়িবে কেন? সে হাতে ধরিল, পায়ে ধরিল, কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইল, মরিতে

চাহিল; শেষে মুরলা কাজেই নত হইল। ছাত্রটা মুরলার জন্য যেন পাগল।

আজ অমাবস্যা। আকাশ ভরিয়া মেঘ উড়িতেছে। বিদ্যুৎচম্কাইতেছে। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, পাখী ভয়ে ভয়ে কদাচিৎ দুই একবার ডাকিতেছে। মুরলা সেই বকুল তলায় একাকিনী। বাতাসে ফুল পড়িতেছে, হতভাগিনী বিদ্যুদালোকে তাহা কাপড় পাতিয়া কুড়াইতেছেন। হঠাৎ একটা শব্দ কাণে গেল। কিছুই ভাল বুঝিতে পারিলেন না। যেন জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছেন। আবার পশ্চাৎ দিক্ হইতে শব্দ শুনিলেন। কাণ পাতিয়া শুনিলেন, কে যেন বলিতেছে, "হতভাগিনি! বিষ খাইয়া মরিয়াছিস্, বকুল তলা হইতে দূর হ। তোর এখানে স্থান নাই।" বিদ্যুৎ আবার চমকিল, মুরলা চাহিয়া দেখিলেন, তাহার স্বামী সেখানে দণ্ডায়মান। মুরলার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, মনে ভাবিলেন, একি স্বপ্ন দেখিতেছি?

সেই প্রতিকৃতি আবার বলিল—"যাহাকে সুধা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধর্ম্ম ডুবাইয়াছিস্, তোর প্রায়শ্চিত্ত তাহারই হাতে। এখনও সাবধান হ। আর রক্ষার উপায় আছে কি না, জানি না; এখনও সাবধান হ। যত শীঘ্র সম্ভব, দাদা অরবিন্দের নিকট যা।"

মুরলা নির্ব্বাক্। কথা বলিতে ইচ্ছা, কিন্তু মুখে কথা সরে না। একদৃষ্টে বিদ্যুৎ-সাহায্যে স্বামীর সেই স্বর্গীয় কান্তি ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবেশ করিয়া শরীরকে অবসন্ন করিয়া তুলিল। মুরলা হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছার অবস্থায় আবার দেখিলেন, স্বামী কাছে, অতি নিকটে। মুরলা ধরিতে যখন হাত বাড়াইলেন, তখন তিনি বলিলেন—"নরকে ডুবিয়াছিস্, আমাকে পাইবি কেমনে? আমি তোর চিন্তায় সদা ব্যাকুল। কি আর বলিব, এক মুহূর্ত্ত আমার প্রাণে শান্তি নাই। তুই কোন্ প্রাণে আমাকে ভুলিলি?" মুরলা দেখিলেন, স্বামীর দুই গণ্ড বহিয়া চক্ষের চল পড়িতেছে। তিনি আত্মহারা ভাবে বলিলেন, স্বামি, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে বাঁচাও। আমার কি আর উপায় নাই?

স্বামী পুনঃ বলিলেন—আছে, পতিতপাবন দয়াময় নাম স্মরণ কর্। দাদা পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র, তাঁহার চরণের আশ্রয় ল। তিনি তোর জন্য প্রার্থনা করিলে তোর মঙ্গল হইবে। তিনি দেবতা, বিধাতার ভক্ত-

সন্তান, তাঁহার প্রার্থনা কখনও ব্যর্থ হয় না। তুই শীঘ্র চক্রধরপুর ছাড়িয়া তাঁর নিকট চলিয়া যা।

মুরলা আবার কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দেখিলেন, স্বামীর মূর্ত্তি বিমান-পথে উত্থিত হইতেছে। তিনি ভক্তির সহিত স্বামীকে প্রণাম করিলেন এবং ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, পতিতপাবন, আমি পাপে ডুবিয়া আজ তোমার আশ্রয় লইতেছি; আমাকে উদ্ধার কর। তুমি ভিন্ন আমার যে আর আশ্রয় নাই। যুগে যুগে কত পাপীকে উদ্ধার করেছ, আমাকে উদ্ধার করে তোমার নামের মহিমা এই কলিযুগে প্রচার কর।

ইহা স্বপ্নের অবস্থা। কিন্তু সে রাত্রেই মুরলা বুঝিলেন, ইহা স্বপ্ন নয়, ইহা প্রকৃত বিশ্বাসের অবস্থা। প্রতিজ্ঞা করিলেন, স্বামীর কথা প্রাণপণে পালন করিব। সকল সুখ, সকল আসক্তিকে সেই গভীর অমাবস্যার রজনীতে বিসর্জ্জন দিলেন। বকুল তলা তাহার বাল্য ক্রীড়াভূমি, আজ স্বর্গের সোপান। তিনি একে একে সকল বাসনাকে বিসর্জ্জন দিলেন। আর সে রূপের চাঞ্চল্য নাই, আর সে বেশে বিলাস চিহ্ন নাই, আর সে বিলোল কটাক্ষ নাই, সে মূর্ত্তি আজ ভক্তি বিশ্বাসে গদগদ। মুরলার পূর্ব্বের বেশ, পূর্ব্বের মূর্ত্তি আবার ফিরিল। পরদিন মুরলার সে পবিত্র কান্তি দেখিয়া অনেক লোক মুরলাকে মনে মনে প্রণাম করিল। পাষণ্ড ছাত্র সে মূর্ত্তি দেখিয়া লজ্জায় অবনত হইল। তার পর দিন মুরলা পিতার সকল ব্যবহার ভুলিয়া ভক্তির সহিত তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। পরে কি হইল, প্রথম খণ্ডে বিবৃত করিয়াছি। এই পাষণ্ড-ছাত্র দরিদ্রপুরের সুপ্রসন্ন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ধার্ম্মিকদিগের চক্রান্ত!

অরবিন্দ দস্যুকে অপদস্থ করিতে কতিপয় ব্রাহ্ম আজ উন্মত্ত। কিন্তু কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কোন কথা বলিতে সাহসী হন না, তাঁহারা গোপনে গোপনে ভীরু কাপুরুষের ন্যায় অরবিন্দের নিন্দা করিয়া বেড়ান। অরবিন্দের দুই দশ জন হৃদয়ের বন্ধু ছিল, তাঁহাদিগের নিকট মিথ্যা কুৎসা

বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের মন ভাঙ্গিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা হইয়াছে। সমাজের কমিটী সমূহ হইতে নাম তুলিয়া দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। অরবিন্দকে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে অপমানিত করা হইয়াছে। তার পর এই নিয়ম হইয়াছে, যে অরবিন্দকে নিমন্ত্রণ করিবে, সে একঘরে হইবে। অরবিন্দের পত্রিকার গ্রাহক এবং লেখক চটাইতেও অনেক চেষ্টা হইয়াছে। এখন এরূপ হইয়াছে যে, ঘোর বিপদেও কোন লোক অরবিন্দের বাড়ী ঘেঁসে না। কিন্তু ইহাতেও যখন অরবিন্দ দমিলেন না, তখন কতিপয় ব্রাহ্মের বড়ই অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইল। গোবিন্দ বাবু অরবিন্দের নামে লাইবেল আনয়ন করিবার জন্য মাতিয়া উঠিলেন। তিনি একদিন একটা বড় সভা আহ্বান করিলেন। সভায় নব ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অধিকাংশ গণ্য মান্য লোক উপস্থিত। ডাক্তার, বারিষ্টার, উকীল, কেরাণী, শিক্ষক, ছাত্র, গুরু, চেলা, অনেকেই আজ উপস্থিত। সর্ব্ব সম্মতিতে মিঃ গজপতি রায় আজ সভাপতি হইয়াছেন। যথাসময়ে তিনি প্রার্থনা পূর্ব্বক সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন এবং গোবিন্দ বাবুকে সভার উদ্দেশ্য এবং এপর্য্যন্ত যাহা যাহা করা হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিতে বলিলেন।

গোবিন্দ বাবু সকলের করতালির মধ্যে আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সুললিত ভাষায় সুদীর্ঘ এক বক্তৃতা করিলেন! তাঁহার বক্তৃতার সকল কথা লিপিবদ্ধ করা কঠিন। তিনি বলিলেন, ঘরের শত্রুকে দমন করিতে না পারিলে আর ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার হইবে না। ঘরের কথা যে বাহিরে প্রকাশ করে, গোপন রাখে না, তার ন্যায় নরাধম আর কে? (চতুর্দ্দিক্ হইতে আনন্দসূচক করতালি।) ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের সকল লোককেই সতর্ক করা হইয়াছে। যাঁহারা অরবিন্দ নরাধমের পাপপ্রবন্ধ সকল পাঠ করে নাই, প্রবন্ধের দুই চারি পংক্তি দেখাইয়া এবং নানা ভাষায় নানা কথা বুঝাইয়া তাঁহাদিগকেও বিরুদ্ধে দাঁড় করিতে সমর্থ হওয়া গিয়াছে, ইহা অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। এমন অস্পৃশ্য লোকের অস্পৃশ্য পত্রিকাকে সকলেরই পদাঘাত করা উচিত (করতালি ও পদাঘাত)। পূর্ব্বে অরবিন্দের প্রতি অনেক লোকেরই ভাল ভাব ছিল, আজ আমাদের কার্য্যকরী সভার চেষ্টায় অরবিন্দের দুই চারিজন ঘনিষ্ট বন্ধু ভিন্ন সকলেই বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা আজও তাহার অনুকূল আছেন, আশা করা যায়, ভারপ্রাপ্ত বন্ধুদিগের চেষ্টায় তাঁহাদিগের মনও অচিরেই ফিরিবে। গত দুই মাসের মধ্যে এসম্বন্ধে

পাঁচশত পত্র লেখা হইয়াছে। ৩০০ শত লোক অরবিন্দের কাগজ ছাড়িয়াছে। অনেক ব্রাহ্ম লেখকের মন ভাঙ্গিয়াছে বটে, কিন্তু সে জন্য অরবিন্দের বড় ক্ষতি হয় নাই; হিন্দু লেখকদিগের মন এখনও ভাঙ্গে নাই বটে, কিন্তু আশা আছে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের কাহারও কাহারও মন ভাঙ্গিবে। কেননা, দুই তিন জন ধূরন্ধর লোককে অরবিন্দের বিরুদ্ধে লিখিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। অরবিন্দ সকল লেখকদিগকে যে কি করিয়া যাদু করিয়াছে, বুঝি না। লোকটার প্রতি অনেকেই অনুরক্ত। তবে পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, কুলদা বাবু, দেবেন্দ্র বাবু প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, যাহারা অরবিন্দের নিকট অনেক সময় অনেক উপকার পাইয়া প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদিগকে চিরকালের জন্য অরবিন্দের ভালবাসা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। তাঁহারা আর অরবিন্দের পক্ষে যাইবেন না, বলিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহারা অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে নারাজ, তাঁহারা বলেন যে, অরবিন্দের চরিত্রের বিরুদ্ধে আমরা কিছুই জানি না। অরবিন্দ বাড়ীতে ছেলে মেয়ে রেখে ব্যবসা চালাইতেছেন, একথাও তাঁহারা স্বীকার করেন না! তাঁহারা বলেন, বহু লোকের জন্য বহু টাকা অরবিন্দ বাবু ব্যয় করেছেন। তবে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, কেহ অরবিন্দের নিন্দা করিলে তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ করিবেন না। অনেক স্থলে ইহার পরীক্ষাও করা হইয়াছে এবং দেখা গিয়াছে যে, অরবিন্দের যত নিন্দা করুক, ইহারা নির্ব্বাক্ থাকেন। কিন্তু এখনও অনেকের মন ভাঙ্গিতে বাকী আছে। সকলে সাধ্যমতে চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিলে, অচিরে, অরবিন্দের দর্প চূর্ণ হইবে। শুনা যায়, অরবিন্দ কখনও হিন্দুসমাজে যাইবে না, আরো শুনা যায়, সে কখনও দল বাঁধিবে না বা অন্য দলে যোগ দিবে না। ইহা একটা পরম সুযোগ বলিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের সকল লোক বিরুদ্ধে লাগিলে, যাদু দাঁড়াইবেন কোথায়? নববিধান সমাজের লোকেরা অরবিন্দের প্রতি কিছু অনুরক্ত, ইহা দুঃখের বিষয়। তাঁহারা আমাদের শত্রু, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের কাজ করা অসম্ভব। আদি ব্রাহ্মসমাজের রাজনারায়ণ বাবুও অরবিন্দের পক্ষে, তাঁহাকে চটানও কিছু কঠিন। এই সব লোক ভিন্ন, চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিলে, আশা করা যায়, শীঘ্রই এই নরাধমকে বশে আনা যাইবে। লোকটার চরিত্র দূষিত নয়, আমাদের চেষ্টার পক্ষে ইহা একটা দারুণ প্রতিবন্ধক। লোকটার বাড়ীর দুর্ঘটনার কথা বলিলে, লোকেরা বলে, অরবিন্দের নৈতিক চরিত্র কি খারাপ?

লোকেরা আরো বলে, অরবিন্দ যাহাদিগের ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহারা ব্রাহ্মদের সহানুভূতি পাইয়া আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে। দোষ অরবিন্দের না সমাজের অন্যান্য লোকের, এ এক মহা সমস্যা। একবার লোকটার পদস্খলন হয়, তবেই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। বিধাতার নিকট সে জন্য আমাদের সমবেত প্রার্থনার প্রয়োজন। তাহার নামে মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া দেখা গিয়াছে, লোকে তাহা বিশ্বাস করে না। একবার লোকটাকে পাকে ফেলিতে পারিলে, জয় বিধাতা বলিয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ করিব। লোকটার বেয়াদবি দেখ ত! জ্ঞানদা বাবু, উপেন্দ্র বাবু, সুরেশ বাবু, মিঃ সেন, মিঃ সান্যাল, সকলের সম্বন্ধেই নরাধম কলম চালাইয়াছে! এই সামান্য দরিদ্র লোকটাকে আমরা এত বড় বড় লোক সম্মিলিত হইয়াও জব্দ করিতে পারিব না? কমিটী হইতে নাম খারিজ করার যে কথা হয়েছিল, তাহা হইল না, সে কল কার্য্যকরী হয় নাই। তাহার প্রয়োজনও হইবে না, সে নিজেই সকল সম্বন্ধ ছাড়িয়াছে। লোকটাকে প্রহার করিবার জন্য চেষ্টা করা হইল, কেহ অগ্রসর হইতে চায় না। সকলেই লজ্জায় মুখ নত করে। সুরেন্দ্র বাবু দুইজন বন্ধু লইয়া একদিন তাহার বাড়ী গিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক করিয়াও অরবিন্দকে রাগান্বিত করা গেল না। পাড়া হইতে উঠাইবার কোন উপায় নাই। সুতরাং জব্দ করারও আর কোন উপায় দেখি না। পাড়া হইতে উঠাইতে পারিলে সকল দিক্ বজায় থাকিত, কিন্তু সে যো নাই। লোকটার কিছু টাকা আছে। লোকটার সহোদরেরা ধনী লোক; শুনিতেছি, এখন তাহারা অরবিন্দের খুব পক্ষপাতী। রত্নডোবার জমীদার বাবুকে ঠিক করা হইয়াছে, তিনি প্রাণান্তেও অরবিন্দের কাজে সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু তা হইলে কি হয়, তলে তলে অনেক বড়লোক অরবিন্দের হস্তে আছে, এখন আর উপায় নাই—মোকদ্দমা ভিন্ন আর উপায় নাই। আজ সকলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন, অচিরে পুলিসে মোকদ্দমা রুজু করা হউক। এই জন্যই অদ্যকার সভা আহ্বান করা হইয়াছে। এখন আপনারা সকলে সভার কার্য্যারম্ভ করুন। আমি বক্তৃতা করিতে জানি না, আমার ত্রুটি আপনারা লইবেন না।" (চতুর্দ্দিক্ হইতে সানন্দ করতালি)।

সমাজের একজন প্রাচীন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি তৎপর দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আপনাদের এ সকল কাজ হিংসামূলক। কিছু বলিবার থাকে,

তাহাকে ডাকিয়া বলুন, এরূপ করিয়া ষড়যন্ত্র করিলে আর কি কোন লোক ব্রাহ্মসমাজে আসিবে? আমি অরবিন্দের সকল কাজের অনুমোদন করি না, কিন্তু অরবিন্দের ন্যায় কটা লোক ব্রাহ্মসমাজে আছে? এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ, এমন সহৃদয়, এমন পরদুঃখকাতর, এমন জিতেন্দ্রিয়, এমন স্বার্থত্যাগী, এমন বিলাসিতা-হীন ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজে আর কটী আছে, জানিনা। এই লোকটাকে বধ করিতে ধর্ম্মসমাজ আজ উল্লসিত, এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। অরবিন্দ পরের উপকার করে, তোমাদের তাহাও সহ্য হয় না। সে বাড়ীতে অনাথ বালক বালিকাদিগকে রাখে, তোমরা বল, সে ব্যবসা চালায়! জান না কি, সে অনেক স্থলে টাকা নেয় না। আমি যতদূর জানি, অরবিন্দ ভীত হইবার লোক নয়। সত্য কথা বলিয়া বা লিখিয়া কে কবে ভীত হইয়াছে? আপনারা নিজেরা দুর্ব্বলচিত্ত, রিপুসংযম করিতে অক্ষম, আপনারা আবার সত্যবাদীকে জব্দ করিবেন? ঔষধ কি এই? নিজেরা ভাল হউন না কেন, অরবিন্দ আপনি লজ্জিত হইবে। এক সময়ে সমস্ত হিন্দু-সমাজটা এই যুবকের বিরুদ্ধে লাগিয়াও ভয় দেখাইয়া ইঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট বা ইহার কোনই অনিষ্ট করিতে পারে নাই, আর আপনারা একমুষ্টি লোক এই সাধু যুবাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিবেন? ভালবাসা ভিন্ন এ জগতে কাহাকেও কি কেহ কখনও সংশোধন করিতে পারিয়াছে? ব্রাহ্মসমাজে উৎসব উপাসনা সব বৃথা হইয়াছে, যখন দেখিতেছি, একজন নিরপরাধী ব্যক্তি, কর্ত্তব্যের অনুরোধে সমাজ সম্বন্ধে কিছু অপ্রিয় সত্য ঘোষণা করিয়াছে বলিয়া তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্য এত আয়োজন হইতেছে। জিজ্ঞাসা করি, অরবিন্দ কোন্ কথাটা মিথ্যা লিখিয়াছে? এত ঢাকাঢাকি কেন? বিধাতা কি নাই? অরবিন্দের প্রতি যেরূপ অবিচার হইতেছে, আমার বিশ্বাস, এইরূপ পাপে পাপে ব্রাহ্মসমাজ ছারখার হইয়া যাইবে। এরূপ বিশ্বাসী সাধুর বিরুদ্ধে এরূপ ষড়যন্ত্রের কি সুফল ফলিবে, আপনারা মনে করিতেছেন? মোকদ্দমা কি টিকিবে? অরবিন্দের বিরুদ্ধে কে সাক্ষী দিবে? যাহাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল একসঙ্গে ছিল, তাহারা কেহ অরবিন্দের নিন্দা করে না। অরবিন্দের সাহায্যে লালিত পালিত হইয়া যে সকল ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা এখন সমাজে পদস্থ, তাহাদের কেহ কখনও ইহার চরিত্রের দোষ দেখে নাই। এমন চরিত্রবান ব্যক্তি, সরল বিশ্বাসে সমাজের মঙ্গলের জন্য লিখিয়াছে, এ কথা উত্তরে বলিলে কি শাস্তি পাইবে? আর শাস্তি পাইলেই বা কি? অরবিন্দ

তাতেই কি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবে? অরবিন্দের কাগজ উঠাইয়া দিতে অনেক চেষ্টা হইয়াছে। অনেক অবৈধ উপায়ে, কোন প্রবন্ধের এক পংক্তি, কোন প্রবন্ধের দুই পংক্তি শুনাইয়া অনেক সরল ব্যক্তিকে ইহার প্রতি বিরক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সকল কি অবৈধ উপায় নয়? আচ্ছা, ধরিলাম, নয় অরবিন্দের পত্রিকা উঠিয়া গেল, তাতেই কি সে ফিরিবে? তার লেখনীকে কে থামাইবে? সে যে সিংহের তনয়। যে যুবক মরিতে ভয় করে না, এক সময়ে বিধাতার নামে অনাহারে থাকিয়া যে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াছে, তাহাকে অপদস্থ করিতে কে সমর্থ? আমি দেখিতেছি, এই আন্দোলনে সে বীর বলিয়া অভিহিত হইতে চলিল। সে যাহাদিগের উপকার করিয়াছে, এই সভার মধ্যে দেখিতেছি, তাহাদেরও অনেক ব্যক্তি আছে। তাহারা অকৃতজ্ঞ, যাহারা উপকারী বন্ধুর বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করে। কাহারও সাহস থাকে, অরবিন্দকে ডাকিয়া তাহার দোষ দেখাও। অরবিন্দ বিশ্বাসী ব্যক্তি, তাহার বিরুদ্ধে গোপনে কাপুরুষের ন্যায় যে যে লাগিয়াছে, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহাদের মঙ্গল হইবে না। এই রূপ করিয়াই সদাশয় পরোপকারী ব্যক্তিদিগকে উদাসীন করিয়া দেওয়া হয়। আমি এরূপ সভা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। যাহারা ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া চুল পাকাইয়াছেন, হায়, দেখিতেছি, এই যুবকের বিরুদ্ধে তাহারাও হিংসার খড়্গ তুলিয়াছেন। সমাজ মন্দিরে আর কেহ উপাসনা করিতে যাইওনা, ভাইকে যে ভালবাসিতে না পারে, তাহার আবার উপাসনায় অধিকার কিসের? শত্রু-কেও যে আলিঙ্গন করিতে না পারে, তাহার আবার ধর্ম্ম কি? অরবিন্দ কর্ত্তব্যের অনুরোধে যাহা করিতেছে, তাহার সহায় ভগবান; আর তোমরা হিংসার তাড়নায় যাহা করিতেছ, তাহার সহায় অসুরবৃন্দ। বিধাতা যাহার সহায়, তাহাকে কে বধ করিবে? এত সাধ্য তোমাদের? তা কখনও পারিবে না। বিধাতা অবশ্যই তোমাদের সকলের অহঙ্কার ও দর্পকে চূর্ণ করিবেন।"

বলিতে বলিতে বক্তার মুখ রক্তবর্ণ হইল, বাক্য বন্ধ হইয়া আসিল। তিনি আর কিছু না বলিয়া বীরদর্পে সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই বক্তৃতার পর সভার অনেকের মধ্যে কিছু ভাবান্তর, কিছু মতান্তর উপস্থিত হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল। কোন কোন ব্যক্তি এই ব্যক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, কেহ বা অরবিন্দের

সহিত তাঁহাকেও সমালোচনার বাজারে তুলিয়া স্বীয় স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করিলেন। সাহেব-ব্রাহ্মমহোদয়েরা বড় লোক, খুব ধনী, তাঁহারা এই ব্যক্তির প্রতি ভয়ানক চটিয়া গেলেন;—কেহ কেহ ফুসফাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভারি ত উপদেষ্টা, মাসিক সাহায্যের টাকা দু'দিন পাইতে বিলম্ব হইলে চটিয়া লাল হন, তিনি আবার হিংসা ও ক্রোধের বিরুদ্ধে বলিতে আসেন!" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া অনেক কথা বার্ত্তা হইল, কিন্তু সে সকল লিপিবদ্ধ করিয়া কাজ কি? মিঃ রায় সভার অবস্থার বেগতিক দেখিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। গোপনে যে সকল কথা হইল, তাহার মধ্যে এই কয়েকটী কথা উল্লেখ-যোগ্য।

১। কেহ বলিলেন, অরবিন্দের বাড়ীতে বেশ্যার মেয়ে থাকে, এই কথাটা খুব ঘোষণা করা যাউক। এ কথা শুনিলে কে না চটিয়া থাকিতে পারিবে?

২। কেহ বলিলেন, শুনিয়াছি, অরবিন্দের স্ত্রীর ভগ্নীর চরিত্র খারাপ, তাহাকে বরিশাল হইতে আনিয়া অরবিন্দের ঘাড়ে চাপাইয়া জব্দ করা যাউক। এজন্য অচিরে বরিশালের ব্রাহ্মজমীদার তিলক বাবুর নিকট পত্র লেখা হউক।

৩। পাড়া হইতে উঠাইবার জন্য বিশ্বম্ভর বাবুর প্রতি পুনঃ ভারার্পণ করা যাউক। এবং কোথাও নিমন্ত্রণ ইত্যাদি না হয়, তজ্জন্য ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করা হউক।

৪। গোপনে গোপনে মোকদ্দমার জন্য চেষ্টা করা হউক।

৫। নানা পত্রিকায় ইহার সম্পাদিত পত্রিকা ও পুস্তকাদির নিন্দা ঘোষণা করিয়া প্রবন্ধ লেখা হউক।

৬। রত্নডোবা গ্রামের জমীদার অরবিন্দের বিশেষ বন্ধু, তাঁহার মন ভাঙ্গিতে দশ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হউক।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মর্ম্মভেদী সংবাদ।

১২৯১ সাল, শ্রাবণ মাস, এখনও রাত্রির অন্ধকার ঘুচে নাই। মহা-ঊষার বালারুণ এখনও আপন রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। পাখী ডাকিয়া ডাকিয়া নীরব হইতেছে, আবার ডাকিতেছে। গৃহস্থগণ এখনও জাগরিত হয় নাই, কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর মেথর ও ময়লা ফেলার গাড়োয়ান শ্রেণী রাস্তায় বাহির হইয়াছে, কিন্তু রাস্তার ঝাড়ুদার এখনও ধূলা উড়াইয়া প্রাতঃভ্রমণে বাধা জন্মাইতে আরম্ভ করে নাই। এমন সময়ে অরবিন্দের বাড়ীর নিকট একখানি গাড়ী উপস্থিত। অরবিন্দ তখন উপাসনা করিতেছেন, বাড়ীর ভৃত্যেরা উঠে নাই। গাড়ী হইতে একটী স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষ আসিয়া দরজায় আঘাত করিয়া বলিলেন, "ঘরে কে আছ, দরজা খোল।" চাকরেরা শশব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিল। পুরুষটী রমণীকে লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। এই রমণী মুরলা।

এত সাধের কলিকাতা, এত সাধের ব্রাহ্মসমাজ, এত সাধের চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে মুরলা আজ পদার্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার জীবন আজ নূতন। দেব লোকের দেবধামে উপস্থিত হওয়া মাত্র মুরলার মন যেন কি এক আশ্চর্য্য স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইল। জগন্নাথের মন্দিরের নীলচক্র দেখিয়া পথশ্রান্ত পথিকের যেরূপ আনন্দ হয়, সংসার-পাপ-দগ্ধ মুরলার মনে আজ সেইরূপ আনন্দ উপস্থিত হইল। মুরলা ভাবিলেন, এখনই যদি মৃত্যু হয়, জীবনের আর কোন বাসনা অবশিষ্ট থাকে না।

ক্রমে ক্রমে বাড়ীর সকলে জাগরিত হইলেন। ক্রমে পাড়ার সব লোক জাগিল। অশোকা ছুটিয়া আসিয়া মুরলার হাত ধরিলেন। মুরলা বলিলেন, তুইও আমাকে ভুলেছিলি? জানিস্‌নে যে আমার আর এ সংসারে কেহ নাই?—এ কথা বলিবার সময় আনন্দ এবং দুঃখ যুগপৎ

মুরলার মনে উপস্থিত হইয়াছিল। মুরলার চক্ষু হইতে হর্ষবিষাদ-মিশ্রিত অশ্রু বিগলিত হইতেছিল। সেই প্রেম-প্লাবিত অশ্রুতে স্বর্গের আভাস পাওয়া যাইতেছিল।

অশোকা বলিলেন, তোর জন্য আমার আহার নিদ্রা নাই। তোর কাছে কত পত্র লিখেছি, কিন্তু উমেশের নিকট শুনেছি, তুই একখানও পাস্‌নি। তুই না বলিলে আমি তোকে রাখিয়া কখনও কলিকাতা আসিতাম না। আমার স্বামী পুত্র সকল অপেক্ষা তুই অধিক প্রিয়। মুলি, তুই তা কি বুঝিবি!

মুরলা বলিলেন, আমি তা জানি। দেখ্ দিদি, চৌধুরী মহাশয় কি আমার উপর রাগ করেছেন? আমি তার নিকট বড় অপরাধী। তিনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?

অশোকা বলিলেন, সে সকল কথা পরে হবে। ঐ দেখ্ তিনি আসিতেছেন।

উমেশ ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতা আসিয়াছিল, এতদিন পর তাহার বাসনা পূর্ণ হইল দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিতেছে না। আজ বাড়ীর সকলের মনেই আনন্দ।

উপাসনা শেষ করিয়া অরবিন্দ বাবু প্রেমগঠিত গম্ভীর মূর্ত্তিতে নীচে আসিলেন। মুরলাকে দেখিয়া হৃদয়ে অলক্ষিতভাবে একটু আনন্দ উপস্থিত হইল। মুরলার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, আপনি কলিকাতা আসিবেন না, স্থির ছিল, আবার আসিলেন কেন?

মুরলা শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে মস্তক অবনত করিয়া অরবিন্দকে প্রণাম করিলেন। কোন কথা বলিলেন না।

অরবিন্দ পুনঃ বলিলেন, আপনি আমাকে এবার যেরূপ অপমান করিয়াছেন, এরূপ এ পৃথিবীতে আর কেহ কখনও করে নাই। ভালবাসার এ উপযুক্ত পুরস্কারই বটে! আমি আপনাকে ভালবাসিয়া কি অন্যায় কাজই করিয়াছিলাম যে, তিলক বাবুর বৈঠকখানায় আমাকে বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিয়া স্ত্রীজনোচিত মহত্ত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই কথা বলিতে বলিতে ভাবোচ্ছ্বাস এত বৃদ্ধি হইল যে, অরবিন্দ আর প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মুরলা বুঝিলেন, তিনি অরবিন্দের প্রাণে কি আঘাতই করেছেন!

মুরলা কোন কথা বলিলেন না। অশোকা মুরলার হাত ধরিয়া উপরের

ঘরে লইয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে অরবিন্দ আপন কাজে মনোনিবেশ করিলেন।

সমস্ত দিন নানাকাজের ভিড়ে সময় কাটিয়া গেল। অরবিন্দের মনটা আজ কিছু ভারি ভারি বোধ হইতেছে। মনের কথাগুলি সমস্ত না নামাইতে পারিলে মনটা পাত্‌লা হয় না। সন্ধ্যার পর অরবিন্দ অন্যান্য কাজ শেষ করিয়া এবং অন্যান্য বন্ধুদিগের নিকট বিদায় লইয়া উপরের ঘরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অশোকা এবং মুরলা উভয়ই ছিলেন।

মুরলা অরবিন্দকে দেখিয়া একটু শশব্যস্ত হইয়া, একটু ঘোমটা ঠিক করিয়া বসিলেন। অশোকা বলিলেন, আজ যে এত সকাল সকাল উপরে আসিয়াছ?

অরবিন্দ মুখ ভার করিয়া বলিলেন, তোমাকে দেখিবার জন্য আসি নাই, মুরলার সহিত কথা আছে।

এমন কঠোর নীতিজ্ঞ কে কোথায় দেখিয়াছে, ঠাট্টাও বুঝে না; অশোকা মনে মনে এই কথা ভাবিয়া উত্তর দিলেন, আমি উঠিয়া যাইব কি?

অরবিন্দ একথার উত্তর দেওয়ার আর আবশ্যকতা মনে করিলেন না। মনের মধ্যে যে সকল ভাব ও কথা উথলিয়া উঠিতেছিল, তাহাই আরম্ভ করিলেন; মুরলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—আমার ধারণা ছিল, আপনি আমাকে খুব ভালবাসেন। আরো ধারণা ছিল, ধর্ম্মের প্রতি আপনার গভীর অনুরাগ; কিন্তু এবার আপনার আচরণে আমার সে ভ্রম ঘুচিয়াছে। আপনি আমাকে ভালবাসিলে কখনও অপমানিত করিয়া বিদায় দিতে পারিতেন না।

মুরলা দেখিলেন, আবার সেই প্রাতের কথা। বুঝিলেন, চৌধুরী মহাশয়ের মনে এ ভাব এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সহসা উত্তোলন করা কঠিন। যাহা কঠিন, সে বিষয়ে চেষ্টা করিয়াই বা কাজ কি, সময়ে এ ভাব নাও থাকিতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া মুরলা কোন কথার উত্তর করিলেন না।

মুরলার উত্তর না পাইয়া অরবিন্দ বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, আমার কথার উত্তর দেওয়া আপনি বুঝি আবশ্যক মনে করিতেছেন না? আপনার চরিত্রের প্রতি এই কয়েকটী কারণে আমার গভীর সন্দেহ জন্মিয়াছে। আপনাকে তাহা না বলিয়া পারিলাম না। প্রথমতঃ, সুপ্রসন্ন যখন ব্রাহ্ম-

দের নৌকায় আপনাকে তুলিয়া দিল না, তখন আপনি জলে ডুবিয়া মরিলেন না কেন? দ্বিতীয়তঃ, বরিশালের বাসায় সুপ্রসন্ন আপনার অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহসী হইল কিরূপে? আপনার চরিত্রের বিকার না জন্মিলে সে কি আপনার হাত ধরিয়া টানাটানি করিত? তৃতীয়তঃ, আপনি পুলিসের এজাহারে সুপ্রসন্নের অপরাধ অস্বীকার করিয়া তাহাকে বাঁচাইলেন কেন? চতুর্থতঃ, আমার সহিত আসিলেন না কেন? এই ৪টী কারণই আপনার চরিত্রের কলঙ্কের আভাষ দেয়। বরিশালে চক্রধরপুরের লোকেরা, কি ব্রাহ্মেরা আপনার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা না বলিলেও, আমার মনে এই সকল কারণে গভীর সন্দেহ হইয়াছে। হিন্দুসমাজের লোকেরা আপনার নামে যে সকল অশ্রাব্য কুৎসা রটনা করিয়াছে, সে গুলিকে সত্য বলিয়া মনে করি না। ব্রাহ্মসমাজে কোন যুবতী উপস্থিত হইলেই তাহার ভাগ্যে এরূপ ঘটে। মেয়েদের প্রতি আমাদের দেশের লোকের এমনই ভাব, কেহই তাহাদের ব্যবহার ভাল ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। আমি নিন্দুকদের কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু উপরোক্ত কারণ সকলে আমার মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য আছে, শুনিতে চাই।

মুরলা নীরবে রহিলেন, কোন কথাই বলিলেন না। অরবিন্দ বুঝিলেন, মুরলা কাঁদিতেছেন। বলিলেন, আপনি বলুন আর না বলুন, একদিন আমার হাতে ধরা পড়িতেই হইবে। আমার হাত এড়ান খুব সোঁজা মনে করিবেন না।

অশোকা বলিলেন, তুমি বড়ই সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত লোক। এত দিন পর মুরলা তোমার বাড়ীতে এসেছে, তুমি কত ভাল ব্যবহার করিবে, না কঠোর পরীক্ষায় ফেলিতেছ! তুমি কি মনে কর, মুরলা কলঙ্কিনী? তোমার এ বেয়াদবি ভাল নয়। আমার বোন্ বলিয়া তুমি এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিতেছ, নচেৎ কখনও এরূপ করিতে না।

অরবিন্দ ধীর ভাবে বলিলেন, অশোকা, তুমি ছেলে মানুষ, কিছুই বুঝ না। আমার মনের সন্দেহ না ঘুচিলে, আমার পক্ষে অন্যরূপ ব্যবহার করা বড়ই কঠিন। তুমি জান ত, আমি কখনই কাহারও সহিত কপট ব্যবহার করিতে পারি না। মুরলার সহিত এখন আমার কি সম্বন্ধ, সেটা ত বুঝিয়া লইতে হইবে? মুরলাকে আমি ভালবাসি, তাই বলিয়া আমার

ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য জ্ঞান ত ডুবাইতে পারি না। মুরলাকে ভালবাসি বলিয়া তাহার অপরাধ ত সহসা ভুলিতে পারি না। তুমি আছ, মুরলার প্রতি ভাল ব্যবহার কর। আমার মনের সন্দেহ না ঘুচিলে আমার পক্ষে অন্যরূপ ব্যবহার কখনও প্রত্যাশা করিও না।

এরূপ তিক্ত কথার পর অশোকা স্বামীর সহিত খুব ঝগড়া করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মুরলার ন্যায় মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। এই বিশ্বাসের বলে অরবিন্দকে অনেক কটু কথা বলিলেন, অরবিন্দ সে সকল কথার আর উত্তর প্রতি-উত্তর দিলেন না; সে দিনের মত উঠিয়া গেলেন।

অরবিন্দ উঠিয়া গেলেন পরে, অশোকা, গভীর মর্ম্ম বেদনায়, স্বামীর অনেক নিন্দা করিলেন। এরূপ করা তাঁহার স্বভাব ছিল। অশোকার প্রধান দোষ এই ছিল, স্বামী তাহার মনের মত না চলিলেই তাঁহার নিন্দা করিতেন। কোন্ দিন অরবিন্দ তাঁহার প্রতি কি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, আজ সে সকল একে একে উল্লেখ করিয়া স্বামীর নিন্দা করিতে লাগিলেন। মুরলা তাহাতে বড়ই প্রাণে বেদনা পাইলেন। তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না; ধীর ভাবে বলিলেন—"দিদি, এ তোমার কি স্বভাব? আজ তুমি আমার নিকট তোমার স্বামীর নিন্দা করিতেছ, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু এরূপ নিন্দা তুমি যার তার নিকট করিয়া থাক, আমি শুনিয়াছি। বরিশালের লোকেরা বলে "আপনার চৌধুরী মহাশয় যদি ভাল লোকই হইবেন, তবে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার নিন্দা করেন কেন? তখন তাহাদের কথা অগ্রাহ্য করেছি, আজ বুঝিলাম, তুমি তাঁর এরূপ নিন্দা আরো করেছ। ছি, স্বামীর নিন্দার চেয়ে আর কি ঘৃণিত কাজ আছে? তুমি জান না, তোমার স্বামী দেবতা। আমি তাঁহার পবিত্র মুখের দিকে তাকাইলে সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা ভুলিয়া যাই। তুমি জান না কি যে, তিনি দেবতা?"

অশোকা এ কথা শুনিয়া লজ্জিতা হইলেন না, আরো উষ্ণ হইয়া আরো নিন্দা করিলেন। বলিলেন, দেবতা কেমন, তাহা ত আজই বুঝেছিস্?

মুরলা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, এক হাতে দিদির মুখ চাপিয়া ধরিলেন এবং আর হাতে পা ধরিয়া বলিলেন—"দিদি তোর পায়ে ধরি, ক্ষমা কর। দেবতার প্রতি আমার মন চটাইয়া দিস্ নে, জানি-

স্নে কি যে, আমার আর কেহ নাই? যাঁহাকে আমি দেবতার ন্যায় জ্ঞান করি, তাঁহার নিন্দা শুনিলে আমি অস্থির হই। বরিশালে তাঁহার নিন্দা শুনিয়া থাকিতে পারি নাই, তোর আশ্রয়ে এসিছি, তুই যদি এরূপ করিস্, আমি বিষ খেয়ে মরিব।

অশোকা পুনঃ উত্তেজিত ভাষায় বলিলেন, আর দেবতা দেবতা করিয়া অস্থির হস্নে। কেমন দেবতা, আমি তা জানি।

মুরলা আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া আকুল হইলেন এবং অশোকার দুই পা ধরিয়া বলিলেন, দিদি ক্ষান্ত হ। রত্ন চিন্‌লিনে, এই ক্ষোভ রহিল। স্বামীর নিন্দার ন্যায় ঘৃণিত কাজ আর নাই, পায়ে ধরি, ক্ষান্ত হ। যদি তোর স্বামী নরকের কীটও হন, তোর সে কথা বলার অধিকার নাই। স্ত্রীর কাজ কেবল পতিসেবা। স্ত্রীর কাজ কেবল পতির আনুগত্য। সীতার কথা মনে কর্, সতীর কথা মনে কর্। হেলায় যে রত্নকে তুচ্ছ করে, তার আর গত্যন্তর নাই। পায়ে ধরি, ক্ষান্ত হ।

অশোকা পুনঃ বলিলেন, তোর জন্যই ত আমার এই কষ্ট।

মুরলা। তোর পায়ে ধরি, আমার জন্য দেবতার নিন্দা করিস্নে। আমি সত্যই পাপে ডুবিয়াছি। তুই ক্ষান্ত হ।

অশোকা মুরলার সে বিনয়, কাকুতি মিনতি, সে স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া মোহিতা হইলেন। শেষে বলিলেন, তোর জন্য আজ ক্ষান্ত হলেম।

মুরলা বলিলেন, আমার জন্য? তোর স্বামী আছেন, তাই তুই জানিস্নে, স্বামী কি অমূল্য জিনিস্? আমার ন্যায় হ'লে তবে বুঝ্‌তে পার্‌তিস্, স্বামীনিন্দা কিরূপ বিষ। অভাব না হলে মানুষ কিছুরই মর্য্যাদা বুঝে না। তোর দোষ কি, দোষ বিধাতার।

অশোকা আর কোন কথাই বলিলেন না।

সেই দিন হইতে ৩।৪ দিন অরবিন্দ আর ভাল ভাবে কাহারও সহিত আলাপ করিতে পারিলেন না; পঞ্চম দিনে মুরলার নামে একখানি পোষ্টকার্ড ডাকে আসিল। পারিবারিক নিয়মানুসারে সমস্ত পত্র অরবিন্দের হাত দিয়া যাওয়ার কথা। এ পত্রও অরবিন্দের নিকট উপস্থিত হইল। অরবিন্দের মনে দারুণ সন্দেহ, তিনি পোষ্টকার্ড খানি পড়িলেন, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—"তুমি পত্র লিখিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছ কেন? 'তোমার সহিত আমার আর কোন সংশ্রব থাকিবে

না,—কখনও আমাকে পত্র লিখিও না' এ কথা লিখিয়াছ কেন? আমি যে তোমার জন্য পাগল। পত্র লিখিও। আমি কলিকাতা আসিতেছি। তুমি ক্যাম্বেল স্কুলে ভর্ত্তি হও, অরবিন্দ বাবু পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি, তাঁহার আশ্রয়ে তুমি বেশ থাকিবে।—তোমারই সুপ্রসন্ন।"

পত্র পড়িয়া অরবিন্দ ভাবিলেন, কেমন করিয়া মুরলা পত্র লিখিলেন? বাড়ীর নিয়ম, সকল পত্র তাহার হাত দিয়া যাইবে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, বাড়ীর চাকর ভুল করিয়া পত্র না দেখাইয়া ডাকে দিয়াছিল। অরবিন্দ চাকরের দুই টাকা জরিমানা করিলেন। তখনই এই পত্র অশোকাকে দেখাইলেন, পত্র দেখিয়া অশোকার চক্ষু স্থির হইল। স্বামীর সহিত বৃথা ঝগড়া করিয়াছি ভাবিয়া বড়ই দুঃখ হইল। মুরলার চরিত্র দূষিত, ইহা ভাবিতে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মুখে আর কথা সরিতেছে না। অরবিন্দ পত্রখানি মুরলাকে দেখাইতে বলিলেন, এবং তিনি কি বলেন, জানাইতে আদেশ করিলেন। অশোকা পত্রখানি মুরলাকে দেখাইলেন। মুরলা দিদির নিকট অকপটচিত্তে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন দিদি, "আমি পাপে ডুবিয়াছি, রক্ষা পাইবার জন্য তোর আশ্রয়ে আসিয়াছি। এ পৃথিবীতে আমার আর কেহই নাই। তোরা কি আমাকে আশ্রয় দিবি নে? আমাকে কি রাস্তায় দাঁড়াইতে হইবে?" মুরলার দুনয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল।

অশোকার প্রাণ আজ কিরূপ হইয়াছে, আমরা লিখিতে অক্ষম। অশোকা ভাবিতেছেন, এ সকল ঘটনা জানিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে আমি রক্ষা পাইতাম। অশোকা, মুরলার কথার আর কোন উত্তর দিলেন না; স্বামীর নিকট গমন করিয়া সকল কথা বলিলেন। অশোকা স্বামীর নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা চাহিলেন। কি করা উচিত, এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। অশোকা জানিতেন, অরবিন্দ দয়ার সাগর, তিনি কখনও মুরলাকে ভাসাইয়া দিবেন না।

অরবিন্দ তারপর মুরলাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিলেন, আপনি আমার ছোট ভ্রাতার স্ত্রী, আজ চরিত্র হারাইয়া আমার আশ্রয়ে আসিয়াছেন, ভাবিয়া আমি আকুল হইয়াছি। আপনি আমাদের কুলের মুখ উজ্জ্বল করিবেন, বড়ই আশা ছিল। আপনার ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া একদিন ভাবিয়া-

ছিলাম, আপনি রমণীকুলের সম্মান শতগুণে বাড়াইবেন, হায়, আজ আপনি পতিতা, এ দুঃখ আমি কোথায় রাখিব? মানুষের চরিত্র ভিন্ন আর কি অমূল্য বস্তু আছে? যে চরিত্র হারায়, সে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকে কেন? মৃত্যুই তাহার পক্ষে শ্রেয়। আপনি আমার প্রাণে দারুণ আঘাত করিয়াছেন। আমি পৃথিবীতে, অল্প লোককেই আপনার ন্যায় প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। আমার ভালবাসার পুরস্কার কি এই? বলিতে বলিতে অরবিন্দের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। অশোকা এবং মুরলাও সেই সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পর অরবিন্দ আবার বলিতে লাগিলেন,—আপনারই বা কি অপরাধ? দেশের মুখে, সমাজের মুখে ছাই পড়ুক। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় কে ভাল থাকিতে পারে? চতুর্দ্দিকে দস্যুর দল, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা দেশের আপামর সাধারণকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে! হায়, আপনার পিতা বার বার—৬ বার বিবাহ করিয়াছেন, ভাবিলে আমি স্তম্ভিত হই। কিন্তু আপনার প্রতি আমার অনেক আশা ছিল। এত আশা করা অন্যায় হইয়াছিল, বুঝিতেছি, কিন্তু ভাবিয়াছিলাম, আপনি দেবী। আমার সে বিশ্বাসে আজ ছাই পড়িয়াছে। হায়, আপনার গতি কি হইবে? বলিতে বলিতে আবার অরবিন্দের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। ক্ষণকাল খুব জোরে উচ্ছ্বাস বহিল, তারপর ভাবে গদগদ হইয়া অরবিন্দ প্রার্থনা করিলেন;—"মা জগজ্জননি, তুমি আজ কি দেখাইলে এবং কি শুনাইলে? আমার প্রাণ যে অস্থির হইতেছে; আমার প্রাণে আজ শান্তি দেও। মুরলার কি উপায় হইবে, তুমি বলিয়া দেও। তুমি ত পতিতপাবন, তোমার কোলে কি মুরলা স্থান পাইবে না? দয়াময়ি, দয়া করিয়া ইহাকে চরণে স্থান দাও।"

পরদিন অরবিন্দ মুরলার পিতা ও জেঠার নিকট পত্র লিখিলেন যে, মুরলা কলিকাতা আসিয়াছেন। আরো লিখিলেন যে, "মুরলা চরিত্র হারাইয়া কলিকাতায় আসায় আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। আপনারা শীঘ্র আসিয়া ইহাকে চক্রধরপুর লইয়া যাউন। আমি বিষম বিপদে পড়িয়াছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুতাপান্তে।

তিন দিবস মুরলা শয্যাশায়িনী হইয়া রহিয়াছেন, আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইচ্ছা, এ পৃথিবীতে আর কাহাকেও মুখ দেখাইবেন না। অনুতাপে প্রাণ মন পুড়িয়া খাক্ হইয়া গিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু ফুলিয়া লাল জবা ফুলের ন্যায় হইয়াছে। তৈলাভাবে মস্তকের কেশ আলু থালু হইয়া গিয়াছে। মুরলা, এ পৃথিবীতে থাকিয়াও তিন দিন পৃথিবীর কোন খবরই রাখেন নাই, কেবল অবিরত প্রার্থনা করিতেছেন, "জগজ্জননি, চৌধুরী মহাশয়ের প্রার্থনা পূর্ণ কর, আমাকে ক্ষমা করিয়া চরণে আশ্রয় দেও।"

তিন দিন অরবিন্দও কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না, কি করিবেন? ভাবিতেছেন—"ব্রাহ্মসমাজে আমার আপনার লোক অল্প, অনেকেই পর। সুবিধা পাইলে কেহ আমাকে ছাড়িবে না। ব্রাহ্মসমাজ দিন দিন সঙ্কীর্ণতার পথে যাইতেছে। জাতিভেদ ইহার অস্থিমজ্জা গ্রাস করিতেছে। সমাজের লোকেরা আমাকে কোন বিপদে ফেলিবার জন্য কি চক্রান্ত করিয়া মুরলাকে এখানে পাঠাইয়াছে? তিলক বাবু তখন বলিয়াছিলেন, কিছুতেই মুরলাকে কলিকাতা পাঠাইবেন না, হঠাৎ পাঠাইলেন কেন? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এখন কি করি? মুরলাকে আশ্রয় না দিলে এখনই তাঁহাকে রাস্তায় দাঁড়াইতে হয়, বাজারে ঘর বাঁধিতে হয়। তাহা আমি কখনই পারিব না। যেরূপ দেখিতেছি, মুরলা গত পাপের জন্য বিষম যাতনায় পুড়িতেছেন, এরূপ পতিতা রমণী কি সমাজে স্থান পাইবে না? বিধাতা কি ইহার প্রতি সদয় হইবেন না? তিনি কাহার প্রতি কবে বাম হইয়াছেন? হায়, তিনি সকলেরই; তিনি যখন আমার ন্যায় নরাধমকে অজস্র করুণায় প্রত্যহ প্লাবিত করিতেছেন, তখন তিনি কি কখনও তাঁহার কোন সন্তানকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন? না, তাঁহার প্রকৃতিতে তাহা অসম্ভব। তিনি দুঃখী পাপী সকলেরই। তিনি রাজা প্রজা সকলেরই। মুরলা তাঁহারই। তিনি অবশ্য মুরলাকে রক্ষা করিবেন।" তৃতীয় দিন সন্ধ্যার

পর প্রাঙ্গণের স্ফুট জ্যোৎস্নায় দাড়াইয়া অরবিন্দ অশোকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুরলা কি আজ ভাত খাইয়াছে? অশোকা উত্তর করিলেন, না আজও ভাত খায় নাই, সে বলে, তাহার কলঙ্কিত মুখ আর তোমাকে দেখাইবে না।

অরবিন্দ। তাঁহার সম্বন্ধে তুমি কি ভাবিতেছ?

অশোকা। আমি কাল্ পাড়ার মেয়েদের নিকট শুনিয়াছি, তোমার মস্তকে কলঙ্ক চাপাইবার জন্য কোন কোন ব্রাহ্ম ষড়যন্ত্র করে মুরলাকে শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতা পাঠায়েছে। মুরলা ডুবিয়াছে সত্য, কিন্তু মুরলা মায়ের আশীর্ব্বাদ পাইয়াছে। কোন কোন ব্রাহ্ম তোমার শ্রাদ্ধ করিবে, জানি, কিন্তু মুরলার যে আর কেহ নাই, মুরলাকে তুমি আশ্রয় না দিলে মুরলা কোথায় যাইয়া দাড়াইবে?

অরবিন্দ। বিধাতার মনে কি ইচ্ছা, জানি না; আমার বিশ্বাস, আমার মস্তকে কলঙ্কের ডালি দিয়াও মুরলাকে উদ্ধার করিবেন। মুরলা রক্ষা পাইবে। মুরলা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিবে বলিয়া অনুমান হয়।

অশোকা। তুমি কিরূপে বুঝিলে?

অরবিন্দ। কাল একটা ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, পাষণ্ড সুপ্রসন্ন মুরলার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। দেখিয়াছি, পাষণ্ড আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মুরলাকে হস্তগত করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। মুরলা কিন্তু কিছুতেই টলিতেছেন না। তারপর একদিন সুপ্রসন্ন মুরলাকে লইয়া যাইবার জন্য হাত ধরিয়া টানিতেছে। মুরলা তাহাতেও গেলেন না যখন, দেখিলাম, তখন হতভাগ্য, মুরলাকে খুন্ করিয়া পলায়ন করিতেছে। মুরলার আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তারপর আর কিছুই দেখিলাম না। আমার বোধ হয়, মুরলা ধর্ম্মের জন্য জীবন দিতে পারিবে?

অশোকা। স্বপ্ন কি সত্য হয়?

অরবিন্দ। স্বপ্ন সফল না হয়, এমন নহে; কিন্তু সকল কথা কোন স্বপ্নেরই ঠিক হয় না।

অশোকা। তোমার স্বপ্নের কথা শুনে আমার গা কাঁপিতেছে! মুরলার ভাগ্যে শেষে কি এইরূপই ঘটিবে?

অরবিন্দ। এ জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। খুব খারাপ যাহা, তাহার জন্যই প্রস্তুত হও। মনে কর, মুরলাকে লোকে খুন্ করিয়া সে দোষ আমার ঘাড়ে চাপাইল। তাতেও কি আমার এখন ফেরা উচিত? এ পৃথিবীতে যাঁহার মুখের দিকে চাহিতে আর কেহ নাই, তাঁহার জন্যই আমি জীবন ধারণ করিতেছি। মুরলার পিতাকে পত্র লিখিয়াছি, তিনি গ্রহণ করেন, ভালই; নচেৎ মুরলাকে আশ্রয় দিয়া আমি ফাঁসি কাষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতেও কুণ্ঠিত নই। এখন মুরলার মন জানিতে পারিলে হয়। মুরলা যদি এখানে থাকিতে চান, নিশ্চয় তাঁহাকে আশ্রয় দিব। আমি আশ্রয় না দিলে মুরলাকে রাস্তায় দাঁড়াইতে হইবে। হায়, তাহা কখনও সহিতে পারিব না। পাপী, পাপীকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিবে? আমি নিজে পাপীর শিরোমণি, আমি কখনও মুরলাকে ভাসাইব না। সকল আত্মীয় বন্ধু পরিত্যাগ করিতে হয়, সেও স্বীকার, তবুও আমি তাহা পারিব না। তবে মুরলা যদি এখানে না থাকেন, তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কখনও চলিব না। আমার আশ্রয়ে যে আসিবে, তাহাকে রক্ষা করা আমার কাজ। আমার আশ্রয়ে যে থাকিবে, সর্ব্বস্ব তাহার মঙ্গলের জন্য ঢালিয়া দেওয়া আমার কাজ। আর যে আমার উপর নির্ভর করে না, তাহার জন্য আমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই। মুরলাকে আশ্রয় দিতে বিধাতা ঈঙ্গিত করেছেন। যিনি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করে আমার এখানে এসেছেন, তাঁহার জন্য আমি প্রাণপণ করিব। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মদের চক্রান্ত থাকে, থাকুক, ডরাই না। মুরলা যদি ভাল হইতে চান, আমি তাঁহার জন্য প্রাণ দিব। মুরলাকে ডাক।

অশোকা স্বামীর কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। ভাবিলেন, আমার স্বামী স্বর্গের দেবতা। তারপর মুরলাকে ডাকিয়া আনিলেন।

হায়, মুরলা তিন দিনে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিতা হইয়াছেন। সে রূপ নাই, সে বেশ নাই, সে তেজ নাই, সে শোভা নাই। অনুতাপে পুড়িয়া মুরলা ভস্ম হইয়াছেন। এ যেন নির্ব্বাণপুরের নির্ব্বাণ প্রতিমা, এ যেন প্রেতপুরের দৈত্যনাশিনী শ্মশানকালী,—বিবেকের অসিতে সকল রিপু-দস্যুর মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া মুরলা স্বর্গের দেবীবেশে আজ অবতীর্ণা। আকাশে অষ্টমীর তরল চাঁদ আসিয়া হাসিয়া মুরলার গায়ে স্খলিত অমিয়া-জ্যোৎস্না ঢালিতেছে, তাহাতে সে কান্তি যেন স্বর্গের আভায় ও পবিত্রতায় জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে।

অথবা এ যে কি মূর্ত্তি, ভাষায় ব্যক্ত হয় না। অরবিন্দ পলকহীন দৃষ্টিতে অবাক্ চিত্তে সে মূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। মুরলার সে মূর্ত্তি অরবিন্দের প্রাণে কত কত স্বর্গীয় ভাব জাগাইয়া দিল। অরবিন্দ সে মূর্ত্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। অরবিন্দ ভাবরাজ্যের রাজা, সকল অবস্থা ভুলিয়া সাষ্টাঙ্গে মুরলাকে প্রণাম করিলেন, তারপর বলিলেন, "দেবি, আপনি এখন কি করিবেন? এই পাষণ্ডের গৃহে থাকিবেন কি? না চক্রধরপুর যাইবেন?"

মুরলা সাষ্টাঙ্গে প্রতিপ্রণাম করিয়া বলিলেন, আমি আপনার চরণে শত অপরাধী, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখানেই করিব! যে রক্ত মাংস ধরিয়া আমি মোহবশে আপনার মনে কষ্ট দিয়াছি, এ রক্ত মাংস আপনার চরণে চিরবিক্রীত হইয়াছে। আমি আর যাইব কোথায়? এ ত্রিসংসারে আমার আর স্থান নাই। চক্রধরপুর পাপে ভরা, সেখানে যাইব না, তাঁহারা আমাকে গ্রহণও করিবেন না। আপনিই লক্ষ্য, আপনিই ভরসা, আপনিই আমার উপাস্য, আপনিই আমার সর্ব্বস্ব। রাখেন থাকিব, মারেন মরিব। ব্রাহ্মসমাজ-স্বর্গে আসিয়াছি, আর কোথায় যাইব? এ শরীরকে পোড়াইয়া আমি আপনার চরণে চিতাভস্ম উপহার দিব।

অরবিন্দ মুরলার কথা শুনিয়া মোহিত হইলেন। এ কি মানুষের কথা? ক্ষণকাল ভাবিলেন, তারপর বলিলেন, আমি আপনার সেবার জন্যই আছি। ভয় নাই। মা জগজ্জননী কাহাকেও কখনও পরিত্যাগ করেন নাই—তিনি আপনাকে কোলে স্থান দিয়াছেন। আজ হইতে আপনি এ বাড়ীর এক জন, কিন্তু কথা এই, এ বাড়ীর নিয়ম সকল সর্ব্বপ্রযত্নে প্রতিপালন করিতে হইবে।

মুরলা বলিলেন, আমার স্বাধীন অস্তিত্ব আর রাখিতেছি না। আমি নিজকে নিজে চালাইয়া যাহা হইয়াছি, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত হইবে কি না, জানি না। আমি আর নিজকে চালাইব না। সম্পূর্ণভার আপনার চরণে অর্পণ করিতেছি। আমি আজ হইতে সেবিকা, দাসী,—ভাষায় আর কিছু জানি না। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনি যাহা বলিবেন, অবনত মস্তকে তাহাই করিব। আমার নিকট আপনি দেবতা। আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতেই বাঁচিয়া থাকিব। আপনার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেই জীবনের সকল আশা মিটিবে।

অরবিন্দ তারপর বাড়ীর সমস্ত নিয়ম পাঠ করিয়া শুনাইয়া বলিলেন, আপনাকে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, উত্তর দিন্। আপনার মনে সুপ্রসন্নের প্রতি কোন আসক্তি থাকিলে আমাকে বুঝিতে দিন্।

মুরলা। তাহার প্রতি আমার কোন আসক্তি থাকিলে আপনার এখানে আসিতাম না, তাহার সহিত একদিকে চলিয়া যাইতাম। বিশ্বাস করুন, আমার দ্বারা কখনও আপনাকে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। আমি আপনার মনে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই আসিয়াছি, এই জন্যই রহিলাম, নচেৎ আত্মহত্যা করিয়া মরিতাম। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, এ পৃথিবীতে কোন লোকের প্রতি এখন আর আমার কোন আসক্তি নাই। আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইহার পরিচয় পাইবেন। আমি আজ হইতে কাহারও নিকট কোন পত্র লিখিব না, কাহারও কোন পত্র পাঠ করিব না। আমার নামে যে সকল পত্র আসিবে, আপনি রাখিবেন, আপনি পড়িবেন। সমস্ত পত্র পাঠের ভার আপনার উপর ন্যস্ত করিলাম। আমার জীবনের সমস্ত ভার আপনার উপর দিলাম। আমার জন্য আপনি অনেক কষ্ট পাইয়াছেন, আরো হয় ত পাইবেন, কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, আমি কখনও আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিব না; আমি কখনও অবিশ্বাসের কোন কাজ করিব না। মা জগজ্জননী আমার সহায় হউন।

অরবিন্দ মুরলার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, মনের গ্লানি দূর হইল। মুরলা আজ হইতে বাড়ীর একজন হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তি দেবী।

তারপরের কথা সংক্ষেপে বলাই ভাল। মুরলার পিতা, মুরলাকে গ্রহণ করিলেন না। প্রথমে আশা দিয়া শেষে নিরাশ করিলেন। শ্রাবণ গেল, ভাদ্র গেল, আশ্বিনও গেল—১২৯৭ সালের বর্ষা দিন রাত্রি ঝরিয়া এখন ক্লান্ত, অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মেঘ এত দিন বঙ্গোপসাগর হইতে উড়িয়া উড়িয়া উত্তরে হিমগিরিতে যাইতেছিল, এখন তাহারাও ক্লান্ত, শ্রান্ত, আর উত্তরে যায় না। সাগরের মেঘ সাগরের আকাশের উপরই

ভাসিয়া বেড়ায়। বর্ষা শ্রান্ত, মেঘ শ্রান্ত, আর শ্রান্ত কে? তাহাও বলিতেছি।

সুপ্রসন্ন কলিকাতা আসিয়াছে; দরিদ্রের ছেলে ঘোর দারিদ্র্যের দহনে ক্লিষ্ট হইয়াও কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন রূপে মুরলাকে দেখিতে তাহার ইচ্ছা। ব্রাহ্মপাড়ায় ও সমাজে যায়, যেখানে সেখানে বেড়ায়, কিন্তু মুরলাকে দেখিতে পায় না। প্রত্যহ ডাকে এক এক খানি পত্র দিত, প্রত্যহ তাহা অরবিন্দের হাতে আসিয়া ধরা পড়িত। কখনও "পরম পূজনীয়া দিদিঠাকুরাণী," কখনও "স্নেহের ভগ্নী" কখনও "পূজনীয়া পিসিমাতাঠাকুরাণী" ইত্যাদি রূপ নানা পাঠে নানারূপ পত্র লিখিত। সব চিঠি ধরা পড়িত, কেননা মুরলার প্রতিজ্ঞা ছিল, কাহারও পত্র তিনি হাতে লইবেন না।

অরবিন্দ পত্রগুলি পড়িতেন এবং পত্রের প্রয়োজনানুরূপ কথা মুরলাকে বলিতেন। শেষে মুরলা আর ও সকল কাহিনী বড় একটা শুনিতেন না, শেষে অরবিন্দও বড় একটা বলিতেন না। সুপ্রসন্ন বুঝিয়াছিল যে, পত্র মুরলার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, এই জন্য সে নানারূপ পাঠ লিখিত। পত্রের মধ্যে ভালবাসার কথা থাকিত, ভয়প্রদর্শনের কথা থাকিত। কোন পত্রে থাকিত, "তোমার জন্য আমি পাগল হইয়াছি, চল আমরা বনে যাই। রিপুর সম্বন্ধ আর রাখিব না, ভাই ভগ্নীর ন্যায় জীবন কাটাইব।" কোন পত্রে থাকিত, "কালী বাড়ী ডালি দিয়াছি, মা কালী শীঘ্র তোমার সহিত আমার মিলন করাইবেন।" কোন পত্রে থাকিত, "তুমি যদি এস এবং যদি বল, আমার আর দুই স্ত্রীকে হত্যা করিব।" কোন পত্রে থাকিত,"তুমি অরবিন্দ বাবুকে বলিয়া ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হও।" কোন পত্রে থাকিত, "আমি পীড়িত, শীঘ্রই বিষ খাইয়া মরিব, শীঘ্র পত্রের উত্তর দেও।" কোন পত্রে থাকিত "তুমি যদি এ পত্র পাইয়াও উত্তর না দেও, আমি অরবিন্দ বাবুর নিকট সমস্ত লিখিব, তিনি তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবেন।" কোন পত্রে থাকিত "তুমি যদি উত্তর না দেও, এবং শীঘ্র যদি আমার নিকট না আইস, তোমাকে খুন করিব।" কোন পত্রে থাকিত, "তুমি না আসিলে সংবাদপত্রে সমস্ত কথা ছাপাইয়া দিব।" এইরূপে নানা কথা নানা পত্রে থাকিত। অরবিন্দ সুপ্রসন্নকে কখনও দেখেন নাই, তাহার প্রকৃতিও জানেন না, মনে ভাবিলেন, কিছুদিন পর এ ভাব আর থাকিবে

না। বাস্তবিকও তাহাই হইল। আশ্বিন মাসে, বর্ষার সহিত সুপ্রসন্নের পত্রের স্রোতও থামিল। সুপ্রসন্ন লিখিয়া লিখিয়া শ্রান্ত হইয়া শেষে দেশে ফিরিল। অরবিন্দ একটু সুস্থির হইলেন।

মুরলা চক্রধরপুর থাকিতে রয়াল রিডার ৪র্থ ভাগ, ক্ষেত্রতত্ত্ব ১ম অধ্যায়, বীজগণিত বিভাগ পর্য্যন্ত নিজ চেষ্টায় সমাধা করিয়াছিলেন। কলিকাতা পৌঁছিয়া ঘরে ক্রমাগত পড়িতে লাগিলেন। স্কুলে যাইবার জন্য একান্ত অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অরবিন্দ বলিলেন, 'আমি কিছু দিন না দেখিলে চরিত্র সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র দিতে পারিব না। তিন মাসের মধ্যে মুরলা অরবিন্দের খুব মন আকর্ষণ করিয়াছেন। রন্ধন প্রভৃতি গৃহ-কার্য্যে প্রথম কয়েক মাস মুরলা খুব মনোযোগ দিলেন। মুরলা এরূপ পরিপাটিরূপ রাঁধিতে পারিতেন যে, অতি অল্প স্ত্রীলোকই সেরূপ পারে। মুরলার বিলাসে মন নাই, সামান্য থানের সাদা ধূতি পরিতেন, সামান্য নিরামিষ আহার করিতেন, ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য যাহা প্রয়োজন, অতি শ্রদ্ধার সহিত তাহা করিতেন। কথায় কথায় একদিন অরবিন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি যখন স্বামীর ধর্ম্মপালন করেন নাই, তখন স্বামীর বিষয়ের এক কাণাকড়িও আপনার ব্যয় করার অধিকার নাই। ৫০০৲। ৬০০৲টাকা যে মাদারিপুর ডিগ্রি হইয়া জমা আছে, তাহা আনিতেও আপনার অধিকার নাই।" মুরলাও বুঝিয়াছিলেন, বাস্তবিক আমি যখন বিপথে গিয়াছি, তখন ধর্ম্মতঃ স্বামীর সম্পত্তিতে আমি বঞ্চিতা হইয়াছি, তাহাতে আর আমার আশা রাখা উচিত নয়, এই ভাবিয়াই মুরলা খুব যৎসামান্য ভাবে থাকিতেন। ব্রাহ্মসমাজের বিলাসিতার ঢেউ অরবিন্দের বাড়ীতে প্রবেশা-ধিকার পায় নাই, এজন্যও অরবিন্দ সমাজে খুব নিন্দিত। অরবিন্দ জামা গায়ে না দিয়া পাড়ার রাস্তায় বাহির হন, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন, এ জন্য অসাক্ষাতে অরবিন্দের নিন্দা হয়। অরবিন্দ মুরলাকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"বসনে ভূষণে ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্ম চরিত্রে। স্বভাব যাহার কলুষিত, জামা গায়ে দিয়াও সে ধর্ম্মের নিকট নিষ্কৃতি পায় না; আর চরিত্রে যে অটল, তৈলঙ্গ স্বামীর ন্যায় উলঙ্গ থাকিলেও তার নিকট যাইতে ভয় নাই। বিলাসটা যত শীঘ্র বিদূরিত হয়, ততই মঙ্গল। উহার চিন্তায় অহঙ্কার বাড়ে, ধর্ম্ম লোপ পায়।" এই শিক্ষায় মুরলা মলিন-বসনা; ব্রাহ্মসমাজে মুরলার নিন্দা হইলেও, প্রকৃত ধার্ম্মিকের নিকট এজন্য

মুরলা নিন্দিতা হইতে পারেন না। মুরলা হিন্দু-বিধবা, আজও তাহাই আছেন।

ক্রমে ক্রমে অরবিন্দ মুরলার চরিত্রের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, বিধাতা-প্রদত্ত প্রতিভা এবং সরল বিশ্বাসের পরিচয় যত পাইতে লাগিলেন, ততই মুরলাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন। মুরলার জ্ঞান পিপাসা ও ধর্ম্মপিপাসা অরবিন্দের সহবাসে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিন মাসের উপদেশে মুরলার হৃদয়ে যে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইল, তাহা দেখিয়া অনেকেই মোহিত হইল। মুরলার কলিকাতার জীবন এইরূপে আরম্ভ হইল। মুরলা অরবিন্দকে পূর্ব্বে যেরূপ জানিতেন, এই সময়ে তদপেক্ষা আরো অনেক জানিলেন। যে লোকটাকে ব্রাহ্মসমাজে সকল লোক ঘৃণা করিতেছে, সেই লোকটাকে দিন দিন মুরলা দেবতার ন্যায় পূজা করিতে লাগিলেন। বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের লোকের মুখে মুরলা অরবিন্দের অনেক নিন্দা শুনিয়াছিলেন; তখন ক্ষণকালের জন্য হৃদয়ে একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন অরবিন্দের স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগের প্রতি কেমন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। কলিকাতা আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের যে চিত্র দেখিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আরো বিরক্ত হইলেন। এখানে নানারূপ ভেদাভেদ,—ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ, জ্ঞানী মূর্খের ভেদাভেদ, ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদাভেদ দেখিয়া প্রাণে বড়ই যাতনা পাইলেন। দেখিলেন, পরনিন্দা অনেক ব্রাহ্মিকার কণ্ঠভূষণ, অহঙ্কার ও বিলাসিতা অঙ্গের আভরণ, অন্যকে ঘৃণা করা চরিত্রের উজ্জ্বল মহত্ত্ব। দেখিলেন, এখানে বহু লোকে পাপ করিয়া হিন্দুসমাজের ন্যায় তাহা ঢাকিতে যত্নশীল—অন্য লোকের ন্যায় তাহা চাপা দিতে লালায়িত। তিনি যে ধাতুতে গঠিত, এ সকল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, সুতরাং এ সকল তাঁহার ভাল লাগিল না। তাঁহাকে লইয়া, তলে তলে, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় যে আন্দোলন-স্রোত চলিতেছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। যে স্থানে পরনিন্দা হইত, সে স্থানে তিনি বসিতেন না। যে স্থানে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিতেছে, তুচ্ছ করিতেছে, বুঝিতেন, সে স্থান হইতে উঠিয়া আসিতেন। এইরূপে মুরলার কলিকাতার জীবন চলিতে লাগিল। পৃথিবীর কোন লোকের নিকট কোন পত্র লিখিতেন না, কাহারও কোন পত্র গ্রহণ করিতেন

না। যেমন বলিয়াছিলেন, ঠিক্ সেইরূপ অরবিন্দের কথানুসারে চলিতে লাগিলেন।

অরবিন্দ এখন অনেক ব্রাহ্মের চক্ষু-শূল। তিনি ব্রাহ্মসমাজের দলাদলি ভাঙ্গিতে লালায়িত। এক শ্রেণীর লোক তাঁহাকে পাইলে জীবন্ত দাহ করিতে প্রস্তুত। এই অবস্থার মধ্যে মুরলা, শান্তিদেবীর ন্যায় অরবিন্দের চিত্তে শান্তিধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অরবিন্দ মুরলাকে কত উপদেশই দিলেন, কত কথাই বলিলেন, পৃথিবীর আর কেহ তাহা জানিল না। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অরবিন্দ যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, আমরা অতি সংক্ষেপে তাহার কয়েকটী কথা মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অরবিন্দ দলছাড়া কেন ?

কার্ত্তিক মাস হইতে সুপ্রসন্নের পত্রাদি বন্ধ হইল, অরবিন্দ মনে করিলেন, বিধাতার ইচ্ছায় মুরলা বুঝি বা রক্ষা পাইলেন! ভাবিলেন, স্বপ্নের কথা সব সময়ে সত্য হয় না। ভাবিলেন, মুরলা না বাঁচিলে এ পৃথিবীতে আমার থাকা কষ্টকর হইবে।

সুপ্রসন্ন এক শত্রু, মুরলার আরো কত শত্রু ব্রাহ্মসমাজে! মুরলার ন্যায় পতিতা রমণীকে অরবিন্দ পরিবারে স্থান দিয়াছেন, এ কলঙ্ক দিগ্‌দিগন্তরে ছাইল। অরবিন্দ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন, ভাবিলেন, পৃথিবীতে পাপী কে নয়? কাহার ঘরে পাপের বাসা নাই? কোন্ মানুষের হৃদয়ের ভিতরে পাপের অঙ্কুর নাই? হায়, বুকে হাত দিয়া কে বলিতে পারে, কখনও পাপচিন্তাকেও মনে স্থান দেই নাই? পাপী পাপীকে ঘৃণা করে, এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। কোন মহাত্মা বলিয়াছিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম পাপী তাপীদের জন্য, আর ব্রাহ্মধর্ম্ম হামবড়া ধার্ম্মিকদিগের জন্য! পাপীকে বাদ দিলে কোন ধর্ম্মসমাজ টিকে কি? খ্রীষ্ট বলিতেন, পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে ঘৃণা করিও না। কিন্তু সে অমূল্য উপদেশ এখন আর কাহারও জীবনে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না। হায়, পৃথিবীর কি শোচনীয় অবস্থা!

মুরলার কলিকাতা আগমনের পর ব্রাহ্মমহলে আরো অনেক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে দেবতা আছেন, ব্রাহ্মসমাজে অসুরও আছে। ব্রাহ্ম-সমাজে কাম ক্রোধকে সম্পূর্ণ জয় করিয়াছেন, এমন মহৎ লোক আছেন; ব্রাহ্মসমাজে রিপুর জ্বালায় অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে, এমন লোকও আছে। যে ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ আছেন, দেবতুল্য রামতনু, রাজনারায়ণ, শিবনাথ, উমেশচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ আছেন, সেই ব্রাহ্মসমাজেই গোবিন্দ বাবু, জ্ঞানদা বাবু, তিলক বাবু প্রভৃতি কত জন আছেন। চুল পাকিলেই ধর্ম্ম হয় না; অনেক ধর্ম্মোপদেশ শুনিলেও ধর্ম্ম হয় না। তাহা যদি হইত, গোবিন্দ বাবু, জ্ঞানদা বাবু এ জগতে ধার্ম্মিকের শিরোমণি বলিয়া পরিচিত হইতেন। ঢুলিরা এখন অবসন্ন হইয়া ঢোল ছাড়িয়া বসিয়াছেন, এখন কাঁসীদার আসর রাখিতেছেন। তাঁহাদের একটা কথা গায়ে সয় না, তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের ন্যায় ধার্ম্মিক এ জগতে আর নাই! তাঁহারা ভাবেন, ব্রাহ্ম না হইলে আর জীবের কল্যাণ বা পরিত্রাণ নাই। ভাবেন, পৃথিবীর যত লোক অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত, তাহারা নরকের পথে অগ্রসর হইতেছে, ইত্যাদি। দেবতাদিগের অধিষ্ঠান সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজ এখন একটা সম্প্রদায় রূপ আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। সম্প্রদায় বজায় রাখিতে হইলে দল বাঁধা চাই। মতের স্বাধীনতা না ডুবাইলে দল বাঁধা যায় না। ব্রাহ্মসমাজে তাই গড্ডালিকা-প্রবাহ চলিয়াছে। তুমি যেমন তেমন লোক হও না কেন, গোবিন্দ বাবু, জ্ঞানদা বাবুর ন্যায় লোক-দিগের চরণে দুই দশদিন তৈলমর্দ্দন যদি করিতে পার, ব্রাহ্মসমাজে একজন বড় স্বার্থত্যাগী ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। নববিধান সমাজের ও হিন্দু-পুনরুত্থান-দলের লোকদিগকে খুব তীব্র ভাষায় যদি তুমি গালাগালি দিতে পার, সাহেবী ব্রাহ্মমহলে তোমার আদরের সীমা থাকিবে না। এইত অবস্থা। যেমন অবস্থা, তেমনি ব্যবস্থা। অরবিন্দ কিছু স্বাধীনচেতা লোক, খোসামুদী ভালবাসেন না। তাহাতে আবার বড় বড় লোকের চরিত্র ধরিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; উচ্ছৃঙ্খল ব্রাহ্মবিবাহের একটী সীমা নির্দ্ধারণ করিতে বলেন; ঘোরতর স্বেচ্ছাচারিতার দিনে এ বড়ই আস্পর্দ্ধার কথা। এই অরবিন্দ আবার পাপী তাপীদিগকে ধরিয়া আনিয়া মানুষ করিয়া দিতেছেন; ব্রাহ্ম সমাজের যে সকল লোক দয়াব্রত গ্রহণ করাকে পাপ মনে করে; পরের জন্য ভাবাকে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, মনে

করে,—ঈশ্বর যাহাকে মারিয়াছেন, তাহাকে সাহায্য করিলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে চলা হয়, বিশ্বাস করে ; তাহারা যে অরবিন্দের প্রতি বিরক্ত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? অরবিন্দ ত সকলের চক্ষু-শূলই, কিন্তু যে ব্রাহ্মসমাজে হ'রে তেলীর ন্যায় লোক, গৃহস্থ ঘরের মেয়ের সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া, তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া ব্রাহ্ম-বিবাহের জোরে সমাজে স্থান পাইয়াছে, সেই ব্রাহ্মসমাজে মুরলার প্রতি তীব্র ব্যবহার, বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। অথবা কালের দুর্জ্জয় প্রভাবে এ জগতে কি অসম্ভব ? আজ যে রাস্তার মুটে, কাল সে রাজসিংহাসনে বসিলে, তার সমদুঃখী মুটের প্রতিই যে তীব্র ও কঠোর কষাঘাতের ব্যবস্থা করিবে, বিচিত্র কি ? বিধাতার এই আশ্চর্য্য চিড়িয়া-খানার ব্যবস্থা দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

কেন এ সকল অপ্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা হইতেছে ? তাহা বলিতেছি। কার্ত্তিক মাসের পর, অরবিন্দ যখন দেখিলেন, সুপ্রসন্ন আর পত্রাদি লেখে না, এবং ইহাও যখন বুঝিলেন যে, মুরলা এখন সম্পূর্ণ নব জীবন লাভ করিয়াছেন, তখন মুরলাকে কোন স্কুলে দিতে মনস্থ করিলেন। অনেকবার বলিয়াছি, মুরলার অধ্যয়নের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। স্কুলে দিলে মুরলার শিক্ষা খুব ভালরূপ চলিবে ভাবিয়া অরবিন্দ স্কুলে দিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্ম-সংশ্লিষ্ট কোন স্কুলে দিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে যে সকল স্কুলে এরূপ মেয়েকে ভর্ত্তি করা হইত, অরবিন্দের আশ্রিত বলিয়া সে সকল স্কুলেও দিতে পারিলেন না। ইহাতে অরবিন্দ প্রাণে খুব আঘাত পাইলেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের একটী জীবন্ত ফল পাইলেন !

পূর্ব্বে কোন কোন মহিলা-সভা-সমিতিতে অশোকা নিমন্ত্রিতা হইতেন। অশোকা, ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্তা রমণী। কিন্তু মুরলার আগমনের পর অশোকার নিমন্ত্রণাদি বন্ধ হইয়াছে। মফঃস্বল হইতে কোন কোন লোক ইহার কারণ অনুসন্ধানে চেষ্টা করিয়া জানিয়াছেন যে, বেশ্যার মেয়ে ও মুরলাকে অরবিন্দ বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছেন বলিয়া নিমন্ত্রণ হয় না। কোন কোন সদাশয় লোক এজন্য তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কে সে কথা শুনে ? দলের মত-প্রবাহে সকলের মন নিমজ্জিত। দিদির নিমন্ত্রণাদি বন্ধ হইতেছে দেখিয়া মুরলা হৃদয়ে আঘাত পাইলেন।

আরো ঘটনা ঘটিল। রত্ন-ডোবার জমীদার বাবু অরবিন্দকে খুব ভালবাসিতেন, কিন্তু মুরলার আগমনের পর হইতে তিনি অরবিন্দের প্রতি

ভয়ানক বিরক্ত হইয়াছেন। শুনা গিয়াছে, বরিশালে অরবিন্দ যে তিলক বাবুর বাড়ীতে অপমানিত হইয়াছিলেন, একথা শুনিয়া তিনি আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রত্নডোবার জমীদার বাবু অরবিন্দের হরিহর আত্মা ছিলেন, ইঁহার জন্য অরবিন্দ অনেক রক্ত জল করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নাকি এখন বলেন, অরবিন্দ তাঁহাকে ধনে প্রাণে মারিয়াছেন!- কালের বিচিত্র গতি, অরবিন্দ দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়াছেন; ভাবেন, মানুষ না পারে, এমন কাজ নাই। গোপনে গোপনে এইরূপ স্রোত চলিল, কিন্তু অরবিন্দের নিকট আসিয়া কেহই কোন কথা বলে না। এমনই কাপুরুষতা!

৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে কয়েকটী ব্রাহ্ম অরবিন্দের সহিত একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিধাতার নামে প্রাণ উৎসর্গ করিবার সময় কয়েকটী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই সকল প্রতিজ্ঞা একখানি কাগজে লিখিত ছিল। "আমরা কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না, আমরা কখনও পরস্পরের নিন্দা করিব না, চিরদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব," তাহার মধ্যে এই কয়েকটী প্রতিজ্ঞাও ছিল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন পূর্ব্বেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন, একজন এদিকে ওদিকে দোদুল্যমান হইতেছিলেন, আর কয়েক জন পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন। ইঁহারা অরবিন্দকে ভালবাসেন, অরবিন্দের সহিত একত্রে আহার বিহার করেন, অসাক্ষাতে অরবিন্দের নিন্দা করেন না, অরবিন্দের বিরুদ্ধবাদী দলের ইহা অসহ্য। আন্দোলনকারীরা ইঁহাদিগের এক জনকে এক দিন খুব করিয়া ধরিলেন। তিনি যাহার তাহার কথায় ভুলিবার লোক নন্, তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিলেন,—"আমরা ঈশ্বরের সন্নিধানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না। আপনারা অরবিন্দকে একঘ'রে করিতে পারেন, কিন্তু আমি কখনও পারিব না।"

ইহাতেও অরবিন্দের কোন কষ্ট নাই, তিনি সকলকে পূর্ব্ববৎ ভালবাসিতে ও পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শুনিলেন, ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন লোক সুপ্রসন্নকে উস্কাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি একটু চিন্তিত হইলেন। শুনিলেন, সুপ্রসন্নকে আবার বরিশাল হইতে আসিবার জন্য পত্র গিয়াছে। একথা শুনিয়া অরবিন্দের মনে একটু চিন্তা জন্মিল।

চিন্তা জন্মিল, কিন্তু তবুও তিনি দমিলেন না। যাহা ঈশ্বর করেন,

হইবে, ভাবিয়া হৃদয়ে বল বাঁধিলেন। কোন কোন লোক অরবিন্দকে ক্ষমা চাহিয়া দলের সহিত গোল মিটাইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু অরবিন্দ তেজীয়ান লোক, বলিলেন, বিধাতা যেদিন বুঝাইবেন, আমি অন্যায় করিয়াছি, সেই দিন ক্ষমা চাহিব। কোন কোন লোক মুরলাকে বলিলেন, আপনাকে অরবিন্দ বাবু খুব ভালবাসেন, আপনি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলুন, ব্রাহ্মসমাজ হইতে আর যেন তিনি বিচ্ছিন্ন ভাবে না থাকেন। তাঁহাকে দেশের দশজনে মান্য করে, তিনি পৃথক থাকিলে, সহজেই সমাজ সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ হয়। মুরলা বলিলেন, "আমার কথা তিনি শুনিবেন কেন?" এক দিন, দুই দিন, দশ দিন বুঝাইতে বুঝাইতে মুরলা শেষে অরবিন্দকে এ প্রস্তাব বলিতে সম্মত হইলেন। একদিন সন্ধ্যার সময়, উপাসনান্তর মুরলা বলিলেন,—আপনার নিকট ত অনেক উপদেশ পাইয়াছি; আর কিছু উপদেশ চাই।

অরবিন্দ বলিলেন, প্রশ্ন করুন, বলিতেছি।

মুরলা। আপনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন্ না কেন? গত কথা ভুলিয়া, এখন আবার ব্রাহ্মসমাজের সেবা করুন না কেন?

অরবিন্দ। ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবা করিতেই আছি, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইব না কেন, সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলাও কঠিন। তবুও যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বলিতেছি।

প্রথম কারণ, সামাজিক বিষয়ে বিশেষ নিয়মাদি না থাকায় ব্রাহ্মসমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে; যাহার যাহা ইচ্ছা, করিতেছে। আমার বিশ্বাস, সমাজ রাখিতে গেলেই নিয়ম প্রণালী চাই। ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক বিষয়ে নিয়ম করা অসম্ভব মনে করেন। এরূপ অবস্থায় আমি যোগ রাখিতে পারি না।

দ্বিতীয় কারণ, প্রতিব্যক্তিরই এক ভোট (one-man-one-vote), ইহাতে ধর্ম্মসমাজ চলিতে পারে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। উমেশ বাবু, শিবনাথ বাবুর ন্যায় মহৎ ব্যক্তিগণেরও এক এক ভোট, আমারও এক ভোট; আর আজ যে সমাজের সভ্য হইবে, তাহারও এক ভোট; ইহাতে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না। চরিত্রবান বিজ্ঞ লোকের মূল্যবান প্রস্তাব এই প্রণালীতে দশজন বালক উড়াইয়া দিতে পারে। সামাজিক বিষয়ে ধার্ম্মিক, প্রবীণ, চরিত্রবান লোকদিগের প্রাধান্য থাকা উচিত। ব্রাহ্মসমাজে তাহা না থাকার দরুন, সকলেই কর্ত্তাশ্রেণীভুক্ত। আদেশ

করিতে সকলেই, পালন করিতে কেহই নাই। আমার বিশ্বাস, সমাজ এ জন্য ডুবিতে বসিয়াছে। আমি এ অবস্থায় যোগ রাখিতে পারি না।

তৃতীয় কারণ, ব্রাহ্মসমাজ বিবাদের অনলে পুড়িতেছে। সাধারণ ও নব-বিধান সমাজে, আমার মতে, ধর্ম্মগত কোন পার্থক্য নাই, অথচ উভয় সমাজের লোকের মধ্যে ভয়ানক দলাদলি। দলাদলি ভাঙ্গিতে যে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, দলাদলি করাই এখন তাহার প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। দলাদলি ভাঙ্গার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আর কোন দলে যোগ রাখিতে পারি না।

চতুর্থ কারণ, উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে আমার প্রাণে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। "সত্য জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি স্বরূপ সাধনায় অনেক বিঘ্ন। উপাসনার গভীর মর্ম্ম অতি অল্প লোকেই ভেদ করিতে পারে, অথচ সকলেই মন্ত্রের ন্যায় বাক্যগুলি মুখে উচ্চারণ করে। ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, যোগ, ধ্যান, প্রার্থনা ভিন্ন উপাসনার আর অঙ্গ রাখা উচিত নয়। আরাধনা অবিশ্বাস-মূলক। সম্মুখে বিধাতাকে অনুভব করিলে আর স্বরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। স্বরূপতঃ ব্রহ্মকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনি প্রত্যক্ষ স্বরূপের কথা বলিতে অধিকারী হইলেও হইতে পারেন, অন্যের পক্ষে অপ্রত্যক্ষ কথা আওড়ান উচিত নয়। খ্রীষ্ট কেবল প্রার্থনা করিতেন, যোগী ঋষিরা কেবল যোগ ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, শ্রীচৈতন্য কেবল সম্ভোগ করিতেন, এরূপ কথা কাটাকাটি করিয়া ভগবানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে আর কোন মহাত্মাকে দেখা যায় নাই। যিনি অনন্ত, সান্ত জীব তাঁহার কি স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবে? বিশ্বাসের উদয় হইলে, নাম সাধনের প্রয়োজন, নাম সাধনে রিপু সংযত হইলে ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মসমাধি। তারপর প্রার্থনা। সকল সাধকের পক্ষে কেবল অবিরত প্রার্থনা। খ্রীষ্ট বলিতেন, দ্বারে আঘাত কর, দ্বার মুক্ত হইবে; প্রার্থনা কর, পাইবে। আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, কিন্তু আমারও সেই কথা।

উপাসনার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে আরো অনিষ্ট হয়। সাধনার প্রণালী কখনও সকলের পক্ষে একরূপ হইতে পারে না। ঈশ্বরের অনন্ত প্রকৃতি, অনন্ত মানুষের অনন্ত স্বভাব। অনন্তের কোন্ দিক্ কাহার জন্য, কে জানে? জগতের লোক পরম্পরা প্রত্যেকের ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্। সাধন প্রণালীও পৃথক্ পৃথক্। আমার বিশ্বাস, সকলের পক্ষে এক প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ এক সীমাবদ্ধ কেন্দ্রে নিবদ্ধ হইতেছেন। কাহারও কাহারও

ইতিমধ্যেই, এরূপ ভাব হইয়াছে যে, ঐ প্রণালীর একটু এদিক্ ওদিক্ করিলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবের সহিত আমি যোগ রাখিতে অক্ষম।

পঞ্চম কারণ, আমি কেবল উদারতার উপাসক। অনন্ত আকাশ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত ঈশ্বর, অনন্ত মানব প্রকৃতি। আমার বিশ্বাস, প্রতি মানুষে বিধাতার অনন্তত্বের ছায়া প্রতিভাত। যত প্রণালী, যত শাস্ত্র, যত ধর্ম্মোপদেষ্টা, এই পৃথিবীতে সকলেরই প্রয়োজন ছিল। এখন সকল ভাঙ্গিয়া এক সিন্ধুতে মিলাইতে হইবে। যে, যে পথে যাউক্, সে আমার ভাই। যে, যে কাজ করুক্, আমার কাহাকেও ঘৃণা করিবার অধিকার নাই। সকলের সহিত মিলিতে হইবে। যে ঘৃণা করিবে, তাহাকেও ভাই বলিয়া কোলে লইতে হইবে। আমি সকলের বড়, এ ভাব ডুবাইয়া সকলের পদরেণু হইতে হইবে। সকলের লক্ষ্য তিনি, সকলেই সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন পথে ছুটিয়াছে, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া, সকলের ভিতরে তাঁহার যে বিশেষত্ব প্রতিভাত, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য ইহাই, কিন্তু এ লক্ষ্য ভুলিয়া এখন ব্রাহ্মসমাজ গণ্ডিতে আবদ্ধ হইতেছেন এবং পৃথিবীর আর সকল সম্প্রদায়কে নিরয়গামী ভাবিতেছেন। আমি এ ভাব সহ্য করিতে পারি না। আমার ব্রাহ্মসমাজ, জগৎকে লইয়া। এক ঈশ্বর, একধর্ম্ম, এক মানব সম্প্রদায়। জাতিভেদ বাহিরে তুলিয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজ ভিতরে নানারূপ জাতিভেদ সৃষ্টি করিতেছেন। আমি জাতিভেদ ভিতরেও মানিনা, বাহিরেও না। মানব সম্প্রদায় সব ভাই ভাই। সকল ভাই এক ঈশ্বরের সন্তান। সকল ভাইকেই তিনি প্রতিপালন করিতেছেন। এ বিশ্বাস লইয়া গণ্ডিতে আর প্রবেশ করিতে পারি না।

আমি এক ঈশ্বর-শক্তিকেই জানি। এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। অদ্বৈত মতে আমি বিশ্বাসী। যাহা করেন, তিনিই করেন। ভাল মন্দ, আমরা যাহা বিচার করি, ও সকল কাল ও স্থানে নিবদ্ধ, ও কেবল আমাদের নয়নের ধান্দা মাত্র। তাঁহার নিকট কাল নাই, স্থান নাই। তিনি কালাতীত, স্থানাতীত। তিনি পাপ পুণ্যের অতীত। মন্দ বলিয়া যাহা বুঝি, তাহা আমাদের নিকট মন্দ হইলেও, অন্যের নিকট যে ভাল নয়, তাহা বলিতে পারি না। বিষ্ঠাকে আমরা ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করি, কুক্কুর তাহা খায়। এইরূপ সকল জিনিস। আমার নিকট যাহা পাপ, অন্যের নিকট তাহা পুণ্য।

নরহত্যা একজন ধর্ম্মাদেশে করিতে পারে, একজন ধর্ম্মাদেশে নরহত্যাকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে। সান্ত জীব অনন্তের ধারণায় যখন অক্ষম, তখন অনন্তের লীলাচক্রের ব্যূহ ভেদ করিয়া চিরস্থায়ীরূপে কোনটাকে পাপ এবং কোনটাকে পুণ্য বলিয়া অভিহিত করিয়া তাহা পালনে মানুষকে বাধ্য করিলেই গণ্ডির সৃষ্টি হয়, বিধাতার সার্ব্বভৌমিকত্ব বিলুপ্ত করা হয়। বিধাতার আদেশ পালন করাকেই আমি ধর্ম্ম মনে করি, পাপ পুণ্য জানি না। তাঁহার অনুগত হইব, মানুষের নয়। সকল মানুষ যদি তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলে, পথে পার্থক্য ও বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও, লক্ষ্যে সকলে এক। কেন না, শক্তি এক। এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে সব। বড় দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মসমাজ "একমেবাদ্বিতীয়ং" মন্ত্র ঘোষণা করিয়াও এখন দ্বৈতভাবে ডুবিয়া মারা যাইতেছেন। আমি অদ্বৈত শক্তির উপাসক, সুতরাং আমার আশ্রয় যেমন ব্রাহ্মসমাজ, তেমনই হিন্দুসমাজ, তেমনই খ্রীষ্ট ও মুসলমান সমাজ। অথবা আমি ব্রাহ্ম নই, হিন্দু নই, খ্রীষ্টান নই, আমি মুসলমান নই। হই ত, আমি সকলই। নইত, আমি কোন কিছুই নই। আমি যাহা, তাহাই আমি। আমি এই সৃষ্টির মধ্যে সেই অনাদি অনন্ত ইচ্ছাশক্তির এক বিন্দু বৈচিত্র্য মাত্র। মিল, একতা, কাহারও সহিত নাই; আবার অন্যদিকে মিল, একতা সকলের সঙ্গে। গণ্ডিতে নিবদ্ধ হওয়া আমার পক্ষে কেন অসম্ভব, বুঝিয়াছেন ত?

মুরলা অরবিন্দের সকল কথা বুঝিলেন না। যাহা বুঝিলেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, তবে সকল সমাজেই যোগ দিন্ না কেন?

অরবিন্দ। বিধাতার আদেশ হইলে দিব। বিধাতা বলিতেছেন, "একাকী দাঁড়াইয়া সংসারের সহিত সংগ্রাম কর। পৃথিবীতে কেহ তোমার সহায় নাই, সকল বন্ধু তোমার শত্রু, এই মহান্ধকারে যদি অবিচলিত থাকিতে পার, পরে তোমার জন্য স্বর্গ হইতে বিধান অবতীর্ণ হইবে।" বিধাতার আদেশে এই ঘোর তুফানময় দুর্দ্দিনে দাঁড়াইয়া থাকিব; কাহারও সাহায্য চাই না, কাহারও কথা মানিয়া চলিব না। বিধাতার সন্তান, কাহারও অধীনতা স্বীকার করিবে না।"

মুরলা আর কথা বলিলেন না, মনে মনে ভাবিলেন, এরূপ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মসমাজ বুঝিবে, এখনও তাহার বহু সময় বাকী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আবার সুপ্রসন্ন মাতিয়া উঠিল।

জগতের পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছিল; খ্রীষ্টসমাজের স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী প্রচারক শ্রেণীর প্রতি তাকাইলে আর এ কথায় সন্দেহ থাকে না। অন্যান্য দেশের কথা বলিতে চাই না, এই হতভাগ্য পতিত ভারতের জন্য খ্রীষ্টসমাজ যে উপকার করিতেছেন, ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাই। কোথায় ব্রিটন, আর কোথায় ভারতবর্ষ; আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, ভারতের বনে বনে, অরণ্যে অরণ্যে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে এই বৈরাগীর দল মানুষের কল্যাণের জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতেছেন। গারো পর্ব্বতে, নাগা পর্ব্বতে, খাসিয়া পর্ব্বতে, এবং কোল, কুকি, লুসাই, সাঁওতাল—ভারতের সকল অসভ্য জাতির মধ্যে ইহাঁরা জীবন্ত ভাবে ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন। আর আমরা? আমরা দুগ্ধ-ফেননিভ সুখশয্যায় শয়ন করিয়া এ হেন দেবপুরুষদিগের নিন্দা ঘোষণায় সদা ব্যাপৃত।

ইংরাজ জাতি ভারতের জন্য কি না করিয়াছেন? এক দিকে কুসংস্কারের কুক্ষিগত অন্ধকার ভেদ করিয়া শিক্ষার আলোক প্রবেশ করাইতেছেন, অন্য দিকে ধর্ম্মনীতিতে সমুজ্জ্বল করিয়া অসংখ্য পশুসম ভারতবাসীকে স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত করিতেছেন। তুমি আমি, বক্তৃতাপরায়ণ, বৃথাহুজুগ-প্রিয় ব্যক্তিগণ সহস্র বৎসর কল্পনায়ও যাহা ধারণা করিতে পারি না, ইহাঁরা নিমেষের মধ্যে তাহা করিতেছেন। মুর সাহেবের কীর্ত্তি পাঠ কর, বুথ সাহেবের নরনারী উদ্ধারের ব্রত তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন কর, প্রোটেষ্টেণ্ট হোমের বিষয় জ্ঞাত হও, "লিটেল সিস্‌টারস্ অব দি পুয়র" আশ্রমের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া আইস, বুঝিবে, পতিতদিগকে উদ্ধার করিতে ইহাঁদিগের কি অদম্য বাসনা। ধন্য খ্রীষ্ট, ধন্য খ্রীষ্টধর্ম্ম। দীনদুঃখী পতিতদিগের জন্য এমন আর কোন্ ধর্ম্মসমাজ করিতে পারিয়াছে?

বাঙ্গালী, বাঙ্গালী মেয়ের পানে তাকাইল না; মুরলাকে ব্রাহ্মসমাজ আশ্রয় দিতে, স্কুলে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট-মহিলা, পুণ্যবতী, সাধুচরিত্রা, গরীবের মাতৃমূর্ত্তি মিস্ নীল মুরলাকে আপন স্কুলে

গ্রহণ করিলেন। খ্রীষ্টানেরা বলেন—"আমরা পাপীদের জন্য।" খ্রীষ্টধর্ম্মের জয় হইবে না ত, কিসের জয় হইবে? মুরলা মিস্ নীলের এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। একান্ত আগ্রহ ও অনুরাগ সহকারে পাঠ আরম্ভ করিলেন। সে একাগ্রতা দেখিয়া স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণ মোহিতা হইলেন।

১২৯৭ সালের মাঘ মাসের ২৭শে মহামহা বারুণীর যোগ। মুরলার স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার কয়েকদিন পরেই এই যোগ উপলক্ষে মুরলার পিতা, বিমাতা, জেঠা, জেঠাই মা, ঠাকুর মা প্রভৃতি কালীঘাটে উপস্থিত হইলেন। সুপ্রসন্নের পক্ষে এই যোগ-স্নান একটা মহা সুযোগ হইল। সে ভাবিল, এই সময়ে মুরলা কালীঘাটে আসিবে। ইহা ভাবিয়া সেও কালীঘাটে আসিল। তারপর মুরলার এক ভগ্নীর জবানি পত্র লিখিয়া মুরলার সন্ধান জানিল। তারপর দ্বিতীয় পত্রে আরো বিষয় জানিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু অরবিন্দ তখন সুপ্রসন্নের চক্রান্ত বুঝিলেন। কালীঘাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এবার সুপ্রসন্ন অনেক সংবাদ পাইল। হতভাগ্যের রিপুর উত্তেজনা আবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

মুরলার সহিত তাহার পিতা সাক্ষাৎ করিলেন না। অশোকার পিতা প্রভৃতি কয়েকজন আত্মীয় আত্মীয়া কলিকাতা আসিয়া অশোকা, উমেশ ও মুরলাকে দেখিয়া গেলেন। মুরলার বর্ত্তমান পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ৩০শে মাঘ উমেশ কালীঘাটে তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া, কালীঘাটের সংক্রামক ওলাউঠার বীজ লইয়া কলিকাতায় আসিল। দুইদিন রোগ গোপনে রাখিল, তৃতীয় দিনে এই রোগের দারুণ প্রকোপে উমেশ, অল্পবয়সে, ভগ্নী অশোকা ও মুরলার প্রাণে বিষম আঘাত করিয়া পরলোক গমন করিল। অশোকা ও মুরলা সোণার ভাইকে হারাইয়া কত যে আকুলা হইলেন, আমরা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ। এই ঘটনা সুপ্রসন্নের খুব অনুকূল হইল। কেননা, উমেশ ভিন্ন সুপ্রসন্নকে আর কেহই চিনিত না। এখন যদি দু'বেলা সে পাড়ায় আগমন করে, তবুও কাহারও মনে সন্দেহ জন্মিবার উপায় নাই। উমেশের মৃত্যুর পর সুপ্রসন্ন আরো মাতিয়া উঠিল। এই সময়ে হঠাৎ একদিন মুরলার নামে স্কুলে কতকগুলি পত্র উপস্থিত হইল। মিস্ নীল, মুরলাকে পত্রগুলি গ্রহণ করিতে বলিলে, মুরলা বলিলেন,—"কোন পত্রই আমি গ্রহণ করি না, আমার অভি-

ভাবক অরবিন্দ বাবুর নিকট এ সকল পাঠাইয়া দিন্।" মিস্ নীল তদুত্তরে বলিলেন, তুমি হাতে করিয়া লইয়া যাও, অরবিন্দ বাবুকে দিও। মুরলার মনে অভিসন্ধি থাকিলে পত্রগুলি আনিতেন, কিন্তু তিনি সরলতার প্রতি-মূর্ত্তি, মুখেও যাহা, ভিতরেও তাহা; তিনি বলিলেন—"আমি কোন পত্র স্পর্শ করাকেও পাপ মনে করি, কেননা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি, কাহারও পত্র স্পর্শ করিব না। আপনি পৃথক্ লোক দ্বারা পত্রগুলি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিন্।" মিস্ নীল তাহাই করিলেন। পত্রগুলি পাইয়া অরবিন্দ কৃতজ্ঞচিত্তে মিস্ নীলকে ধন্যবাদ দিলেন এবং সতর্ক করিয়া দিলেন, কোন দুষ্ট লোক যেন স্কুলে যাইয়া মুরলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারে।

সুপ্রসন্নের পক্ষে এই সময়ে আর একটী অনুকূল অবস্থা ঘটিল। এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে অরবিন্দের রাঁচি যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নানা পারি-বারিক ঘটনায় যাওয়ার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। উমেশের মৃত্যুর কিছুদিন পর তিনি রাঁচি যাত্রা করিলেন। শোভার স্বামী এই সময়ে কলিকাতা রহিলেন। অরবিন্দ সুপ্রসন্নের প্রকৃতি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিলেন। পত্রাদি লেখা ভিন্ন আর যে কিছু সে করিতে পারিবে, ধারণাও ছিল না। তিনি বিশেষ কিছু আশঙ্কা না করিয়া রাঁচি যাত্রা করিলেন। ইহাও সুপ্রসন্নের একটী বিশেষ অনুকূল ঘটনা। আরো অনুকূল ঘটনা ঘটিল। এই সময়ে সম্মতি-আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় হিন্দুসমাজের লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের লোকের প্রতি ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। সুপ্রসন্ন এই সকল অনুকূল ঘটনা অবলম্বন করিয়া সীমলা ও কালীঘাট, দুই স্থানে বাসা নির্দ্দিষ্ট করিল। বরিশালের কতকগুলি বদ্‌মায়েস সীমলার একটী বাসায় বাস করিত, আর কতকগুলি বদ্‌মায়েস কালীঘাটে ছিল। এই দুই দল বদ্‌মায়েস সুপ্রসন্নের সহায় হইল। সুপ্রসন্ন ঘটনার স্রোতে গা ঢালিয়া মাতিয়া উঠিল।

প্রথমতঃ, মুরলার সহিত হিন্দুগান্ধর্ব্ব মতে তাহার বিবাহ হইয়াছে, এই মর্ম্মে একখানি কাগজ ছাপাইয়া সুপ্রসন্ন চতুর্দ্দিকে বিলি করিল। তারপর হিন্দুসমাজের দুষ্টলোকদিগকে বুঝাইল, তাহার স্ত্রীকে ব্রাহ্মেরা বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তারপর অরবিন্দের নিকট সমস্ত অবস্থা লিখিল। তাহার উত্তর না পাইয়া ক্রমাগত মুরলার নামে পত্র লিখিতে লাগিল। কেবল তাহা নহে, রাস্তায় দাঁড়াইয়া মুরলাকে দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতে

লাগিল; সমাজে, স্কুলে পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে লাগিল। কোনরূপে মনস্কামনা পূর্ণ হইতেছে না দেখিয়া শেষে ভয়ানক মাতিয়া উঠিল।

অরবিন্দ বাবু রাঁচিতে বসিয়া সকল শুনিলেন, তিনি প্রথমতঃ স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়দিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন, শেষে মুরলার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। মুরলা অরবিন্দের আগমনের জন্য অস্থির হইলেন, সর্ব্বদাই বলিতেন,—"চৌধুরী মহাশয় আসিলে আমি বাঁচি।" ক্রমাগত সুপ্রসন্নের পত্র আসিতেছে শুনিয়া অরবিন্দ শোভার স্বামীকে পত্র সকল ফেরত দিতে লিখিলেন। এই সময়ে বহু পত্র ফেরত দেওয়া হইল। যে সকল পত্র শোভার স্বামী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যে সকল কথা ছিল, সে সকলের কথা পরে উল্লেখ করা যাইবে।

মুরলার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইবার পূর্ব্বে একদিন এই ঘটনাটী ঘটিয়াছিল— স্কুলের গাড়ী রাস্তায় লাগিয়াছে, মুরলা গাড়ী হইতে নামিয়া আসিতেছেন, অমনি সুপ্রসন্ন আসিয়া মুরলার সম্মুখে দাঁড়াইল। মুরলা বিরক্তি সহকারে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া পাশ কাটিয়া চলিয়া আসিলেন। এই ঘটনায় সুপ্রসন্ন ক্রোধে অধীর হইল। একখানি পত্রে লিখিল, "তুমি আমাকে যেরূপ অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া অপমান করিয়াছ, একদিন ইহার প্রতিশোধ পাইবে।"

সুপ্রসন্নের ক্রোধের আরো কারণ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিল, মুরলার সহিত অপর একব্যক্তির বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। সুপ্রসন্ন পরবর্ত্তী বহুপত্রে এই কথা ধরিয়া মুরলাকে ঠাট্টা করিয়াছিল।

কোন দিন স্কুলের গাড়ী যাইতেছে, সুপ্রসন্ন রাস্তায় দাঁড়াইয়া অস্ত্র লইয়া মুরলাকে ভয় দেখাইতেছে। কোনদিন মুরলা ছাদে উঠিয়াছেন, সুপ্রসন্ন রাস্তায় দাঁড়াইয়া ভয় দেখাইতেছে। উমেশ সুপ্রসন্নকে চিনিত, সে নাই, আর কে ইহাকে বাধা দিবে? গোপনে, অলক্ষিতে এইরূপ সুপ্রসন্ন মাতিয়া উঠিল। মুরলা অশোকার নিকট সমস্ত খুলিয়া বলিতেন, "দিদি, চৌধুরী মহাশয় আসিলে আমি বাঁচি।"

এই সময়ে অরবিন্দের একমাত্র অভিন্নহৃদয় বন্ধু সুরেশ বাবু কলিকাতা হইতে আসিয়া অরবিন্দের সাক্ষাতের আশায় তাঁহার বাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। মুরলা এই সাধু ব্যক্তির নিকট অনেক সময় স্কুলের

পাঠ বুঝিয়া লইতেন। মুরলা যদিও চিন্তিতা, কিন্তু পড়ায় অমনোযোগ নাই। দিন রাত্রি পড়েন। মুরলার সকল আসক্তি পড়ার উপর। মুরলার প্রকৃতি দেখিয়া এবং পড়ার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া সুরেশবাবু খুব আনন্দিত হইলেন। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শেষ উপদেশ।

স্কুলে যাওয়া বন্ধ হওয়ার পর সুপ্রসন্ন আরো বিবিধ উপায় অবলম্বন করিল। সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর যে সকল লোক ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধে নানাবিধ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সুপ্রসন্ন তাহাদের সহিত যোগ দিল, এবং ব্রাহ্মসমাজে, অরবিন্দের বাড়ীতে সর্ব্বদা ঢিল ছুড়িতে লাগিল। সমাজ হইতে আসিবার সময় একদিন মুরলাকে তাড়া করিল। পুনরুত্থানকারীর দল যেন এই সময়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল যে, ব্রাহ্মসমাজের মন্দির ভাঙ্গিবে, সমস্ত ব্রাহ্মদিগকে বধ করিবে! সুপ্রসন্ন এই দলে যোগ দিল। ভয়ানক উত্তেজনা চলিতে লাগিল। এরূপ উত্তেজনা বাঙ্গালীর মধ্যে বহুদিন দেখা যায় নাই।

অরবিন্দ সমস্ত বিবরণ শুনিয়া অবিলম্বে কলিকাতা পৌঁছিলেন। কলিকাতা পৌঁছিয়া সমস্ত শুনিলেন। এই সময়ে সমস্ত দিন ব্রাহ্মপাড়ায় পুলিসের পাহারা থাকিত। বুধবার অরবিন্দ কলিকাতা পৌঁছিয়া সমস্ত পত্রাদি পাঠ করিলেন। সুরেশ বাবুর সহিত বহুকালের পর সাক্ষাৎ হইল, ৩।৪ দিন পারিবারিক বিষয়ে আর মন দিতে সময় পাইলেন না। সময় তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিল। অরবিন্দের আগমনে মুরলার ভাবনা গিয়াছে, মুরলা এখন গভীররূপে পড়া শুনায় মন দিয়াছেন। এই সময়ে যে সকল দীর্ঘ দীর্ঘ পত্র উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিতে গেলে দশখানি পুস্তক লিখিতে হয়। কেবল কয়েক খানি পত্রের কথা লিখিলাম। কোন পত্রে এইরূপ ছিল,—"আমি দরিদ্রের সন্তান, তোমার জন্য রাস্তায় রাস্তায় অনাহারে বেড়াইতেছি, দোহাই তোমার, একটু দয়া কর। আমি তোমাকে পাইলে সংসার ছাড়িয়া বনে যাইব। আমার এখন আর বিপুর উত্তেজনা নাই।

তুমি চলে এস, আমরা একত্রে ভাই ভগ্নীর ন্যায় জীবন কাটাইব।” কোন পত্রে,—“আমি বুধবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব, তুমি যদি এই সময়ের মধ্যে না আইস, আমি বিষ খাইয়া মরিব।” কোন পত্রে,—“তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, অরবিন্দ বাবুকে একথা লিখিয়াছি। আমি ব্রাহ্মদের নিকট শুনিয়াছি, অরবিন্দ বাবু আমার কথা উপেক্ষা করিয়া অন্যের সহিত তোমার বিবাহের আয়োজন করিয়াছেন। তিনি এক জন পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি, তাঁহার এরূপ মতিভ্রমের কারণ কি, বুঝিতেছি না। আমার মনে হয়, তুমি সমস্ত কথা অস্বীকার করিয়াছ। মুরলা, আর মিথ্যার আশ্রয় লইও না। সব তাঁহার নিকট স্বীকার কর। তিনি কখনও আমাদের পথে কণ্টক রোপণ করিবেন না। যদি তাঁহাকে না বল, আর যদি অন্যের সহিত তোমার বিবাহ হয়, তবে তোমাকে নিশ্চয় খুন করিব।” কোন পত্রে,—“আমি তোমার জন্য অস্থির হইয়াছি। আমার হাতের টাকা কড়ি সব ফুরাইয়া গিয়াছে, তোমার যে দুইখানি পুস্তক ছিল, তাহা ফেরত পাঠাইলাম। কিছু টাকা পাঠাইবে, তুমি যদি না আইস, আমার খরচের টাকার বন্দোবস্ত করিবে।” কোন পত্রে,—“হিন্দু সমাজের লোকেরা ব্রাহ্মদের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছে, আর ভয় নাই, কালীবাড়ীতে পূজা দিয়াছি। আমার বন্ধুরা সকলে প্রস্তুত হইয়াছেন, তুমি কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়া চলে এস। আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। পিতা, মাতা, আমার দুই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিব। তুমি যদি আদেশ কর, তাহাদিগকে বধ করিব। আমার প্রতিজ্ঞা দুর্জ্জয়, তা তুমি জান। যদি না আইস, তোমাকে লইয়া স্বর্গে যাইব। যেরূপে হয়, তোমাকে আনিবই আনিব। অরবিন্দ কার পথে বাধা দিতেছে, জানে না? আমি তার বুকেও ছুরি মারিব।” এই সকল পত্রের ভাষা, এবং লেখার পারিপাট্য অতি উচ্চ দরের। পড়িলে মোহিত হইতে হয়। অরবিন্দ ৩।৪ দিনের মধ্যে, কি করিবেন, কিছুই ঠিক্ করিতে পারিলেন না। সুপ্রসন্নের প্রকৃতি তিনি কিছুই জানেন না। পুলিসের হস্তে পত্রগুলি দিতে, একবার ইচ্ছা হইল, আবার ভাবিলেন, পুলিস এরূপ পত্র লইয়া কি করিবে? আমি সুপ্রসন্নকে চিনি না, তাহার হাতের লেখা জানি না, সে কোথায় থাকে, তাহাও জানি না। এরূপ অভিযোগ পুলিস গ্রহণ করিবে কেন? করিলেই বা পুলিস কি করিবে? আবার ভাবিলেন, মুরলাকে অন্যত্র পাঠাইব কি? মুরলা অন্যত্র

যাইতে রাজি নয়, তাঁহার বিশ্বাস, আমার এখানে থাকিলেই সে নিরাপদে থাকিবে। আমার উপর যাঁহার এত বিশ্বাস, তাঁহার জন্য জীবন দিতে আমি কুণ্ঠিত হইব কেন? দেখিতেছি, খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে সুপ্রসন্ন আমাকে, নয় মুরলাকে হত্যা করিবে; যদি তাহাই হয়, প্রতিবিধানের উপায় দেখি না। মুরলার জন্য মরিতে কাতর নই, কিন্তু যদি আমাকে ছাড়িয়া সে মুরলাকে মারে, আমার দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। মুরলার জন্য আমাকে খুব সতর্ক থাকিতে হইতেছে। শনিবার অপরাহ্নে এই রূপ ভাবিলেন; রবিবার প্রাতে বাড়ীর প্রাঙ্গণে একখানি ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ডসহ একখানি ছিন্ন বস্ত্রে বাঁধা অবস্থায় সুরেশ বাবু একখানি পত্র পাইলেন। সুরেশ বাবুকে অরবিন্দ সমস্ত কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। সুরেশ বাবু পত্র খানি পড়িলেন এবং অরবিন্দ নীচে আসিলে তাঁহার হাতে দিলেন। পত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখা ছিল, "তুমি কিছুতেই কথা শুনিলে না, দেখিতেছি। আমার মনে হয়, তোমাকে অরবিন্দ বাবু আমার পত্র দিতেছেন না। তুমি ছাদে উঠিয়া আমাকে প্রত্যহ ভয় দেখাও যে, কেমন নিরাপদ স্থানে আছ! কিন্তু মনে রাখিবে, আমি বরিশালের লোক, খুন করিতে আমরা একটুও ডরাই না। মনে রাখিবে, সাধুর দশ দিন, চোরের একদিন। এই বয়সে কত খুন করিয়াছি, তুমি সকলই জান। কাল রবিবার, সমাজের দিন, বেশ সুসময়, সকল লোক সমাজে গেলে তুমি চলিয়া আসিবে। আমরা রাস্তায় তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।" অরবিন্দ পত্র খানি পড়িয়া খুব চিন্তিত হইলেন। প্রথমতঃ গোপনে মুরলার বাক্স প্রভৃতি অনুসন্ধান করিলেন, মনে হইল, মুরলার মনে যদি সুপ্রসন্নের প্রতি একটুও অনুরাগ থাকে, তবে তাহাতে বাধা দেওয়া অবৈধ; বাঁধা দিলেও ফল পাইব না, মধ্য হইতে প্রাণ হারাইব। মুরলার প্রতি তাহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, তবুও কি জানি, মানুষের মন পরিবর্ত্তিত হইতে কত সময় লাগে, এইরূপ ভাবিয়া, সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। কোথাও সুপ্রসন্নের কোন পত্র পাইলেন না। ভাবিলেন, মুরলা সত্য সত্যই দেবী। এই দেবীকে তার পর ডাকিলেন। সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন, "দেবি, আপনার মনে যদি কোন অভিসন্ধি থাকে, আমাকে খুলিয়া বলুন, কেন না, আমি আপনার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। যদি সুপ্রসন্নের প্রতি আপনার আসক্তি থাকে, এ হতভাগ্যের জীবন বলিদানের কোন প্রয়োজন নাই। আমা দ্বারা

স্বপ্নে বা কল্পনায়ও আপনার কোন অনিষ্ট চিন্তিত হয় নাই, পারি আর না পারি, সাধ্যমত আপনার মঙ্গলের জন্য এপর্য্যন্ত চেষ্টা পাইয়াছি। দোহাই ধর্ম্মের, সরল প্রাণে বলুন, সুপ্রসন্নের প্রতি আপনার কোন আসক্তি আছে কি না ?” মুরলার নয়নাশ্রু দুইগণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল, বলিলেন, “আমি আপনার চরণে শত শত বার অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু একদিনও মিথ্যা বলি নাই। আপনার মনে যখন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহা দূর করার আমার আর উপায় নাই। আমার মৃত্যুর পর এ কথার উত্তর পাইবেন।”

অরবিন্দ সজল নেত্রে বলিলেন, “আপনার প্রতি আমার অবিশ্বাস হয় নাই, আপনি কাঁদিবেন না। এ পৃথিবীতে কত লোক অপরাধী, বিধাতাই জানেন। তাঁহার অপার দয়ায় সকলে ক্ষমা পায়। মেরি মেগ্‌ডেলিন, সেণ্ট আগষ্টটাইন, বিল্বমঙ্গল, জগাই, মাধাই কত অপরাধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার কৃপায় শেষ জীবনে স্বর্গীয় পুণ্যপ্রভায় উজ্জ্বল হইয়া মানব-কুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। এরূপ কত কত লোক যে পৃথিবীতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, সংখ্যা নাই। আমরা চিন্তা এবং কাজে, সকলেই তাঁহার নিকট অপরাধী, কিন্তু তাঁহার অপার দয়া, এক দিনের জন্যও আমাদিগকে তিনি পরিত্যাগ করেন না। আপনি স্থির হউন। মঙ্গলময়ী বিশ্বজননী আপনার প্রতি প্রসন্ন নয়নে তাকাইয়াছেন। তাঁহার প্রভায় আপনি পবিত্র হইয়াছেন, পুণ্য-বসন পরিধান করিয়াছেন। পৃথিবীর পাপ ক্ষালিত হইয়াছে, নিন্দুকের মুখ মলিন হইয়াছে। আমার মনে সন্দেহ নাই, অধিকন্তুতে কোন দোষ নাই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অপরাধ হইয়া থাকিলে, মার্জ্জনা করুন। বিধাতা আপনার মঙ্গল করুন।”

মুরলার চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আর কোন কথা বলিলেন না, মনে ভাবিলেন, ধর্ম্মের জন্য এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি, তবে আমার মনের ক্ষোভ মিটিবে। অরবিন্দ সে স্থান হইতে উঠিয়া আসিলেন।

এই দিন দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অরবিন্দের ভবানীপুর যাওয়ার কথা ছিল। প্রাতে সুরেশ বাবু বলিয়াছিলেন যে, তিনিও যাইবেন। কিন্তু অপরাহ্নে সুরেশ বাবু যাইতে অস্বীকার করিলেন, বলিলেন, কাল্ আমরা বাড়ী যাইব, আমাদিগকে দেশে বিদায় করিয়া দিয়া আপনি ভবানীপুর যাইবেন। সুতরাং অরবিন্দের ভবানীপুর যাওয়া হইল না। রাত্রে সমা-

জেও গেলেন না। মুরলাকে লইয়া একত্রে উপাসনা করিলেন এবং তৎপর অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। এই-ই শেষ উপদেশ, এই-ই শেষ উপাসনা। অরবিন্দ প্রাণ ভরিয়া সে দিন নানা কথা বলিলেন, কিন্তু বুঝিলেন না, মুরলার জন্য যাহা কিছু কর্ত্তব্য, আজই শেষ হইল। হতভাগিনীর শেষ মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভীষণ দৃশ্য।

আজ সোমবার, আজ বড় বিশেষ দিন। অদ্যকার কথা আমরা ঠিক্ লিখিতে পারিব বলিয়া আশা করিতে পারিতেছি না। প্রাণ অস্থির হইতেছে, লেখনী কাঁপিতেছে। বিধাতা, তুমি সহায় হও। লেখনি, তুই সাবধান হ; সত্য ঘটনা না লিখিতে পারিস্ ত, চিরদিনের জন্য তোকে বিসর্জ্জন দিব; কাহারও মুখ চাহিবি না, প্রাণের কথা লিখিয়া যা।

আজ সোমবার, আজ বড় কাজের ভিড়। অরবিন্দের মাসিক পত্রিকা বাহির হইতে আর বিলম্ব নাই, অনুপস্থিতি কালে যে সকল পত্র আসিয়া জমিয়াছে, আজও তাহার উত্তর দেওয়া হয় নাই। কাগজ বাহির হওয়ার পূর্ব্বে পত্রগুলি শেষ করা চাই, তাই আজ প্রাতেই অরবিন্দ পত্রের স্তূপ লইয়া আফিস ঘরে টেবিলের সম্মুখে বসিয়াছেন। আজ অপরাহ্নে সুরেশ বাবু বাড়ী যাইবেন, সে একটা চিন্তা আছে। বৈকালে ভবানীপুর যাইতে হইবে, সে দিন না গেলে অরবিন্দের দাদা কার্য্য স্থানে চলিয়া যাইবেন, সাক্ষাৎ হইবে না, এ একটা ভাবনা; তার উপর ভাবনা, যথা সময়ে পত্রিকা বাহির করিতে হইবে। বেলা ৯টার সময় অরবিন্দের ছোট ভাই ভবানীপুর হইতে কলিকাতা আসিয়া অরবিন্দকে বলিল, আপনি কাল ভবানীপুর যান নাই বলিয়া বড় দাদা বড় ব্যস্ত হইয়াছেন, আজ আপনাকে লইয়া যাইতে তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। ৯৷৷০ টার সময় ডাক আসিল। শোভার নিকট হইতে পত্র আসিল যে, তাহার একটী পুত্র মৃত্যু-শয্যায়—তাহাকে কলিকাতা না আনিলে নয়। অরবিন্দ বড় ব্যস্ত; পত্রগুলি শেষ করিতে পারিতেছেন না। আফিসে

অরবিন্দের ছোট ভাই, শোভার স্বামী এবং আরো দুই তিন জন লোক উপস্থিত। শোভার স্বামী একাধিক বার অরবিন্দকে প্রশ্ন করিয়াছেন,—"আমি আজই কি হাজারিবাগ রওয়ানা হইব?" কাজের ভিড়ে চিন্তা করিতে অবসর পান নাই বলিয়া অরবিন্দ এ কথার উত্তর দিতে পারেন নাই। ১০ টার সময় মিস্ নীলের স্কুল হইতে পত্র আসিল যে, "মিস্ নীল বিলাত যাইবেন, তাঁহাকে বিদায় ভোজ দেওয়ার জন্য স্কুলে সকল মেয়েকে যাইতে হইবে।" অরবিন্দ এও এক সমস্যায় পড়িলেন। মনে ভাবিলেন, ভবানীপুর যাওয়ার সময় মেয়েদিগকে স্কুলে যাইতে নিষেধ করিয়া যাইব। বেলা বাড়িতে লাগিল। অরবিন্দ কাজের স্রোতে ভাসিতেছেন। ১১॥০ টার সময় হঠাৎ আফিস ঘরে একজন লোক ত্রস্ত হইয়া প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই লোকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, কাঁপিতে লাগিল। অরবিন্দ বলিলেন, বসুন্, আপনি কি চান? লোকটা অবাক্ হইয়া গিয়াছে, কিছুই উত্তর করিতে পারিল না। অরবিন্দ আবার বলিলেন,—আপনি কি চান? সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আপনি কি চান? শেষে একটু বিশ্রামের পর লোকটা বলিল,—"আমার বাড়ী ইলুহার (বরিশাল), আমার হাতে টাকা নাই, আমি বাড়ী যাইতে পারিতেছি না, আমাকে কিছু সাহায্য করুন্।" অরবিন্দ বলিলেন—"আপনি কোথায় থাকেন? আপনাকে কে জানেন? আপনি যদি আমার কোন পরিচিত লোকের সার্টিফিকেট আনিতে পারেন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিব।" লোকটা উত্তর করিল, আমি সীমলা—কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে থাকি, লাহাবাবুদের দেওয়ান সতীশ বাবু আমাকে জানেন, তাঁহার সার্টিফিকেট আনিতে পারি।" অরবিন্দ বলিলেন, "তাঁহাকে আমি জানি না, ঐ বাসা জানি, ঐ বাসায় চক্রধরপুরের বিজয় চন্দ্র ঠাকুরতা থাকিতেন। বাসা চিনি, কিন্তু সতীশ বাবুকে চিনি না। আপনি আমার পরিচিত লোকের সার্টিফিকেট আনিবেন।" এ কথার পরও লোকটা উঠিল না। বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, প্রাণে গভীর চিন্তা। শেষে অরবিন্দের ভাই পীড়াপীড়ি করিয়া লোকটাকে উঠাইয়া দিল। অরবিন্দ ভাবিলেন, এই লোকটা কি সুপ্রসন্ন? আমাকে হত্যা করিতেই বা আসিয়া থাকিবে! যাহা হউক, আজ আর সময় নাই, কাল্ ঐ বাড়ীটা একবার অনুসন্ধান করিতে হইবে

কাজ করিতে করিতে ১টা বাজিয়া গেল। শেষে উঠিয়া অরবিন্দ আহার করিতে গেলেন। আহারান্তে সুরেশ বাবুকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে গেলেন। ভবানীপুর যাইতে হইবে বলিয়া স্বয়ং ষ্টেসনে না যাইয়া একটী ভৃত্যকে সঙ্গে দিলেন।। গাড়ী ছুটিলে বাড়ী ফিরিলেন! বাটী আসিয়া এক মুহূর্ত্ত ভাবিলেন, তার পর শোভার স্বামীকে বলিলেন,আপনিও আজই হাজারিবাগ গমন করুন, শোভাকে না আনিলে ছেলেটী বাঁচিবে না। শোভার স্বামী টাকা চাহিলেন এবং কতকগুলি জিনিষের একটী ফর্দ্দ দিলেন। অরবিন্দ টাকা দিলেন। অরবিন্দ ফর্দ্দের জিনিষ কিনিতে অন্য ভৃত্যকে বড়বাজারে পাঠাইবেন, ইতিমধ্যে শোভার স্বামী স্থানান্তরে গেলেন। ফর্দ্দের সমস্ত কথা অরবিন্দ পড়িতে পারিলেন না। তখনই তাঁহাকে ভবানীপুর যাইতে হইবে, ছোট ভাই সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে; খুব বিরক্ত হইলেন, ব্যস্তও হইলেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও শোভার স্বামীকে পাইলেন না, শেষে বিরক্ত হইয়া ফর্দ্দের যাহা যাহা পড়িতে পারিয়াছিলেন, সেই জিনিসগুলি আনিতে বড়বাজারে লোক পাঠাইয়া অন্যমনস্ক ভাবে ট্রাম গাড়ীতে উঠিলেন। পটলডাঙ্গা যাইয়া মনে হইল, স্কুলে যাইতে মেয়েদিগকে নিষেধ করিয়া আসি নাই, কাজটা ভাল হয় নাই। মুরলা স্কুলে যাইত না, অন্য মেয়েরা যাইত, তাহাদিগকে মিস্‌নীল বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, মুরলাকেও লইয়া আসিবে। অরবিন্দ একথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। তাঁহার মনে একটু চিন্তা উপস্থিত হইল, কিন্তু আর ফিরিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, "৪টার সময় সভা হইবে, ২ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিবে না, সন্ধ্যার মধ্যে মেয়েরা নিশ্চয় বাড়ীতে ফিরিবে। এখন না গেলে বড় দাদার সহিত দেখা করিয়া যথাসময়ে ফিরিয়া শোভার স্বামীকে রওয়ানা করিতে পারিব না।" এইরূপ ভাবিয়া, আর ফিরিলেন না, ভবানীপুর চলিলেন। এ একটী মহাভুল হইল। বিধাতা যেন কি আয়োজন করিতেছেন, নচেৎ এরূপ ভুল অরবিন্দের কখনও হইত না। যাহা হউক, রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় অরবিন্দ ভবানীপুর হইতে বাসায় ফিরিলেন। শোভার স্বামী অরবিন্দের বিলম্ব দেখিয়া বড় ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অরবিন্দ আসিয়াই তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। যে পুরাতন ভৃত্যটী সুরেশবাবুকে হাবড়া ষ্টেসনে দিতে গিয়াছিল, তাহাকেই এবারও পাঠাইলেন। অরবিন্দ দুবেলা স্নান করেন, হাতে গামছা, স্নান করিতে যাইবেন, মনে আশা। গাড়ী যখন গজেন্দ্র গমনে চলিল, তখন অরবিন্দ বাসায়

ফিরিলেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন। শোভার স্বামী ও সুরেশ বাবুকে বিদায় দিয়া মনটা খারাপ হইয়াছে। তাহার উপর দারুণ চিন্তা, স্কুলে মেয়েরা গিয়াছে, তাহারা এখনও ফিরে নাই। বাড়ীতে আসিয়া আফিসে দেখিলেন, ৩।৪ খানি পত্র রহিয়াছে; তন্মধ্যে এক খানি পত্র মুরলার নামাঙ্কিত। পত্র খুলিবার সময় নাই। অশোকাও আফিস ঘরে। অরবিন্দ পত্র হাতে করিয়া চিন্তা করিতে করিতে স্ত্রীকে বলিলেন, "বড় চিন্তায় পড়িয়াছি, কি করিব, উপায় পাইতেছি না! মুরলাকে কোথাও পাঠাইয়া দিতে ইচ্ছা, কিন্তু মুরলা যাইতে চান না। তিনি বলেন, অন্যত্র গেলে আরো বিপদ ঘটিবে। কথাটা ঠিক্, কিন্তু কি করিব, বুঝিতেছি না। মেয়েদিগকে স্কুলে যাইতে দেওয়া আজ ভাল হয় নাই; আমি ভু'লে নিষেধ করিয়া যাই নাই। এখনও স্কুলের গাড়ী আসিল না, ইহা বড়ই চিন্তার কথা। স্কুলে লোক পাঠান উচিত। পাঠাইবই বা কাহাকে? পুরাতন লোকটা ত ষ্টেসনে গিয়াছে, নূতন লোকটা স্কুল চিনে না। আমার শরীর অবসন্ন, কিন্তু আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। আমিই যাই।"—এই বলিয়া অরবিন্দ উঠিয়াছেন, এমন সময়ে দুটী মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, শীঘ্র গাড়ীর নিকট যান, সেখানে মারামারি লাগিয়াছে। অরবিন্দ বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা আর ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। দেখিলেন, পাড়ার রাস্তা যেখানে ফুটপাতে পড়িয়াছে, ঠিক্ তাহার মাথায় একটী স্ত্রীলোক রক্তাক্ত কলেবরে মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিয়াছে; সম্মুখে বড় রাস্তায় একখানি গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর সেখানে জন প্রাণী নাই, পার্শ্বের বাড়ীর দরজা আবদ্ধ রহিয়াছে। গাড়ীতে বাতি জ্বলিতেছে, এবং বড় রাস্তার অপর ধারের গ্যাসের আলো ও পার্শ্বের ঘরের গ্যাসের আলো জানালা দিয়া বাহির হইতেছে। রাত্রি তখন ১০ টা কি ১০—১৫ মিনিট, ইহারই মধ্যে এই ভীষণ ঘটনা ঘটিয়াছে! এ কি কলিকাতা সহর, না, গভীর অরণ্য? একজন পুলিসের লোক নাই, একজন রাস্তার লোক নাই, ঘটনা দেখিয়া সব পলায়ন করিয়াছে! গাড়ীর গাড়োয়ান পর্য্যন্ত নাই! কেবল একটী স্ত্রীলোক রক্তাক্ত কলেবরে মৃত্তিকায় বিলুণ্ঠিতা! সে ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া অরবিন্দের মাথা ঘুরিয়া গেল, ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইয়া কি করিবেন, ভাবিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সকলই যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

এই কি মুরলা? মুরলাই কি হত হইয়াছেন? ভাবিতে অরবিন্দের প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বহুলোক সেখানে উপস্থিত হইল। অরবিন্দ শুনিলেন, পাড়ার আর একটী লোকও আহত হইয়াছেন। মুহূর্ত্ত পরে আলোকের সাহায্যে মুরলার রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া বুঝিলেন, মুরলা দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছেন! দেখিলেন, দারুণ অস্ত্রাঘাতে মুরলার সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে! পরিধানের বস্ত্র রক্তময়, মস্তকের কেশ হইতে পা পর্য্যন্ত সব রক্তময়! রক্তের স্রোতে রাস্তা ভাসিয়া গিয়াছে! অরবিন্দ মুরলার হাত ধরিয়া দেখিলেন, নাড়ী নাই। নাসিকায় হাত দিয়া দেখিলেন, নিশ্বাস বহিতেছে না। এই বিশ্ব সংসার অরবিন্দের মস্তকের নিকট যেন ঘুরিতে লাগিল। পূর্ব্বে তিনি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িতে লাগিল। তিনি বিহ্বলচিত্তে মুরলাকে লক্ষ্য করিয়া পাগলের ন্যায় বলিলেন, "মুরলে, এত দিনে তুমি চলিলে? হায়, এত দিনে আমাদিগকে ফাঁকি দিলে? বাল্যকাল হইতে তুমি অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ—এ পৃথিবীতে কেহ তোমার কষ্ট বুঝে নাই, কেহ তোমার মুখের পানে তাকায় নাই। হায়, আজ তুমি সব কষ্ট ভুলিলে! হায়, আমি কি মানুষ? সত্যই কি তুমি গিয়াছ? কথা বল। মুরলে, তুমি ত আমার সহিত কথা বলিতে খুব ভালবাসিতে, আজ আর একটীবার কথা বল। হায়, তোমার এ দশা কে করিল? বুঝিয়াছি, হতভাগ্য সুপ্রসন্ন ভালবাসার পুরস্কার দিয়াছে! হায়, এই কি ভালবাসার পরিণাম? আমি ইহার উপযুক্ত প্রতিবিধান করিব, দুঃখ ক্ষোভ রাখিও না, চল, উঠিয়া ঘরে চল। এ ধূলি-শয্যা কি তোমার এ স্বর্গীয় দেহে শোভা পায়? মৃত্তিকা কি তোমার পবিত্র আত্মার পক্ষে শোভা পায়? চল, মুরলে উঠ, তোমার চৌধুরী মহাশয় কাছে দাঁড়াইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন, অভিমান ছাড়িয়া গৃহে চল। তুমি কিছুতেই যাইবে না? আমি তোমার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলাম বলিয়া কি তুমি আমাকে শাস্তি দিতেছ? ব্রাহ্মসমাজ তোমার মর্য্যাদা বুঝে নাই বলিয়া অভিমান করেছ? আমি বুঝিয়াছি, আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। আমি বুঝিয়াছি, তুমি মানবী নহ, তুমি দেবী। আমি বুঝিয়াছি, তুমি ধর্ম্ম ও চরিত্র রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে পার। পায়ে ধরি, আমাকে ক্ষমা কর, উঠ, ঘরে চল। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, ব্রাহ্মসমাজকে ক্ষমা কর,

নচেৎ তোমার অভিশাপে নরকেও আমাদের স্থান হইবে না! তোমার দিদি অশোকা ঐ দেখ কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন, ঐ দেখ ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন লোক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বৈরনির্য্যাতনের আস্ফালন করিতেছেন! তুমি ত আমার চিন্তায় কত কাতর হইতে, আজ কি একবারও অনুরোধ শুনিবে না? তোমাকে কি আমি যাইতে দিব? তোমাকে যাইতে দিব না, তোমাকে হৃদয়ে পূরিব। তুমি ত কাহার কোন অপরাধ স্মরণ রাখ না; তবে আজ কেন অভিমান করিতেছ, উঠ, চল, আমাকে রাখ।” এই বলিয়া অরবিন্দ মুরলার হস্ত ধরিলেন, মুরলার রক্ত তুলিয়া মস্তকে দিলেন, তারপর আবার পাগলের মত বলিলেন, “বুঝেছি, তুমি তোমার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছ। এ জগতে ধর্ম্মরক্ষা করিতে জীবন দিয়াছিলেন খ্রীষ্ট, আর আজ তুমি জীবন দিলে! ইহাতে তোমার কলঙ্ক কি? তোমার জীবন বঙ্গভূমির আদর্শ হইবে, ঘরে ঘরে তোমার গুণ কীর্ত্তিত হইবে। বিশ্বজননী তোমাকে কোলে তুলিতে ঐ দেখ আসিয়াছেন।” অরবিন্দের সর্ব্বশরীর শিথিল হইয়াছে, ভাববিহ্বলতায় তিনি মৃতবৎ, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। ইতিমধ্যে স্কুল হইতে মিস্ নীল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মানবী নহেন, দেবী। তিনি মুরলাকে কোলে তুলিলেন। সে যেন এক স্বর্গের দৃশ্য। তখনই গাড়ী ডাকা হইল। অরবিন্দ মুরলাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। একজন বন্ধুকেও গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। মিস্ নীল এবং ঐ বন্ধু গাড়ীতে উঠিয়া মুরলার মৃতদেহ মেডিকেল কলেজে লইয়া গেলেন। অরবিন্দ পাড়ার অন্য আহত ব্যক্তিকে কলেজে পাঠাইয়া ঘরে আসিলেন। ঘরে তখন হাহাকার উঠিয়াছে—অশোকার ক্রন্দনধ্বনিতে গগন মেদিনী কম্পিত হইতেছে। গৃহে আসিবামাত্রই বহুপুলিসের লোক উপস্থিত হইল। অরবিন্দকে পুলিসের লোকেরা ডাকিলেন। অশোকা কিছুতেই অরবিন্দকে ঘরের বাহিরে যাইতে দিতে চাহেন না। অরবিন্দ বলিলেন, “তুমি কি পাগল হয়েছ, পুলিসের মোকদ্দমা, আমি না গেলে চলিবে কেন?” অরবিন্দ উপর হইতে আফিস ঘরে আসিলেন, আফিস ঘরে গ্যাস জলিতেছিল। পুলিস কমিসনার, ডেপুটী কমিসনার, ৪।৫ জন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, ইন্‌স্পেক্টর, ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর, সব ইন্‌স্পেক্টর—রাস্তা, বাড়ী সব পুলিসময়। বলিহারি কলিকাতা পুলিসের বন্দোবস্ত! ব্রাহ্মসমাজের বহুলোক তখন একত্রিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,

সম্মতি আইনের জন্য হিন্দুরা এই প্রতিশোধ তুলিয়াছে। অরবিন্দ তাহাতে খুব বিরক্ত হইতেছেন, কিন্তু, কাহার মুখ বন্ধ করিবেন? যাহার যেরূপ ইচ্ছা, স্বাধীনভাবে নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পুলিসের লোক আসিয়া অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকল লোক বলিতেছে, সম্মতি-আইনের জন্য হিন্দুরা এই প্রতিশোধ তুলিয়াছে, আপনি এ সম্বন্ধে কি বলেন?" অরবিন্দ ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন, সে দিন ১১ টার সময় যে একটী লোক আসিয়াছিল, তাহাও বলিলেন। তাঁহার নিকট যত পত্র ছিল, সে সব দিলেন, এবং বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, সুপ্রসন্নই এই কাণ্ড করিয়াছে এবং ইহাও বিশ্বাস, ১১ টার সময় যে লোক আসিয়াছিল, তাহার সহিত এই ঘটনার যোগ আছে। সে লোক দেওয়ান বাড়ীতে থাকে, চলুন, সেখানে যাই।" অরবিন্দের সত্যনিষ্ঠা ও সাহসের পরিচয় পাইয়া পুলিস খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কোথায় ঘরের গুপ্ত কথা আরো ঢাকিবে, না অরবিন্দ সকল অম্লানচিত্তে বলিতেছেন। এ কি মানুষ? ডিটেক্‌টিভ্ ইন্‌স্পেক্টর ও সব ইন্‌স্পেক্টর উভয়ই সদাশয় এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তাঁহারা বলিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, আমাদের হাতে এই সকল পত্রের কোনরূপ অপব্যবহার হইবে না। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন বন্ধু আফিস ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "অরবিন্দ বাবু, আপনি কি করিতেছেন? সমস্ত মান সম্ভ্রম ডুবাইয়া বিষয়টী মাটী করিতেছেন?"

অরবিন্দ বলিলেন—সত্য, সত্যই থাকিবে; সত্য, সত্যই থাকুক্। সত্যকে ধরিয়া এত বড় হইয়াছি, আজও সত্যকে ধরিয়া থাকিব। মান সম্ভ্রম কিছু চাই না, সত্যের জয় হউক্।

জনৈক বন্ধু বলিলেন, আপনার কি বিশ্বাস হয় না যে, হিন্দুরা চক্রান্ত করিয়া এই খুন করিয়াছে?

অরবিন্দ। ইহার মধ্যে হিন্দু-চক্রান্ত থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার মূল সম্মতি-আইন নহে। হিন্দু সমাজের লোক এই খুন করিয়াছে বটে, কিন্তু অন্য কারণে।

অন্য বন্ধু। আপনার কি স্থির বিশ্বাস এইরূপ?

অরবিন্দ। হা, আমার স্থির বিশ্বাস এইরূপ?

পূর্ব্ব বন্ধু। যদি তাহাই হয়, তবুও কি সতর্ক হওয়া উচিত নয়? এক-

বার ভাবুন, এইরূপ করিলে ঘরের কথা বাহিরে যাইবে, ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা হইবে!

অরবিন্দ। ঘরের সত্য কথা বাহির হউক, আমি তাহাতে ভীত বা সঙ্কুচিত নই। মুরলা এবং আমাদ্বারা যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কলঙ্ক না হয়, তাহা অবশ্য করিব। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

বন্ধুরা বেগতিক দেখিয়া চটিয়া লাল হইলেন এবং আফিস ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। অরবিন্দ পুলিসের সহিত সুপ্রসন্নের অন্বেষণে বাহির হইলেন। পথের মধ্যে আর একদল বন্ধু অরবিন্দকে ধরিয়া বলিলেন—"কি করিতেছেন?"

অরবিন্দ উত্তর দিলেন, "যাহা সত্য, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতেই চেষ্টা করিতেছি।" এমন ভাবে কথা কয়েকটী বলিলেন যে, আর কেহ কোন কথা বলিল না। অরবিন্দের হাতে সেই গামছা, কাহারও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বীরের ন্যায় পুলিসের সহিত চলিলেন। পরদিন বেলা ১২টা পর্য্যন্ত অরবিন্দকে পুলিসের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রতিহিংসার জয় বা ভালবাসার পুরস্কার!

সুপ্রসন্নের আশা ছিল, মুরলা শনিবারের মধ্যে নিশ্চয় পত্রের উত্তর দিবে, তাহা যখন দিলনা, তখন সে একেবারে মাতিয়া উঠিল। শনিবার, রবিবার, দুই দিন কিছুই আহার করিল না; মনের ইচ্ছা, একটা কিছু না করিয়া আহার করিবে না। বড়বাজার হইতে একখানি ছুরী ক্রয় করিয়া আনিল, বাজার হইতে আফিং কিনিল, প্রতিজ্ঞা, মুরলাকে খুন করিয়া নিজে আফিং খাইয়া মরিবে। রবিবারও যখন পত্র পাইল না, তখন আরো অস্থির হইল। কালীঘাটের জনৈক বন্ধুকে পত্র লিখিল, "দাদা, তুমি ভিন্ন আমার আর এ সংসারে বন্ধু নাই। কালীঘাটে ঘর প্রস্তুত রাখিবে, হয়, মুরলাকে লইয়া কাল্ তোমার নিকট যাইব, না হয়, কাল্‌ই মুরলা ও আমার শেষ দিন। কালীবাড়ী পূজা দিবে যেন আমার বাসনা পূর্ণ হয়। আমি আর উত্তেজনা সহিতে পারিতেছি না। প্রাণান্তেও এ সকল কথা কাহাকে বলিবে

না। অরবিন্দবাবু কলিকাতায় আসিয়াছেন, মুরলার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মদের নিকট শুনিয়াছি, সোমবার মিস্ নীলের বিলাত গমন উপলক্ষে একটী সান্ধ্যসমিতি হইবে। এই উপলক্ষে নিশ্চয়ই মুরলা স্কুলে যাইবে। যাইবার সময়, নয় আসিবার সময়, আমি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। সম্মতি-আইনের ঘোর আন্দোলন চলিয়াছে, কাল্ ব্রাহ্মপাড়ায় ভয়ানক উপদ্রব হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মদিগকে খুন করিলেও রাস্তার লোক তাকাইবে না। কাল্, নিশ্চয় জানিও, কাল্ই তোমার ভাই বাসনা পূর্ণ করিবে। মায়ের বাড়ীতে ভক্তির সহিত পূজা দিবে। তোমার আদরের ভাই—সুপ্রসন্ন।"

এই পত্র লেখার পর আপন বাক্সে তিনখানি পত্র লিখিয়া রাখিল;—একখানি পিতার নিকট, একখানি মাতার নিকট ও আর একখানি বাসার বন্ধুদিগের নিকট। দুইখানি নিজের ফটোগ্রাফ কাগজে মুড়িয়া শেষোক্ত পত্রের সহিত এক বাণ্ডিলে রাখিল। মুরলার নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছিল এবং যাহা ডাকে ফেরত আসিয়াছিল, এমন ১১৬ খান পত্র এক বাণ্ডিল করিয়া রাখিল; শেষে একটু সুস্থির হইয়া রাস্তায় বাহির হইল। সেই সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সঙ্গে, সেই আফিং সঙ্গে। প্রথমতঃ সমাজে গেল। মুরলা কোথায় বসে, সুপ্রসন্ন জানে না; সুতরাং সমাজ হইতে উঠিয়া, মেয়েরা যে রাস্তা দিয়া সমাজে যায়, সেই রাস্তায় দাঁড়াইল। সেখানে অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে সাহস হইল না। একবার ইচ্ছা হইতেছে, মুরলাকে না পাই, অরবিন্দকে নিকাশ করি, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিতেছে, "অরবিন্দ কি করিয়াছে? কি করিয়াছে?—সেই ত সর্ব্বনাশের মূল, একখানি পত্রও মুরলার হাতে দেয় নাই! তা ছাড়া, ব্রাহ্মদের মুখে শুনিয়াছি সে-ই অন্যের সহিত মুরলার বিবাহের আয়োজন করিয়াছে! সুতরাং তাকেই আগে মারি।" আবার ভাবিতেছে, "না, অরবিন্দবাবু নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক, সে যে মুরলার বিবাহের আয়োজন করিয়াছে, এরূপ মনে হয় না, ব্রাহ্মেরা তাঁহার উপর চটা বলিয়া এই মিথ্যা কথা ঘোষণা করিয়াছে। আমি ত ডুবিয়াছিই, ব্রাহ্মেরাও কি নরকের কীট? এমন পবিত্রচেতার প্রতি আমাকে ক্ষেপাইয়া দিয়াছে? না—আমি মিথ্যা কথায় ক্ষেপিব না। আমি তাঁহার গায়ে হাত তুলিব না। এমন নিঃস্বার্থ ধার্ম্মিকের গায়ে হাত তুলিলে আমার নরকেও স্থান হইবে না! আচ্ছা, মুরলাই বা আমার কি করিয়াছে? অরবিন্দ বাবু আমার পত্র তাহাকে দেন নাই সত্য, কিন্তু সেত কতবার রাস্তায়

আমাকে দেখিয়াছে, একবারও ত আমার দিকে ফিরিয়া তাকায় নাই! হতভাগিনীই ত তাহার পিতাকে সকল বলিয়া দিয়াছিল! হতভাগিনীই ত বরিশালের ব্রাহ্মদিগের নিকট যাইবার অভিলাষ জানাইয়াছিল! অরবিন্দ স্বর্গের দেবতা, তাঁহার কোন দোষ নাই, মুরলা আমাকে বিষ খাওয়াইয়া তারপর, পায়ে ঠেলিয়াছে। রমণী না পারে, এমন কাজ নাই। আমি মানুষ হই, তার ভালবাসার পুরস্কার দিব। রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিলাম, হতভাগিনী পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল, আমার দিকে ফিরিয়াও একবার চাহিল না! এই কি ভালবাসা? ইহার জন্যই আমি মত্ত?—অবশ্য সে পাপের পুরস্কার পাইবে। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, আমি কখনও কাপুরুষ নই। মরিব;—তাহাকে মারিয়া, তাহার শোণিত পান করিয়া তারপর মরিব। কে রাখিবে? এক দিন, দুই দিন, দুই মাস—এক দিনও সুবিধা পাইব না? কাল্‌ও কি সুবিধা পাইব না? কাল্ কি মিস্ নীলের বিদায়-ভোজ-সভায় সে যাইবে না? মা কালি, করালবদনি, আমার সহায় হও, আমার বাসনা পূর্ণ কর। মুরলা আমাকে পাগল করিয়াছে, অর্থের মোহে ফেলিয়া অস্থির করিয়াছে, তুমি সহায় হও, আমি ইহার প্রতিশোধ তুলিব।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মপাড়া হইতে বাহির হইয়া ইডেন-গার্ডেনে গেল। ইডেন-গার্ডেন ভাবের সাগর, ইডেন-গার্ডেন বিশ্বাসীর স্বর্গ, বিলাসীর নন্দন-কানন। সেখানে কত শোভা, কত রূপ উথলিয়া পড়িতেছে। প্রথমতঃ, সুপ্রসন্ন, যেখানে ব্যাণ্ড বাজে, সেখানে যাইয়া ক্ষণকাল বসিল। আকাশে চাঁদ হাসিতেছে, আর এই ধরায় ইলেক্‌ট্রিক আলো উজ্জ্বল প্রভায় তাহার অস্পষ্ট প্রতিযোগীতা করিতেছে; চাঁদের আলোতে ও এই ইলেক্‌ট্রিক আলোতে ডুবিয়া কত শত প্রণয়ীযুগল সানন্দে ভ্রমণ করিতেছেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা গৌরবে নৃত্য করিতেছে। এ দৃশ্য সুপ্রসন্নের ভাল লাগিল না,—মনে ভাবিল, "হায়, কবে এইরূপ আলোতে মুরলার হাত ধরিয়া স্বাধীন ভাবে বেড়াইতে পারিব? মনের সে বাসনা কি পূর্ণ হইবে না? পাষাণী কি আসিবে না? হায়, এই বাগানের কত শোভা, সবই আমার নিকট তুচ্ছ; যেখানে মুরলা নাই, সেখানে আর ক্ষণকাল আমার থাকিতে ইচ্ছা হয় না।" এইরূপ ভাবিয়া সুপ্রসন্ন উঠিয়া বাগানের পূর্ব্ব দিকে গেল। সেখানে ঘাসের উপর বসিল। সেখানে চাঁদের হাসি দেখিয়া প্রাণ আকুল হইল, ভাবে বিভোর হইয়া বলিতে লাগিল—

"হায়, চাঁদ তুই আজ এত হাসিতেছিস্ কেন? আমার প্রাণে গাঢ় আঁধারের ছায়া, কেন তুই হাসিস্? মুরলাকে ঢাকিয়াছিস্ ত আমাকেও ঢাক্,—আমার রূপ নাই, গুণ নাই,—কিছুই নাই। যাহা আছে, ঐ মুরলার। তার নিকটে যা। তার রূপকে আরো উজ্জ্বল কর্। সে যে তোরই সমতুল্যা। না—সে ত তুই-ই। মুরলা আর তোতে কি বিভিন্নতা আছে? আমার মনে হয়, কিছুই নাই। তাঁকে ছাড়িয়া তোকে ভালবাসিতে পারিলে, আমার সব জ্বালা নির্ব্বাণ হইত, কিন্তু তাহা এ যাত্রা পারিলাম না! আমার দ্বারা তাহা হইল না। এ যাত্রা আর বুঝি তোর রূপ দেখা হইবে না। মুরলাকে না পাইলে কোন্ সাধে জীবন রাখিব?" সুপ্রসন্ন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণকাল পর আবার বলিতে লাগিল—"ইডেন-গার্ডেন, তুই আমার দুঃখের বন্ধু, তোর বুকে কত অশ্রু ফেলিয়াছি,তুই তা জানিস্! আমাকে ক্ষমা কর্। আমি আজ যাই—বুঝিবা আর তোর কাছে দুঃখের কথা বলিতে আসিব না—আর কষ্ট দিব না। আহা, আমার এই জীবন ধারণ বৃথাই হইল! ঘোর দারিদ্র্যে জনক জননী নিমজ্জিত—হায়, আমি বৃথাই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম! পতিপ্রাণা সতী, আমার দুই স্ত্রী, তাহাদিকে কত কষ্ট দিয়াছি; হায়, বুঝি বা আমার নরকেও স্থান হইবে না! আমার সন্তান-মমতা চিরকালের জন্য ডুবাইয়াছি, আমি কি মানুষ, না নরকের কীট? আমি পৃথিবীর সকল মমতা ভুলিয়াছি! পিতা মাতার অতুল স্নেহ, আত্মীয় বন্ধুদিগের ভালবাসা, স্ত্রীদিগের প্রণয়, সন্তানের মমতা, পৃথিবীর ধর্ম্মাধর্ম্ম—পাপ পুণ্য সব ভুলিয়াছি। এই আট মাস যাবৎ, কত দিন উদরে অন্ন দেই নাই, কত দিন অনাহারে রহিয়াছি,—কত রাত্রি জাগরণ করিয়াছি, এ পৃথিবীর কে তাহা জানে? আমার এই মলিন বেশ, মলিন বস্ত্র দেখিয়া কত লোক ঘৃণা করে! পৃথিবীর আদর মমতা সব বিসর্জ্জন দিয়াছি। কেন আছি, থাকিয়া ফল কি? যে মুরলার জন্য এত করিলাম, সে মুরলাও আমাকে ভুলিয়াছে! সেও আমাকে চরণে ঠেলিয়াছে! তবে আর আশা কি? তবে মরিব না কেন? মুরলাকে রাখিয়া মরিব, তা প্রাণে সয় না। তাহাকে মারিয়া তারপর মরিব। যে হাতে তাকে কত আদর করিয়াছি, সেই হাতে তার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিব? কোন্ প্রাণে তা করিব? মানুষে কি তাহা পারে? এই কি ভালবাসা? না, আমি তাহা পারিব না। কোন্ প্রাণে

মুরলার গায়ে হাত তুলিব? মন, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তাহা পারিব না। আমি মরি, সে সুখে থাক্। কাজ কি? যে আমাকে চায় না, তার জন্য ভাবিয়া আর কাজ কি? মন, তবুও প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিবি? বিষম দায়ে পড়িয়াছি, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কে পরামর্শ দিবে, কি করিব? যাহাদিগকে মনের কথা বলিয়াছি, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মদের উপরে চটা, সকলেই মুরলাকে হত্যা করিতে পরামর্শ দেয়। আমার মনও এই কথা বলে! কি উপায় করি, ইডেন-উদ্যান, তুই অনেকের হৃদয়ের আগুন নির্ব্বাণ করিয়াছিস্, তুই এই কলিকাতা-মরুভূমিতে শান্তিধারা। আমাকে তুই পরামর্শ দে, আমাকে তুই রাখ্। না, না, আমি বুঝিয়াছি, এ পৃথিবীতে মুরলা আমার হইবে না। তাহাকে মারিয়া নিজে মরিলে উভয়ে স্বর্গে চলিয়া যাইব। সেখানে উভয়ে মিলিব। সেই অদৃশ্য,সেই কল্পনার অতীত রাজ্যের অধীশ্বর কি আমাদের মিলনে বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন? তিনি ইচ্ছা করিলে এখানে কি মিলাইতে পারিতেন না? আমি সব কূল ডুবাইয়াও মুরলার-কূল ধরিতে পারিলাম না! তিনি মনে করিলে কি এ কূলে আমায় পৌঁছাইতে পারিতেন না? এখানে যাহা করিলেন না, পরকালে তাহা করিবেন, তাহার আশা কি? সে আশা কল্পনায় বিমিশ্রিত বটে, কিন্তু এখানে যখন মোটেই আশা নাই, তখন ঐ কূয়াসাময় আশাই ধরি। আর কিছু না হউক, আমার প্রতিজ্ঞা অটল থাকিবে। আমি বরিশালের লোক, প্রতিজ্ঞায় অটল না থাকিলে আমার নামের সহিত বরিশালের নাম ডুবিবে। তা ছাড়া, পিতার নাম ডুবিবে। আমি তাহা সহ্য করিতে পারি না! আহা, এই অস্ত্রখানি কি সুন্দর! ভালবাসার পুরস্কার ইহার ললাটে খোদিত। মুরলার সকল সাধ নির্ম্মূল করিবার জন্য ইহার জন্ম। যে ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে ধন্য; যে আকরে এই ধাতু জন্মিয়াছে, সেই আকর ধন্য। বুঝেছি, মুরলার শোণিত পান করিবার জন্য এ অস্ত্র বড়ই ব্যাকুল হয়েছে। অস্ত্র, তুই বড় অস্থির হচ্ছিস্, তাহা আমি বুঝেছি। নিরাশায় আর কাজ নাই, আমি আর ইতস্ততঃ করিব না, আমি নিশ্চয় তোর মনোরথ পূর্ণ করিব। দেখিস্, তুই যেন অকৃতজ্ঞের ন্যায় হস্‌নে?" এইরূপ পাগলের মত কত ভাবিল, কত কথা বলিল, শেষে গভীর রাত্রে বাসায় ফিরিল, রাত্রে আর ঘুম আসিল না। প্রাতে উঠিয়াই মিস্ নীলের স্কুলে গেল। বেহারাদিগকে দুটী টাকা দিয়া স্কুলের নিমন্ত্রণ পত্র মুরলাদের

বাড়ী পাঠাইল। তারপর বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অস্ত্রখানিকে আবার ভাল করিয়া তীক্ষ্ণ করিল। ১১টার সময় একজন বন্ধুকে অরবিন্দের বাড়ীতে পাঠাইল। সে কিন্তু কিছুই করিয়া আসিতে পারিল না। যথাসময়ে আহার করিতে বসিল, কিন্তু আহার হইল না। মনে হইতে লাগিল, এই বুঝি মুরলা গাড়ীতে উঠিয়া স্কুলে যাইতেছে। আহার রাখিয়া রাস্তায় আসিল। ব্রাহ্মপাড়ার নিকটস্থ ফুটপাতে পা-চারি করিতে লাগিল। একটার সময় দেখিল, অরবিন্দবাবু একজন বাবুকে সপরিবারে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া গেলেন। ৩টার সময় দেখিল, অরবিন্দ ট্রামগাড়ীতে উঠিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। যে ব্যক্তি সুবিধা গণিতে ছিল, ইহা তাহার পক্ষে বড়ই আনন্দের কথা। ৪টার সময় দেখিল, মিস্ নীলের গাড়ী রাস্তায় লাগিল এবং কিছুক্ষণ পরে কয়েকটী মেয়ে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। দেখিল, মুরলা তাহার মধ্যে আছে। হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। গাড়ীর নিকটে আসিতে না আসিতে গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সুপ্রসন্ন সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অলক্ষিতে মুরলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং অস্ত্র দেখাইল। মুরলা সে মূর্ত্তি দেখিয়া বিষম বিপদ গণনা করিলেন। ক্রমে ক্রমে গাড়ী যখন স্কুলে লাগিল, সুপ্রসন্ন তখন রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল; অন্যান্য মেয়েদিগকে মুরলা বলিলেন, আজ বড় ভয় হইতেছে। স্কুলে যাইয়া আমোদের ব্যাপারে মুরলা মন দিতে পারেন নাই; ভাবিতেছিলেন, আজ কি করি? মেমদিগকে সকল কথা খুলিয়া বলিলে আজকার মত রক্ষা পাই; কিন্তু ইহা অপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে সহস্রগুণে ভাল। আমি যে দুর্বৃত্ত সুপ্রসন্নের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব, আশা নাই। আমি যদি ইহার সহিত যাই, সকল গোল চুকিয়া যায়; কিন্তু তাহা জীবন থাকিতে পারিব না। বিষকে বিষ বলিয়া বুঝিয়াছি যখন, তখন আর কি করিয়া তাহা পান করি? ধর্ম্ম, পুণ্য, পবিত্রতা রাখিয়া জীবন দিতে পারিলে আর চাই কি? ইহা অপেক্ষা আর সুখ কিসে?" কিছুকাল গভীররূপে ভাবিলেন, শেষে ঠিক করিলেন "আমি কাহাকেও কিছু বলিব না, নীরবে দেহ বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া যাই। না মরিলে এই হতভাগ্য আমাকে কখনও ছাড়িবে না, হয় ত শেষে বাড়ীতে একটা কাণ্ড করিয়া পবিত্র পরিবারে কলঙ্ক ঘটাইবে! আজ যদি হতভাগ্য সুবিধা না পায়, কাল্ যে বাড়ীতে যাইবে না, কে জানে? কাল্ যে চৌধুরী মহাশয়কে খুন করিবে না, কে জানে? আমার জন্য তিনি জীবন দিতে প্রস্তুত,

ইহা জানি। কিন্তু আমার জীবনাপেক্ষা তাঁর জীবনের মূল্য অনেক বেশী। আমি কাহাকেও কিছু বলিব না, যাহা কপালে থাকে, আজই হউক।” এইরূপ ভাবিয়া মুরলা কাহাকেও কিছু বলিলেন না, কিন্তু দারুণ চিন্তায় কোন আমোদেই যোগ দিতে পারিলেন না। রাত্রি ১০টার কিছু পূর্ব্বে সভা ভাঙ্গিল। ১০টার সময় মুরলা গাড়ীতে উঠিলেন, অন্যান্য মেয়েরাও উঠিল, নূতন কোচম্যান ও নূতন সহিস গাড়ী হাকাইয়া চলিল। পথে মুরলা দুই তিনবার অন্য মেয়েদিগকে বলিয়াছিলেন—“আজ রাত্রি বড় অধিক হইয়াছে, আজ যেন কেন আমার ভয় হইতেছে।” একটী মেয়ে কিছু না বুঝিয়া এ কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন—“তা ঠিক্, রাত্ বড় বেশী হইয়াছে!”

গাড়ী হাকাইয়া যখন কোচম্যান্ চলিল, তখন বিদ্যুৎবেগে সুপ্রসন্ন গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। পূর্ব্বের বন্দোবস্তানুসারে আরো ৩।৪ জন বন্ধু পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। যথাসময়ে গাড়ী ব্রাহ্মপাড়ার গলির মাথায় থামিলে, একটী একটী করিয়া দুটী মেয়ে অবতরণ করিল। তারপর মুরলা গাড়ী হইতে নামিলেন। নামিবামাত্র তাহার সম্মুখে একটী লোক ছুটিয়া আসিল। রাস্তার দুই পার্শ্ব দিয়া লোক যাতায়াত করিতেছে, ১০ টা কিছু অধিক রাত্রি নয়। লোকটা ছুটিয়া আসিয়া মুরলার হাত ধরিল। মুরলা দেখিল,—হতভাগ্য সুপ্রসন্ন।

সুপ্রসন্ন মুরলার হাত ধরিয়া বলিল—“মুরলা, প্রাণপ্রিয়ে, তোমার পায়ে ধরিতেছি, আমার সহিত চল, আর কষ্ট দিওনা।” মুরলা কিছু না বলিয়া হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুপ্রসন্ন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া বলিল, “সহস্র চেষ্টা করিলেও আজ আমার হাত ছাড়াইতে পারিবি না। দশ দিন তোর, আজ একদিন আমার। আজ অরবিন্দবাবু ও ব্রাহ্মদের স্মরণ কর, দেখি, কে তোকে রক্ষা করে। আমি এই ৮ মাস যাবৎ তোর জন্য রাস্তায় রাস্তায় ফিরিতেছি; তোকে হাত করিবার জন্য কি না করেছি? পিশাচিনি, আমার প্রতিজ্ঞা জানিস্‌নে, হয় চল্, নয় এখনই তোর বিবাহের সাধ মিটাইব? কাহাকে অপমান করিয়াছিস্, জানিস্‌নে?” সুপ্রসন্ন বামহস্তে মুরলার হাত ধরিয়াছে, দক্ষিণ হস্তে শাণিত অস্ত্র ধারণ করিয়াছে; চক্ষু রক্তবর্ণ জবাফুলের ন্যায়। মুরলা গাড়ীর আলোকে দেখিলেন, সে অতি ভয়ানক দৃশ্য। বুঝিলেন, আজ আর রক্ষা নাই। বিধাতাকে স্মরণ করিলেন, এবং তারপর হাত ছাড়াইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুপ্রসন্নকে বলিলেন,

"আমি মরিব, তবুও আর পাপের পথে যাইব না, দোহাই তোমার, হাত ছাড়।"

সুপ্রসন্ন এ কথা শুনিয়া বলিল, "মুরলা, "পাপের পথ কোন্‌টা? আমি আর রিপুর অধীন নহি, চল্, ভাই বোনের মত থাকিব। আমি সব আয়োজন করেছি, আজ হয়, তোকে লইয়া কালীঘাটে যাইব, না হয় তোকে মারিয়া নিজে আফিং খাইয়া মরিব। তোর লালসা আমাকে পাগল করেছে, তুই অন্যের হবি, তা কখনও হইবে না। আমার'কথা রাখ্, চল্।" মুরলা বুঝিলেন, কথায় কোন কাজ হইবে না, সুতরাং মরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং কথার উত্তর না দিয়া বলপূর্ব্বক সুপ্রসন্নের হাত ছাড়াইলেন, এবং বিদ্যুৎবেগে গলির দিকে ছুটিলেন। যখন গলির মাথায় উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে হতভাগ্য মুরলার পৃষ্ঠদেশে দারুণ অস্ত্রাঘাত করিল। সেই আঘাতে "মা গো" বলিয়া মুরলা ধরাশায়িনী হইলেন এবং দিক্ কাঁপাইয়া করুণস্বরে বলিলেন, "এই কি ভালবাসার পুরস্কার? না, বুঝেছি, ইহাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত!" গলির ভিতরে যে দু'টী মেয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া ঢুকিয়াছিল, তাহারা এই দৃশ্য দেখিয়া চকিতের ন্যায় বাড়ীর দিকে ছুটিল। হতভাগ্য সুপ্রসন্ন উপর্য্যুপরি বারম্বার ধরাশায়িনী মুরলাকে আঘাত করিতে লাগিল! মুরলার যতক্ষণ প্রাণ ছিল, হাত তুলিয়া, আঘাত করিতে কেবল নিষেধ করিতেছিলেন। উত্তর দিক্ হইতে একটী ব্রাহ্ম-যুবক এই দৃশ্য দেখিয়া ছুটিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে সুপ্রসন্নের দুইজন বন্ধু তাঁহাকে ধরিয়া রাখিল। রাস্তায় আরো অনেক লোক ছিল, কিন্তু ব্রাহ্ম-বধ হইতেছে দেখিয়া কেহই কাছে আসিল না! একটী হিন্দু বাড়ী হইতে লোক বাহির হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল ব্রাহ্মদরজায় গোল, তখন তাহারা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিল। সন্মুখের ব্রাহ্মবাড়ীর লোকেরা ভয়ে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। এইরূপ সুযোগে হতভাগ্য আপন বাসনা চরিতার্থ করিয়া প্রস্থান করিতেছিল, এমন সময়ে, সেই আবদ্ধ ব্রাহ্মবন্ধু বলপূর্ব্বক লোকের হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া নরহন্তাকে ধরিলেন। কিন্তু হায়, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সুপ্রসন্ন তাঁহার মস্তকেও অস্ত্রের দ্বারা গুরুতর আঘাত করিল; তিনি আর পারিলেন না, ছুটিয়া গলির মধ্যে নিজ বাড়ীতে চলিলেন। আর জন্ম দুঃখিনী মুরলা? মুরলা নিমেষে পৃথিবীর ত্রিতাপ জ্বালার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন—প্রাণ সেই ক্ষতবিক্ষত দেহপিঞ্জর পরি-

ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সুপ্রসন্ন ইত্যবসরে আফিং খাইয়া নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করিল এবং জিজ্ঞাসিত হইলে বলিল, "আমি মুরলাকে খুন্ করিয়া আফিং খাইয়াছি।"

নবম পরিচ্ছেদ।

কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস!

মুরলার হত্যার পরই ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন সহৃয় ব্যক্তি সংবাদপত্র আফিসে ছুটিল, এবং মিরারে সংবাদ দিল যে, সম্মতি আইনের প্রতিশোধ তুলিবার জন্য হিন্দুরা মুরলা নাম্নী একটী বিধবা মেয়েকে ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে হত্যা করিয়াছে। পর দিন প্রত্যূষে মিরারে এই সংবাদ বাহির হইল। এদিকে ব্রাহ্মবন্ধুদিগের পরামর্শ না শুনিয়া অরবিন্দ বাবু পুলিসের সহিত ঘুরিতেছেন, ইহাতে কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধুর মাথা ঘুরিয়া গেল। প্রথমতঃ এই চিন্তা কাহারও কাহারও মনে উঠিল, "হতভাগ্য অরবিন্দের দ্বারা ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের অনেক কলঙ্ক চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইয়াছে, যাহা বাকী ছিল, এইবার হইল!" জ্ঞানদা বাবু, গোবিন্দ বাবু, অরবিন্দের শত্রুপ্রমুখ ব্যক্তিগণ বলিলেন, "যেমন আস্ফালন, তেমনি এবার ধরা পড়িয়াছে, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে! অরবিন্দ বড়ই পবিত্রতার বড়াই করিয়া বেড়ান, এবার বিষম পাকে ফেলিয়াছি!" এইরূপ নানা কথা বলিয়া উল্লসিত চিত্তে পর দিন প্রাতেই তাঁহারা সভা ডাকিলেন। সভায় ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি অরবিন্দের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারাও সকলে আজ অরবিন্দের বিরোধী। একটী লোকও বন্ধু নাই, সকলেই চটিয়া লাল হইয়াছেন। সভায়, পূর্ব্বের ন্যায়, এইরূপ পরামর্শ ধার্য্য হইলঃ—

১। এই মোকদ্দমার এরূপ তদ্বির করা হউক, যাহাতে অরবিন্দ ফাঁদে পড়ে। হত্যাকারীর পক্ষে ভাল বেরিষ্টার নিযুক্ত করা হউক।

২। সমস্ত মফঃস্বলের ব্রাহ্মসমাজে ঘোষণা করা হউক, অরবিন্দ একজন ঘোরতর বদ্‌মায়েস্ লোক, কেহ আর তাহার কাগজের গ্রাহক ও লেখক না থাকে।

৩। যতশীঘ্র হয়, অরবিন্দকে পাড়া হইতে উঠাইয়া দেওয়া হউক।

যতদিন পাড়ায় থাকিবে, কেহই তাহার বাড়ীতে পদার্পণ করিতে পারিবে না; যে করিবে, সে একঘ'রে হইবে। অরবিন্দের চাকর দুটীকে যেরূপে হয়, তাড়ানের জন্য খুব চেষ্টা করা হউক।

৪। যে, যে রূপে পারে, অরবিন্দের অনিষ্ট চেষ্টায় রত হইবে। তাহার নিন্দা ঘোষণা অদ্যাবধি ব্রাহ্মমাত্রেরই কণ্ঠের ভূষণ হইবে। কেহ কোন নিমন্ত্রণে অরবিন্দ বা তাহার বাড়ীর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে পারিবে না; করিলে একঘ'রে হইবে।

এই বিপদের দিনে, কোথায় ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা অরবিন্দের সাহায্য করিবে, না, আজ সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই, সম্মুখে যাহারা আত্মীয়তার কথা বলে, অসাক্ষাতে তাহারাই অনিষ্ট চেষ্টা করে। কেহই বুঝিল না, অরবিন্দের অপরাধ থাকিলেও সে বিচারের সময় এ নহে। বিপদের দিনে সময় পাইয়া যাহারা শত্রুতা সাধন করে, বৈরনির্য্যাতনের সুবিধা গ্রহণ করে, তাহারা কি মানুষ না পশু? আবার, সাক্ষাতে দোষ বলিতে যাহাদের সাহস নাই, তাহারা কি মানুষ না পশুর অধম?

ব্রাহ্মমহলে আজ পৌষ মাস, আর হিন্দুমহলে? সেখানে যাও, সর্ব্বত্র আজ অরবিন্দের নিন্দা! স্কুলে, কলেজে, আফিসে, রাস্তায়, ট্রাম গাড়ীতে সর্ব্বত্র আজ নিন্দা ঘোষিত হইতেছে। এইরূপ ঘোর বিপদের দিনে, সকলে মনের স্ফূর্ত্তিতে পর-নিন্দা ঘোষণা করিয়া জিহ্বাকে পবিত্র করিতেছে। আজ মুরলা যে চরিত্রের জন্য জীবন বলি দিয়াছেন, সে কথা কেহই বলে না, আজ সকলেই হত্যাকারীর পক্ষাবলম্বন করিয়া নানা কল্পনামিশ্রিত মিথ্যা কথা প্রচার করিতেছে। ধন্য কলিকাল, ধন্য কলিকাতা সহর, ধন্য বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা।

অরবিন্দ কোথায়? প্রথমতঃ পুলিসের সহিত অরবিন্দ সেই রাত্রে দেওয়ান বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। দ্বার আবদ্ধ ছিল, অনেক ডাকাডাকির পর একজন বৃদ্ধ দরজা খুলিয়া দিল। গুপ্ত পুলিসের লোক জিজ্ঞাসা করিল, সুপ্রসন্ন কোথায়? বৃদ্ধ সরল প্রকৃতির লোক, বলিল, "সে আফিং খাইয়াছে বলিয়া দেওয়ান বাবু জ্ঞানদার সঙ্গে তাহাকে ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" পুলিস অমনি সেখানে প্রহরী রাখিয়া ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে গাড়ী হাকাইয়া চলিল। সেখানে দেখা গেল,

সুপ্রসন্ন, প্রসন্ন নামে পরিচয় দিয়া ও বেলিয়াঘাটা হইতে আগত বলিয়া রেজেষ্টারিতে লিখাইয়া, আফিং ভক্ষণের জন্য চিকিৎসিত হইতেছে। হাঁসপাতালের লোকের আদেশে সঙ্গের লোকটী ইটালীর থানায় ইজাহার দিতে গিয়াছে। হাঁসপাতালে পাহারা রাখিয়া পুলিস ইটালীর থানায় যাইয়া সে লোককে ধরিল। পথে সে লোকটীকে পুলিসের বাবুরা এতরূপ বুঝাইলেন যে, তাহা শুনিলে পুলিসের বাহাদুরীর কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাহাকে লইয়া পুলিস হত্যাস্থানে আসিল। লোকটী পুলিস কমিসনারের নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া বলিল—"এই ব্যক্তির নাম প্রসন্ন নহে, ইহার নাম সুপ্রসন্ন। আমরা একত্রে সীমলার দেওয়ান বাবুর বাসায় থাকিতাম। মুরলাকে খুন করিয়া আফিং খাইয়া বাসায় গিয়াছিল বলিয়া দেওয়ান বাবুর আদেশে আমি হাঁসপাতালে লইয়া যাই। পথে সুপ্রসন্ন মুরলার হত্যার কথা আমার নিকট স্বীকার করিয়াছে। কেন খুন করিয়াছ, জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছে যে, 'সে আমার সঙ্গে না যাওয়ায় খুন করিয়াছি।' কি দিয়া খুন করিয়াছ, ইহার উত্তরে সে বলিয়াছে 'আমার নিকট যাহা ছিল, তাহা দ্বারা খুন করিয়াছি।" এই ব্যক্তির কথাবার্ত্তা বড়ই সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইতেছিল। অরবিন্দের বাড়ীতে সোমবার যে লোকটী ১১টার সময় আসিয়াছিল, সেই লোকের মত চেহারা। কিন্তু ঠিক্ চেনা যায় না। তারপর দেওয়ান বাবুর বাড়ীর সমস্ত লোক ও অরবিন্দকে লইয়া পুলিস যোড়াসাঁকো থানায় গেল। সেখানে পরদিন ১২টা পর্য্যন্ত সকলের জবানবন্দি হইল। সুপ্রসন্নের সঙ্গের লোকটী এখানে কথা পরিবর্ত্তন করিতে চাহিল, কিন্তু পুলিসের দ্বারা ভর্ৎসিত হইয়া শেষে নিজকে বাঁচাইয়া একরূপ সকল কথা স্বীকার করিল। পুলিস অরবিন্দের প্রতি এই বিপদের দিনে এরূপ মিষ্ট ব্যবহার করিলেন যে, অরবিন্দ তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। এই উপলক্ষে কলিকাতার পুলিসের সহিত ৩।৪ মাস অরবিন্দের ব্যবহার করিতে হইল। এ সময়ের মধ্যে একদিনও পুলিসের অত্যাচার, অভদ্রব্যবহার তিনি দেখেন নাই। কলিকাতার পুলিসে বহু সদাশয় ও সহৃদয় লোক আছেন।

১২টার সময় অরবিন্দের ছোট ভাই জোড়াসাঁকো থানায় উপস্থিত হইল। আর এতাবৎকাল একটী বন্ধুও সংবাদ লয় নাই, অরবিন্দ কোথায় গেল? এমনই লোকের সহানুভূতি! ১২টার পর অরবিন্দ বাড়ীতে আসিলেন।

পুলিসের লোক সঙ্গে সঙ্গেই আসিল। পুলিসের আদেশে অরবিন্দ মুরলার বাক্স ভাঙ্গিয়া দিলেন। বাক্সের সমস্ত পুস্তকরাশি এবং মুরলার গৃহের সমস্ত দ্রব্যাদি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু একখানিও সুপ্রসন্নের পত্র পাওয়া গেল না। বুঝা গেল, মুরলার যে কথা, সেই কাজ। অরবিন্দ এবং পুলিসের সহৃদয় লোকদিগের চক্ষের জল পড়িল।

সুপ্রসন্নের বাড়ীও খানাতালাসি হইল; তাহার বাক্সের মধ্যে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে এক বাণ্ডিলে দুইখানি নিজের ফটো এবং ৩ খানি পত্র—একখানি মায়ের নামে, একখানি পিতার নামে ও আর একখানি বাসার বন্ধুদের নামে—পাওয়া গেল। এই ফটো ও পত্রের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মুরলার নামের ১১৬ খান (Refused Letter) ফেরত-পত্র অপর বাণ্ডিলে পাওয়া গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য একখানিও মুরলার হাতের লেখা পত্র নাই! বুঝা গেল, মুরলার যে প্রতিজ্ঞা, সেই কাজ। অরবিন্দ মনে মনে ভাবিলেন, মুরলা মানব দেহে দেবী ছিলেন।

১টার সময় মাথায় তেল জল এবং পেটে একমুঠা ভাত দিয়া অরবিন্দকে পুলিসকোর্টে এবং তৎপরে করোনারের কোর্টে যাইতে হইল। সঙ্গে একজন আত্মীয় নাই! সকল লোক আজ শত্রু—যাহাদের সঙ্গে গলাগলি ভাব, তাহারাও আজ বিপক্ষ। অরবিন্দ নির্ভীক্ হৃদয়ে একাকী পুলিস কোর্টে হাজির হইলেন। সেই দিনই ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার জবানবন্দি লইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র, সম্প্রতি নবাব উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন, তাঁহার বিজ্ঞতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি ধর্ম্মরাজ; কে মুরলাকে খুন করিয়াছে, বিচার করিতে বসিয়াছেন। অরবিন্দ প্রথম সাক্ষী। অরবিন্দের নিকট দুই দশটা কথা শুনিয়াই তিনি মীমাংসা করিলেন, সুপ্রসন্নই মুরলাকে খুন করিয়াছে এবং প্রকাশ্যে বলিলেন, "অরবিন্দ যদিও সৎ ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া পত্র গোপন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই কারণেই সুপ্রসন্ন মুরলাকে খুন করিয়াছে।" যেমন ধর্ম্মাবতার, তেমনি বিচার! এক সাক্ষীতেই বিচার-মন্তব্য বাহির হইল! দেশের লোক কেমন, তাহাও বলি। এই কথার পর সহরে রাষ্ট্র হইল, অরবিন্দের শাস্তি হইবে—এমন কি, তার পর দিন, অমৃতবাজার প্রভৃতি বড় বড় পত্রিকাতেও এইরূপ লেখা বাহির হইল। এই কথা লইয়া সহরে বড়ই তোলপাড় হইতে লাগিল—কি ব্রাহ্ম, কি

হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান সকলে বলিতে লাগিল, অরবিন্দের ভারি অন্যায়, পত্র গোপন করা তাহার ভারি অন্যায় হইয়াছে; এই জন্যই এই বিপদ ঘটিয়াছে। বাঙ্গলা সংবাদপত্রেও এই কথা টিকা টিপ্পনীর সহিত নানা ভাবে বাহির হইতে লাগিল। দেশের লোকের যেন মত এই, সুপ্রসন্নের সহিত মুরলাকে ছাড়িয়া দিলেই অরবিন্দের ধর্ম্ম হইত! নীতি ও পবিত্রতার আদর্শ এমনই নীচ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে! বিলাতের ন্যায় স্বাধীনতার লীলাস্থলেও যে, সন্দেহযুক্ত পত্র মেয়েদের হাতে দেওয়া হয় না, একথা কেহই বলিল না। "পত্র না দেওয়াটা ভারি অন্যায় হইয়াছে" এই কথাটাই চতুর্দ্দিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটিল। যেমন ধর্ম্মাবতার, তেমনি দেশের লোক!

বৈকালে করোনারের কাছারী বসিল। অরবিন্দের ও অন্যান্য সাক্ষীদের জবানবন্দি হইল। সুপ্রসন্নের জবানবন্দি অদ্য স্থগিত রহিল। অস্ত্র বাহির করিতে পুলিসের উপর আদেশ হইল। ৫টার সময় মুরলার শব দাহ করিতে হুকুম দেওয়া হইল। অরবিন্দ জিজ্ঞাসিত হইলেন, "তুমি কি লাশ লইবে?" অরবিন্দ ভাবিলেন, "মুরলার জন্য এত করিয়াছি, শেষ কাজটুকু বাকী থাকিবে? এত বন্ধুবান্ধব আছে, ভাবনা কি, অনেক লোক পাইব"—এইরূপ ভাবিয়া লাশ লইতে স্বীকার করিলেন এবং পুলিসের লোককে লাশের নিকট যাইতে বলিয়া আপনি লোক সংগ্রহ করিতে বাড়ীতে আসিলেন। বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, বহু বন্ধু উপস্থিত আছেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, আজ সকলেই ভর্ৎসনা করিতে আসিয়াছেন, এই ঘোর বিপদে সাহায্য করিতে একজনও আগমন করেন নাই! ভর্ৎসনা করিয়া কেহ কেহ চলিয়া গেলেন। অরবিন্দ একজন বন্ধুকে বলিলেন, "দুই দিনের দারুণ চিন্তায় আমার শরীর অবসন্ন, ভর্ৎসনার আরো সময় আছে, আজ দয়া করুন।" নির্দ্দয় বন্ধু এ কথায় কাণ দিলেন না। অরবিন্দ ভয়ে ভয়ে মুরলার শবদাহ করার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু দেখিলেন, একে একে সকল বন্ধু কাণাকাণি করিতে করিতে দূরে সরিতে লাগিল। অরবিন্দ বুঝিলেন, অবস্থা ভাল নহে। কাজেই অন্য বন্দোবস্ত করিতে বিশ্বাসী ভৃত্যকে শবচ্ছেদনের ঘরে পাঠাইলেন। ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এখন আর অন্য উপায় হইবে না, পুলিসের হাত হইতে লাশ লইয়া সৎকার করিতেই হইবে।" অরবিন্দ বিষম ভাবনায় পড়িলেন। এই অসময়ে

উপযাচিত হইয়া কাহারও কোন সাহায্য গ্রহণে অভিলাষ ছিল না, কিন্তু বাধ্য হইয়া দু'টী বন্ধুকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা অনেক পরামর্শ আঁটাআঁটী করিয়া শেষে কয়েকজন লোক ভাড়া করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিলেন। অরবিন্দ টাকা দিলেন, বন্ধুরা লোক জুটাইয়া দিয়া পথ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। অরবিন্দের বিশ্বাসী ভৃত্য সেই লোকদের সঙ্গে নিমতলা যাইয়া মুরলার শেষ কার্য্য সম্পন্ন করিল! রাত্রি জাগরণ, অনাহার ও দুশ্চিন্তায় অরবিন্দের শরীর তখন এত অবসন্ন হইয়াছিল যে, দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না। এই অবস্থায় বন্ধুদিগের তীব্র ভর্ৎসনা ও নিদারুণ ব্যবহার তাঁহাকে অবনত মস্তকে মাথায় লইতে হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে লোকেরা এত আঘাত করিতে লাগিল যে, অরবিন্দ অস্থির হইলেন। দুই একজন লোক রাত্রে আসিয়া সহানুভূতি দেখাইলেন; যে সাহায্যের প্রয়োজন, দিতে চাহিলেন। কিন্তু অরবিন্দ অল্পক্ষণ পরেই শুনিলেন, তাঁহাকে পাড়া হইতে উঠাইবার ভার তাঁহারাই গ্রহণ করিয়াছেন! বন্ধুদিগের ব্যবহার অপেক্ষা শত্রুদের কশাঘাত সহস্র গুণে ভাল, মনে করিয়া রাত্রে অনাহারে শয্যার আশ্রয় লইলেন। তারপর দিন সুপ্রসন্নের কথানুসারে তাহাদের বাড়ীর প্রাঙ্গণ খোড়া হইলে অস্ত্র বাহির হইল। অপরাহ্ণে করোনারের কাছা-রীতে সুপ্রসন্ন অম্লানচিত্তে, ধীর ভাবে, নানা প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করিল— "আমিই মুরলাকে হত্যা করিয়াছি, কিন্তু পুলিস যে অস্ত্র বাহির করিয়াছে, তাহা দ্বারা নহে; পাঠা কাটিতে আমি একখানি অস্ত্র কিনিয়াছিলাম, তাহা-দ্বারা হত্যা করিয়াছি। মুরলার প্রণয়ে আমাকে উন্মাদ করিয়াছে। সে আমাকে তুচ্ছ করিয়া তাহার ভগিনীপতি অরবিন্দ চৌধুরীর চক্রান্তে অন্যকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে শুনিয়া, আমার রাগ হইয়া-ছিল। মুরলাকে আমি ১২৯৬ সালের প্রারম্ভে হিন্দু গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিয়াছি। স্কুলের গাড়ী হইতে নামিয়া সে একদিন বাড়ী যাইতেছিল, আমি হঠাৎ সাক্ষাৎ করিলাম, সে আমাকে অপমান করিয়া চলিয়া গেল। শেষ দিন আমার সঙ্গে যাইতে বলিলাম, সে গেল না। এই সব কারণেও আমার রাগ হয় এবং সেই জন্য তাহাকে হত্যা করিয়া নিজে আফিং খাইয়া-ছিলাম। আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।"

করোনার ইহা আবার পাঠ করিলে, তারিখ সম্বন্ধে ভুলক্রমে পূর্ব্বে ১৮৯১ খ্রীঃ বলিয়াছিল, তাহা কাটিয়া ১২৯৬ সাল করিয়া এবং সে জন্য ক্ষমা

চাহিয়া সুপ্রসন্ন ষ্টেটমেণ্টে আপন নাম স্বাক্ষর করিল। করোনারের জুরীরা সকলে একবাক্যে মত দিলেন যে, "মুরলা সুপ্রসন্নের দ্বারা আহত হইয়া মরিয়াছে।" ইহার পরও কি আন্দোলন থামিল? নানা কাগজে এই ঘটনা লইয়া সমালোচনার উৎসব চলিতে লাগিল। পরের ঘরের কুৎসা পাইলে বাঙ্গালী জাতি ক্ষেপিয়া উঠে। যেরূপ ঘটনা সকল ঘরে ঘটিতে পারে, এরূপ ঘটনা লইয়া তীব্র ভাবে যখন নানা পত্রিকায় আন্দোলন চলিতে লাগিল, তখন অরবিন্দ আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না; তিনি আপন পত্রিকায় সংক্ষেপে সকল কথা লিখিয়া দিলেন। ইহার পর আন্দোলনের স্রোত কতকটা থামিয়া আসিল। অনুসন্ধান, নবযুগ দুই একখানি পত্রিকায় লিখিত হইল যে, "অরবিন্দ বাবু দরিদ্র ও অসহায়ের মা বাপ বলিয়াই, এরূপ অসহায় মানুষকে বাড়ীতে স্থান দেন। মুরলাকে তিনি আশ্রয় না দিলে, তাহাকে রাস্তায় দাঁড়াইতে হইত। অরবিন্দ বাবুর ন্যায় ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা মোকদ্দমার প্রকৃত ঘটনা বাহির হইয়াছে, নচেৎ সম্মতি-আইনের ফল বলিয়াই সাধারণের নিকট প্রচারিত হইত। অন্য ব্যক্তির হাতে পত্রগুলি পড়িলে কখনই তাহা পুলিসের হস্তে অর্পিত হইত না। অরবিন্দ নরদেহে দেবতা।" একথা আবার কোন কোন ব্রাহ্মের সহ্য হইল না; ইহা লইয়াও খুব আন্দোলন চলিতে লাগিল। কোন কোন পত্রিকায় এই ঘটনার উপলক্ষে তীব্র ভাবে অন্যান্য ব্রাহ্মের দোষ কীর্ত্তিত হওয়ায়, একখানি পত্রিকার নামে লাইবেল মোকদ্দমা উঠিল এবং সম্পাদক জেলে যাইতে বাধ্য হইলেন। সে সকল অবান্তরিক কথা লিখিতে চাহি না। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সুপ্রসন্ন, পিতার পরামর্শে, খুনের কথা অস্বীকার করিল। কিন্তু তাহাতে সত্য ঢাকা রহিল না, ম্যাজিষ্ট্রেট যথাসময়ে মোকদ্দমা সেশনে দিলেন। অরবিন্দের শাস্তি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, যখন দেখিল, তখন আর উপায়ান্তর না পাইয়া কোন কোন লোক নিম্নলিখিতরূপ নানা মিথ্যা কথা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে লাগিল।

(১) অরবিন্দ মুরলাকে রাস্তায় আহত অবস্থায় চিনিতে পারে নাই, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানের তাহার ইচ্ছা ছিল। (২) অরবিন্দ মুরলার জন্য সে দিন কিছুই করে নাই, সমস্ত রাত্রি ঘরে দরজা আবদ্ধ করিয়াছিল। (৩) অরবিন্দ মুরলার শব দাহের উপায় করে নাই; অন্যান্য ব্রাহ্মেরা তাহা করিয়াছে। এই সব কথা শুনিয়া মফঃস্বলের বন্ধুরা খুব ব্যথিত হইলেন। মুরলার

হত্যার সংবাদ পাইয়াই সুরেশ বাবু সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন। এ সকল মিথ্যা অভিযোগ শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন, এবং ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। মিথ্যার ঢাক অধিক দিন বাজে না, সুতরাং বাবুদের চেষ্টা ক্রমেই বিফল হইতে লাগিল। দেশের লোক প্রকৃত ঘটনা জানিয়া অরবিন্দের চরিত্রে কোন দোষ দেখিল না। চক্রধরপুর, আরামপুর প্রভৃতি হিন্দুপ্রধান স্থানের লোকেরা অরবিন্দের চরিত্রের উচ্চ আদর্শ দেখিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল; হিন্দু-বন্ধুরা একবাক্যে বলিল, "মুরলার জন্য অরবিন্দ যাহা করিয়াছেন, যে-সে-মানুষ তাহা করিতে পারে না।"

দশম পরিচ্ছেদ।

সুরেশচন্দ্রের হৃদয়-ছবি।

রাত্রি এখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, কলিকাতার উপনগরের কোন পল্লী হইতে দু'টী লোক আসিতেছেন। আম্রমুকুলের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত, গুণ গুণ করিয়া মৌমাছির দল গাছে গাছে উড়িতেছে, পড়িতেছে। পাখী সকল কুলায় বসিয়া ডাকিতেছে, একবার নীরব হইতেছে, আবার ডাকিতেছে। একরূপ ডাকের পশ্চাতে শতরূপ ডাক ফুটিতেছে—কত পাখী কত রকম করিয়া ডাকিতেছে! ক্রমে ক্রমে উষার কিরণছটা দশদিক্ আলোকিত করিতে ছুটিতেছে। মধুর উৎসব আরম্ভ হইতেছে। বঙ্গের বসন্তকালের উৎসবের সহিত পৃথিবীর কোন স্থানের কোন কালের তুলনা হয় না। এই মহা উষায় দু'টী লোক এইরূপ আলাপ করিতে করিতে চলিয়াছেন;—

প্রথম ব্যক্তি। কেমন হে বাপু, তোমরা ত বড় স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া অস্থির হও, সেদিনকার সভায় স্বাধীনতাটা কোথায় রহিল?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কেন মহাশয়, কি হয়েছে? স্বাধীনতা গেল কিসে?

প্রথম ব্যক্তি। আর বড়াই করো না, সব দেখেছি। একটী নিরপরাধী সত্য ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির দোষ আলোচনা করার জন্য আবার একটী সভা হলো! যাহা হউক, এপর্য্যন্ত নম স্কান্ত রহিলাম, কিন্তু সভায় কাজ

হলো কি? কিরূপে অরবিন্দকে জব্দ করিতে হইবে, তাহারই আয়োজন! ছি ছি, এরূপ নীচ প্রকৃতি লইয়া মানুষ জীবন ধারণ করে, আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কি জানেন মহাশয়, অরবিন্দ ঘরের খবর বাহির ক'রে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশ করেছে, ইহার নাম করিলে পাপ হয়। এজন্য অরবিন্দের প্রতি সকলে চটা।

প্রথম ব্যক্তি। ঘরের সত্য খবর বাহির করে অরবিন্দ দেশের ও ব্রাহ্ম-সমাজের যে কল্যাণ করেছে, এমন আর কেহ পারে নাই। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দেশের অনেক আশা ভরসা, ব্রাহ্মসমাজের ভিতর গলদ থাকিয়া গেলে ব্রাহ্মসমাজের সহিত দেশের আশা ভরসা ডুবিবে। অরবিন্দ ত প্রকৃত মানুষের কাজ করেছে। সে কি একটীও মিথ্যা কথা লিখিয়াছে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। মিথ্যা লিখে নাই বটে, কিন্তু কোন কোন ঘটনা তাহার বাড়ীতেই ঘটেছে।

প্রথম ব্যক্তি। মিথ্যা কথা। আমি যতদূর জানি, অরবিন্দের বাড়ীতে কোন ঘটনা ঘটিলে সে তাহার ভয়ানক প্রতিবাদ করিয়া থাকে। সে তীব্র প্রতিবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া অপরাধী ব্যক্তিরা অরবিন্দের নিন্দা রটনা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতি আকর্ষণ করে, এবং পরে অরবিন্দকে জব্দ করে। অরবিন্দ কোন দিন অবৈধ প্রণয়ের পোষ-কতা করে নাই। ব্রাহ্মসমাজ যদি অরবিন্দের চরিত্রের দোষ দেখাইতে পারিত, তবে বুঝিতাম, অরবিন্দ নরাধম। তোমরা বাপু সকল অপরাধীর সকল অপরাধ চাপা দিয়া পোষকতা করিতে চাও, সে তাহা পারে না। সে ত বীর। এই যে মুরলার কাণ্ড—তোমাদের কাহারও ঘরে এই ঘটনা ঘটিলে, তোমরা সব চাপা দিতে। অরবিন্দ বীরের ন্যায় সব প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মহত্ব শতগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। যে আপন দোষ বা আপন সমাজের দোষ ব্যক্ত করিতে পারে, অন্যের বা অন্য সমাজের দোষ দেখে না, সে ত মহৎ হইতেও মহৎ। তোমরা যে অন্য সমাজের লোকের দোষ কীর্ত্তন করিয়া বেড়াও, সেটা বড় বাহাদুরির কাজ, না? আর অরবিন্দ নিজ সমাজের ও নিজের দোষ গায়, সে বড় নীচ লোক?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। পর সমাজের নিন্দা প্রচার করা অন্যায়, জানি, কিন্তু অরবিন্দবাবু বড় বাড়াবাড়ি করেন, তাই তাহার উপর সকলে চটা।

প্রথম ব্যক্তি। সকলে চটা, একথা আমি স্বীকার করি না। অপরাধী ব্রাহ্মেরাই চটা, অনেক সাধুচরিত্র ব্যক্তি অরবিন্দকে বিশেষ শ্রদ্ধা করে, আমি জানি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তবে সেদিনকার সভায় সকলে একমত হইয়া অরবিন্দের নির্য্যাতনের প্রস্তাব সকল গ্রহণ করিল কেন, বলুন ত ?

প্রথম ব্যক্তি। উহাই ত স্বাধীনতার মহিমা! জ্ঞানদা বাবু পনর শত টাকা বেতন পান, গোবিন্দ বাবুর আয় ততোধিক; তাঁহাদের মুখ চাহিয়া চলে না, তাঁহাদিগকে খাতির করে না, এমন লোক ত দেখি না। টাকা-ওয়ালা লোকের সাত খুন্ মাপ, তাহাদের পক্ষে জগৎ; টাকার এমনি মোহিনী শক্তি! মণি কাঞ্চন সংযোগে না হয়, এমন কাজ নাই। আমাদের দেশে কত শত শত জমীদার আছেন, তাঁহাদের প্রতিজনের বৈঠকখানায় ২০।৩০ জন করিয়া খোসামুদে থাকে, বাবু যদি বলেন, সূর্য্য আজ পশ্চিমে উঠেছে, অমনি তাহারা তাহাতে সায় দেয়। বাবুর মতে মত দেয় না, এমন স্বাধীন-চেতা লোক বড় দেখা যায় না। বাবুর অপকর্ম্মের সহায়তা করে না, এমন লোক এদেশে বিরল। সেই দৃশ্য ব্রাহ্মসমাজেও দেখিতেছি। স্বাধীনতার বড়াই আর বাপু ক'রো না; জাতিভেদ তুলে দিতে পেরেছ,আর বলো না। তোমরা ব্রাহ্মসমাজে অর্থশালী ব্যক্তিকেই বড় লোক ক'রে দিয়া, সকলে তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া কুকুরের মত পশ্চাৎবর্ত্তী হইতেছ! যদি মনুষ্যত্ব থাকিত, খোসামুদী, পরমুখাপেক্ষিতা তোমাদের সমাজে স্থান পাইত না; ধনী দরিদ্রে ভেদাভেদ উঠিয়া যাইত। তোমাদের সমাজে যে শত পাপে অপরাধী,দেখেছি, ১০০্ কি ২০০্ টাকা সমাজের মঙ্গলের জন্য দিলেই সে সকলের পূজ্য হয়। কত ব্যভিচারী, কত নরহন্তা, কত মিথ্যাবাদী, কত পরস্বাপহারী, কত প্রতারক, এইরূপ অর্থ সাহায্য করিয়া তোমাদের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে! ছি, ছি, লজ্জায় মরি, যে লোকটার উপর অরবিন্দকে পাড়া হইতে উঠাইবার ভার দিয়াছ, সেটা কি মানুষ, না পশু? তার আদেশে কত নরহত্যা হইয়াছে, কত জনের কত সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তোমরা জাননা কি? সে লোকটা কিসে বড়? তোমরা, সত্য ও ন্যায়ের সেবক, একথা আর ব'লো না। জ্ঞানদা বাবু পরের ঘরের মেয়ে বাহির করে এনে বিবাহ করেছিলেন; এখন চুল পাকিয়াছে, খুব ঐশ্বর্য্য বাড়িয়াছে, তিনি এখন বড় লোক, তিনি এখন সম্ভ্রান্ত, তিনি এখন গরীবের পর্ণ কুটীরে যাইতে

কুষ্ঠিত, তিনি এখন বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদকে ঘৃণা করেন! তোমরা এখন তাঁহার পদানত দাস; তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই তোমাদের শিরোধার্য্য। অহো স্বাধীনতা, তোর বালাই লইয়া মরি! মুচি হাড়ি, ব্রাহ্মণ বৈদ্যের মাথায় উঠিল; বলিহারি নূতন জাতিভেদের বাহাদুরি!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। মহাশয় জানেন না কি, গ্লাডোষ্টোন সাহেব ইংলণ্ডকে চালাইতেছেন। বড় লোকের পূজা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে হইয়া থাকে।

প্রথম ব্যক্তি। ধর্ম্মসমাজে ধনীর পূজা হওয়া কলঙ্কের কথা; ধর্ম্ম, চরিত্র ও প্রতিভার পূজা ভিন্ন ধর্ম্মসমাজে আর কাহারও পূজা হওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আপনার কথা মানিলাম, কিন্তু মনে রাখিবেন, এ নূতন সমাজ।

প্রথম ব্যক্তি। তা জানি। বিশ্বাস করি, সমাজের প্রথম যুগে নীতির যে কঠোরতা থাকিবে, পরযুগে তাহা থাকিবে না। প্রথম যুগে যে সমাজ শিথিল, উচ্ছৃঙ্খল, সে সমাজের মঙ্গল নাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আপনিও ত সমাজের লোক, আপনি এ সকল সংশোধন করুন না কেন?

প্রথম ব্যক্তি। আর সংশোধনে কাজ নাই। সংশোধন যে করিতে চায়, তার পরিণাম অরবিন্দের দুর্দ্দশা। যাঁহার কঠিন হাড়, তিনি পারিলেন না; আমি নগণ্য ব্যক্তি, আমি কি করিব?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আপনাকে এবার কমিটী সমূহে যাহাতে গ্রহণ করা হয়, সে পক্ষে আমি খুব চেষ্টা করিব। আপনার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের অনেক মঙ্গল হইবে, দেখিতেছি।

প্রথম ব্যক্তি। আমি আর নূতন সাম্প্রদায়িকতা গঠনে রক্ত জল করিব না। উদার বিশ্বপ্রেমিকতার দাস হইয়া সকলের পদরেণু মস্তকে লইব। স্বাধীনতার নাকি তোমরা বড় বড়াই কর, তাই এ সকল কথা বলিলাম। কেশবচন্দ্রকে অপমানিত করিয়া যে কুকর্ম্ম করেছ, এখন সেই ফলভোগ করগে। অরবিন্দের নির্য্যাতনের ফলভোগ পরে করিবে। সাধু ভক্তের যাহারা বিরোধী, কখন তাহাদের মঙ্গল হয় না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আপনি কি অরবিন্দকে সাধু বলেন?

প্রথম ব্যক্তি। শত কণ্ঠে বলি, এরূপ চরিত্রবান ধার্ম্মিক লোক ব্রাহ্ম-

সমাজে অল্পই আছে। এ লোকের মর্য্যাদা তোমরা বুঝিলে না, ইহাতে তোমাদের অপদার্থতাই প্রকাশ পাইতেছে।

এই দু'টী লোকের প্রথমটী সুরেশবাবু, ইনি অরবিন্দের একজন বিশেষ বন্ধু। মুরলার হত্যার সংবাদ শুনিয়া দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। একদিন কলিকাতার নিকটস্থ কোন পল্লীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে আসিবার সময় পথে নির্জ্জন পাইয়া এই সব কথা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম গোপনে রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিধাতার লীলা-চক্র।

তারপরের ঘটনাগুলি আর বিস্তৃতভাবে বলিতে ইচ্ছা করে না। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে যখন মোকদ্দমা চলিতেছিল, তখন অরবিন্দের একটী ভৃত্য একদিন বৈকালে বলিল, "আমি আমার একজন আত্মীয়কে দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া যে গেল, আর ফিরিল না। দ্বিতীয় ভৃত্যটী অনেক দিনের পুরাতন লোক, সহজে মায়া ছাড়িতে পারে না, বলিল, "লোকেরা ভয় দেখাইতেছে, আমি এখানে থাকিলে আমাকে ধরিয়া প্রহার করিবে।" অরবিন্দ বলিলেন—"তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর।" দুইচারি দিন থাকিয়া শেষে একদিন সে বলিল, "বাড়ী হইতে পত্র আসিয়াছে, আমার স্ত্রী ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়াছে, বাড়ী না যাইয়া পারি না।" এই বলিয়া বিদায় লইয়া গেল, আর শীঘ্র ফিরিল না। চাকর অভাবে অরবিন্দ খুব কষ্টে পড়িলেন। অশোকা কোনরূপে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে লাগিলেন। বাড়ীতে কোন লোক ঘেসে না, দুই একজন লোক কদাচিৎ আসিয়া বলে, ভালবাসার খাতিরে আপনাদের বাড়ী না আসিয়া পারি না, কিন্তু এজন্য বড়ই নির্য্যাতন সহিতে হয়। খুব যাঁহারা আত্মীয়, অরবিন্দ যাঁহাদের জন্য জীবনে অনেক কষ্ট সহিয়াছেন, তাঁহারাও এইরূপ করিতে লাগিল। সহায় কে? অরবিন্দ কাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন? এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে কে সান্ত্বনা দিতেছে? কে সাহস ও বল দিতেছে?

সর্ব্বোপরি বিধাতা। তাঁহার অপার দয়া অরবিন্দকে এই সময়ে সজোরে ধরিল। দ্বিতীয় সহায় সুরেশচন্দ্র। সুরেশচন্দ্রের মন ভাঙ্গিতে তাঁহার অনেক বন্ধু অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মন ভাঙ্গিতে পারেন নাই। প্রকৃত ভালবাসা, বন্ধুত্ব ইনিই বুঝিয়াছেন। ইনি নরদেবতা। তৃতীয় সহায়, পুলিস। অথবা, পুলিসের সহায় অরবিন্দ, অরবিন্দের সহায় পুলিস। পুলিসের লোকের মধ্যে এত সহৃদয়তা থাকে, পূর্ব্বে কে শুনিয়াছিল?

বিপদ একাকী আসে না। শোভা পীড়িত ছেলেটী লইয়া কলিকাতা আসিয়াছে। গোলমালের মধ্যেও চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল, যথাসাধ্য শুশ্রুষা হইল, কিন্তু সে থাকিল না; এই ঘোর দুর্দ্দিনে অরবিন্দের প্রাণে, শোভার প্রাণে দারুণ আঘাত দিয়া চলিয়া গেল। মুরলার পিতা মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে সাক্ষী দিয়া বাড়ী যাইবার সময় পথে জ্বর রোগে আক্রান্ত হইলেন, এবং কয়েক দিনের মধ্যেই মানবলীলা শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন; দারুণ অপমান ও মনের কষ্ট সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেন না। কাকার মৃত্যু সংবাদে অশোকা অস্থির হইলেন। শোভার পুত্রের মৃত্যু অরবিন্দের হৃদয়, এবং মুরলার পিতার মৃত্যু অশোকার হৃদয় ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বিধাতা এইরূপ লীলা খেলিতে লাগিলেন। অরবিন্দ, এই ঘটনা সমূহের মধ্যে বিধাতার উজ্জ্বল হস্ত দেখিয়া মোহিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন—"মোহান্ধ জীবকে উদ্ধার করিবার জন্যই তাঁহার এই লীলা। আমি মুরলাকে বড় ভালবাসিতাম, আমাকে বুঝাইলেন, মোহের দাস হওয়া কিছু নয়। বাড়ীতে এরূপ ঘটনা ঘটিলে, আরো দু'টী একটী প্রাণ যাইত, তাহা তিনি রক্ষা করিলেন। এই জন্যই ভবানীপুর যাইবার সময় স্কুলে যাইতে নিষেধ করার কথাটী স্মৃতি হইতে তুলিয়া লইয়াছিলেন, বলিহারি তাঁহার করুণা। যদি সে দিন ১১ টার সময় বাড়ীতে ঐ লোকটা না আসিত, তবে সুপ্রসন্নকে ধরিবার আর উপায় ছিল না। পত্রগুলি যখন রাখিতাম, তখন বুঝিতাম না, ইহার দ্বারা কি হইবে; এখন দেখিতেছি, ইহার মধ্যেও বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায় ছিল। পত্র ভিন্ন সুপ্রসন্নের অপরাধ কিছুতেই সাব্যস্ত হইত না। গাড়ী হইতে অন্য মেয়ে দুটী পূর্ব্বে না নামিয়া যদি পরে নামিত, তাহা হইলে হয় ত তাহাদেরও সর্ব্বনাশ হইত। তাহারা নিরপরাধী, তাহাদিগকে বিধাতা বাঁচাইলেন। বিধাতার কি ইচ্ছা, কে জানে? এই দিন নূতন সহিস

কোচ্‌ম্যান জুটিল। ১০টা পর্য্যন্ত মিস্ নীল আর কখনও মেয়েদিগকে রাখেন নাই, আজ বিধাতার ইচ্ছায় তাহাও হইল। মুরলার জীবনের কাজ শেষ হইয়াছে, তাঁহাকে আর রাখিবেন কেন? পাপে পড়িয়াও লোক উঠিতে পারে, এবং চরিত্রের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে, মুরলার জীবনে তাহা দেখাইলেন! শোকের উপর আরো শোক দিলেন কেন? লোক মাতাইলেন কেন? চাকর দু'টীকে বিদায় করিলেন কেন? ইহার একই উদ্দেশ্য—আমরা সংসারের অতীত হইয়া তাঁর চরণে দেহ প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। আমরা আত্মহারা, সংসারহারা না হইলে তাঁহাকে পাইনা বলিয়া এই শিক্ষা দিলেন। বলিহারি বিধাতার করুণা, বলিহারি তাঁহার মহিমা!!"

অরবিন্দের বড় দাদা যখন ব্রাহ্মদের চক্রান্তের বিবরণ শুনিলেন, তখন তেলে বেগুণে জলিয়া উঠিলেন। "আমরা এতগুলি ভাই জীবিত থাকিতে বাড়ী হইতে কে তাড়ায়, দেখিব" এইরূপ কথা বলিয়া অরবিন্দকে আশ্বস্ত করিলেন। আরো বলিলেন, মুরলাকে বাড়ীতে স্থান দিয়া তুমি প্রকৃত মনুষ্যোচিত কাজ করিয়াছ; তুমি স্থান না দিলে তাঁহাকে রাস্তায় দাঁড়াইতে হইত। মুরলাকে আশ্রয় দিয়া কুলের মুখ উজ্জল করিয়াছ, আমাদের সম্মান রাখিয়াছ। এই ঘটনায় অরবিন্দের বড় দাদার সহিত শোভার দেখা সাক্ষাৎ হইল। ইহার পূর্ব্বে বড় দাদা শোভার মুখ-দর্শন করেন নাই। চক্রধরপুরের লোকদিগের সহিত এই ঘটনায় পূর্ব্বের সকল অসদ্ভাব দূর হইল এবং সদ্ভাব সংস্থাপিত হইল। এই সদ্ভাব একদিকে, অন্যদিকে ব্রাহ্মদিগের অত্যাচার,—এই দুই বিরোধী অবস্থার মধ্যে থাকিয়া সুরেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"একদিক্ পৃথক্ করিয়া, পূর্ব্ব-বিচ্ছিন্ন অপর দিক্ এবার বিধাতা মিলিত করিলেন, পরে আবার এ দিক্ ও দিক্ সকল দিক্ মিলাইয়া তাঁহার স্বর্গের মহিমা প্রচার করিবেন। তাঁহার অপার করুণা!!" অরবিন্দ ধীরচিত্তে, বিশ্বাসনয়নে বিধাতার লীলাচক্রের অন্তরালে যে সকল সত্য ছিল, তাহা সুরেশ বাবুর সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। সুরেশচন্দ্র এই বিপদের দিনে অরবিন্দের যে উপকার করিলেন, ইহা অরবিন্দ যদি কখনও বিস্মৃত হন, তবে তিনি মানুষ নহেন, পশু। অরবিন্দ হৃদয়ের অন্তরালে সুরেশচন্দ্রের মহত্ব শোণিতাক্ষরে লিখিয়া রাখিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শেষ।

আর একটী সহৃদয়া মহিলার কথা এস্থলে উল্লেখ না করিলে এই বিষাদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। পুরুষ-জগতে সুরেশচন্দ্র, রমণী-জগতে দেবীতুল্যা মায়া এই সময়ে অরবিন্দের একমাত্র সহায়। মায়াকে অরবিন্দ এই সময়ে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন—"আজ পৃথিবীর সব প্রতিকূল, আপনিও অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমার প্রতিকূলে দাঁড়াইলেন, দরিদ্র ভ্রাতাকে চরণে ঠেলি-লেন, এ দুঃখ আমার আর রাখিবার ঠাঁই নাই। আপনাদিগকে ভালবাসিয়াই প্রেমের হাটে পৌঁছিতে পারিয়াছি, হায়, আজ আপনারাও প্রতিপক্ষের ভালবাসার খাতিরে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন! বলুন্ ত আমি এখন কি লইয়া থাকি?"

মায়া এই পত্রের এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন—"আমি পূর্ব্বেও যেমন, আজও তেমনি আছি, পৃথিবীর শত সহস্র পরিবর্ত্তনেও আমার একটুক পরিবর্ত্তন হয় নাই। কত লোক কত কথা বলে, আপনার কত কত নিন্দা করে, সে সকল শ্রবণ করিয়া আমি আরো আপনার মহত্ত্ব দেখি-তেছি। মুরলা দিদির জন্য আপনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে আর মানুষ বলিতে ইচ্ছা হয় না, আপনি যেন দেববেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, মনে হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তন আমার হয় নাই, পূর্ব্বেও যেমন দরিদ্র ছিলাম, আজও তেমনি আছি। আমি ভালবাসা সম্বন্ধে ব্যভি-চারিণী নহি—আমি আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো উজ্জ্বলরূপে ভক্তি করিতেছি, ভালবাসিতেছি। আপনার মনে ঐরূপ চিন্তা কিরূপে স্থান পাইল, তাহাই ভাবিতেছি—ভাবিয়া চক্ষের জলে ভাসিতেছি। আপনি জানেন না যে, মায়া আপনাকে কি চক্ষে দেখে। আমি ইষ্ট দেবতার পূজা ছাড়িয়া আপনার পূজা ধরিয়াছি; আপনি আমার নিকট মানুষের আদর্শরূপে আজ প্রকাশিত হইয়াছেন। আপনি সমস্ত জগতের নিকট প্রতারিত হইতে পারেন, কিন্তু মায়ার নিকট নহে। মায়া কত লোকের সহিত ঝগড়া করিয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহ তাহা জানে না। আপনি

আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিলেও আমি চিরকাল একই ভাবে আপনার চরণ পূজা করিব। আপনার স্নেহের—মায়া।”

এইরূপ পত্রে অরবিন্দ যে কত আরাম ও সান্ত্বনা পাইলেন, পৃথিবীর কোন লোক জানে না। প্রতিদিন উপাসনান্তে অরবিন্দ ভক্তির সহিত মায়ার পত্রখানি পড়িতেন। ইহাতে জীবনে প্রতিদিন নব বল সঞ্চারিত হইত। এই ভাবে দিন চলিল।

মানুষের মন চঞ্চল, মানুষ বড় খোসামুদীর বশ। অরবিন্দ স্বাধীনচেতা, সুতরাং অনেক বন্ধু তাঁহার প্রতি ভয়ানক খড়্গহস্ত হইলেন। বোধকরি, সুবিধা পাইলে এই সময়ে তাঁহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিতেন। ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন লোকের মনোবাঞ্ছা কতক পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু বিধাতা যাঁহার সহায়, মানুষ তাঁহার কি করিবে? শোক, সন্তাপ, দুঃখ, দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া তিনি অরবিন্দের নবজীবন সঞ্চার করিলেন। বিদ্বেষী ব্রাহ্মেরা শেষে আরো অনেক অত্যাচার করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে সকল কথা, এ পুস্তকের আলোচ্য নহে।

এদিকে যথাসময়ে হাইকোর্টে সুপ্রসন্নের বিচার হইল। সুপ্রসন্ন কুলোকের পরামর্শে সমস্ত অপরাধ অস্বীকার করিলেও, সুযোগ্য বিচারপতি উইল্‌সন্ সাহেবের বিচারে সুপ্রসন্নের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তিন দিবস অবিশ্রান্ত মোকদ্দমা চলিল। বহু সাক্ষীর জবানবন্দি হইল, সুপ্রসন্নের বন্ধুরাও সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দিল। তৃতীয় দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বিচারপতি ভগ্ন হৃদয়ে অস্পষ্ট ভাষায় সুপ্রসন্নের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। সুপ্রসন্নের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হইল। লাট সাহেবের নিকট ক্ষমা চাহিল, তাহাও অগ্রাহ্য হইল। যথাসময়ে হাইকোর্টের আদেশ প্রতিপালিত হইল, হতভাগ্য মৃত্যু সময়েও বলিল—“আমি নিজে মুরলাকে হত্যা করি নাই, অন্য লোক দ্বারা করাইয়াছি।” একথা কেহ বিশ্বাস করিল না! সকলে বুঝিল, বরিশালের লোক জেদ্ বজায় রাখিতে শেষেও একটী মিথ্যা কথা বলিয়া গেল!

আজ মুরলা যে দেশে, সুপ্রসন্ন সেই দেশে প্রস্থান করিল। সে দেশে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবে কি না, জানিনা। বিধাতার ইচ্ছা উভয়ের জীবনে পরিপূর্ণ হইল—সুপ্রসন্নের মস্তকে লিখিত হইল “প্রতিহিংসার জয়।” আর মুরলার ললাটে খোদিত হইল—“ধর্ম্ম, চরিত্র ও পুণ্যের জয়।” আর

সমস্ত ঘটনার উপরে লিখিত হইল, "বর্ত্তমান সমাজের অধোগতি!" দুইজন দুই পথে,—একজন পাপ এবং আর একজন পুণ্যের পথে চলিয়াও পাইলেন, একই পরিণাম,—মৃত্যু। সুতরাং একের ইচ্ছারই জয় হইল!

আর কি লিখিব? অরবিন্দ ও অশোকা, মুরলার জীবনের মহত্ত্ব-চিন্তায় ধন্য হইলেন, কৃতার্থ হইলেন, এবং আশা করিলেন, খ্রীষ্টের মৃত্যুতে যেমন ধর্ম্মজগতে ঘোরতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, মুরলার মৃত্যুতেও তেমনি পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবে। কিন্তু কে জানে কবে সে দিন আসিবে, যে দিন মুরলার বিষাদময় জীবন কাহিনী, এই হতভাগ্য দেশের চরিত্র প্রতিষ্ঠার সহায় হইবে,—কবে চরিত্ররূপিণী মুরলা প্রতিজীবনে আধিপত্য বিস্তার করিবেন? অরবিন্দ ভাবিলেন, চরিত্রাংশে আমি মুরলার পদরেণু বহনেও অনধিকারী; ভাবিলেন, তিনি কি সামান্য রমণী, যিনি ধর্ম্ম ও চরিত্রের জন্য জীবন বলি দিতে পারেন? অরবিন্দ দেবী মুরলার পূজা হৃদয়ের অন্তরে ও বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি উদার বিশ্বজনীন প্রেম বিলাইতে এবং ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতা বিদূরিত করিতে এবং বিরোধী ব্রাহ্মদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে জীবিত রহিলেন। মুরলার বিষাদময় জীবন তাঁহাকে সংসারের ঊর্দ্ধে তুলিয়া অহেতুকী প্রেমের রাজ্যে লইয়া গেল। সেই প্রেমে অশোকাও ডুবিলেন, মজিলেন, চিরদিনের জন্য আত্মহারা হইলেন। কিন্তু বলিয়াছি, সে রাজ্যের সে সকল কথা এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে।

সমাপ্ত।

৬/১ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, জোড়াসাঁকো, "কলিকাতা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" যন্ত্রে
শ্রীচণ্ডীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।